তন্দ্রাতুরা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স
৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রকাশক :
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ
১৩৫৩

চার টাকা বারো আনা

মুদ্রাকর :
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দীপালী প্রেস
১২৩-১ অপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা ৬

স্বর্গত কল্যাণকুমার মিত্রের উদ্দেশে—

—বাবা

তন্দ্রাতুরা

এক

শ্রাবণের বর্ষনোন্মুখ মধ্যাহ্ন।

আলীপুর প্রেসিডেন্সী জেলের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে যে ক্ষুদ্র ঝিলটি অবস্থিত, সেই ঝিলের ধারে একদল তরুণ তরুণী সাড়ম্বরে মাছ ধরতে বসেছিল। সকলেই এক-একটি হুইল হাতে ক'রে, সরবে মৎস-কুল ধ্বংস করবার জন্য হয়ে উঠেছিল উন্মুখ; কিন্তু বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করবার পরও, বহুল পরিমাণে চার সরবরাহ করেও, তারা একটি মাছেরও চেহারা দেখতে পেল না। শেষে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে একটি যুবক বলল: "বুঝলেন,—মিস্ ঘোষ, শুভেন্দু আমাদের ধাপ্পা মেরেছে। এখানে মাছ-টাছ কিছু নেই।"

মিস্ ঘোষ, অর্থাৎ পুষ্প ঘোষ বলল: "তাইতো দেখছি"······

আর একটি যুবক বলল: তাহলে আর মিছি-মিছি এখানে বসে থেকে লাভ কী?"

তাকে উদ্দেশ ক'রে আর একটি তরুণী বলল: "রঞ্জনদা— তাহলে "ভ্যারাইটি"তে চল না। গার্বোর একটা ভাল ছবি আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি যুবকও বলে উঠ্‌ল : "ঠিক বলেছেন লিলি দেবী। চলুন আজ ম্যাডানে যাওয়া যাক্‌। কারুর আপত্তি আছে? রজত বাবু, পুষ্প দেবী, প্রণতি দেবী, সুকুমার বাবু?"

ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে পুষ্প বলল : "আজ না হয় থাক্‌ না! এলাম যখন এত তোড়-জোড় ক'রে......"

সঙ্গে সঙ্গেই সেই যুবকটি বলে উঠ্‌ল : "নিশ্চয় নিশ্চয় এত তোড়-জোড় ক'রে আসা হ'য়েছে যখন......"

সকলের অভিমত শুনে লিলি মুখভার করল। পুষ্পর দিকে একটা কটাক্ষ ক'রে সে রজতকে বলল : "আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার একটা ব্যবস্থা করবে রজতদা! নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই।"

রজত কোন উত্তর দেবার পূর্ব্বেই পুষ্প বলল : "আঃ লিলি। তুই বড় ছেলে মানুষ! ম্যাডানে যদি যেতেই হয় তো এত তাড়াতাড়ি কেন? শো তো সেই সাড়ে ছটায়!"

সুকুমার বলল : "সেই ভাল সেই ভাল, আর একটু দেখা যাক্‌"—

বাধা দিয়ে রজত বলল : "কিন্তু ফল যে সেই অষ্ট-রম্ভাই হ'বে, তা আমি আগে থাকতেই বলে রাখছি।"

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে কে যেন অস্ফুট-স্বরে হেসে উঠল। সকলে চমকে উঠে পিছন ফিরে দেখল ঘন শ্মশ্রু-গুম্ফ সমন্বিত জাজিয়া পরা একটি কয়েদি তাদের দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হাসছে। লোকটার পায়ে বেড়ি ও শৃঙ্খল এবং হাতে ফুল গাছে জল দেওয়ার একটা ঝারি।

লোকটা বলল : "অত চেঁচিয়ে কথা কইছেন কেন! অত গোলমাল করলে কি চারে মাছ আসে!"

সামান্য একটা কয়েদিকে তাদের সঙ্গে সমানভাবে কথা কইতে দেখে সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। সুকুমার কিয়ৎকাল তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে শেষে বলল: "তেলটা নিজের চরখায় দিলে ভাল হয় না ছোক্‌রা ?"

এ কথা শুনে প্রথমে লোকটির মুখ শুখিয়ে গেল। পরমুহূর্ত্তেই চোখ দুটো যেন তার জ্বলে উঠল দপ্ ক'রে। ওষ্ঠ কুঞ্চিত ক'রে, কণ্ঠস্বরে নিদারুণ শ্লেষ ঢেলে সে বলল: যে আজ্ঞে। বাঙলা দেশের শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে তেল মাখিয়ে আমড়াগাছি করা আর চরখা দেখিয়ে ধাপ্পা মারা ছাড়া নতুন যে আর কিছু করবার নেই তা জানি কিন্তু......"

দারুণ ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে সুকুমার লাফিয়ে উঠল। পরক্ষণেই আবার ধপ্ করে বসে পড়ল।

ব্যাপার দেখে লিলি পুষ্পর দিকে চেয়ে অস্ফুটস্বরে বলল: "লোকটা কে ভাই ?

পুষ্প কোন উত্তর দিল না। শুধু বিস্ফারিত চক্ষে লোকটির দিকে চেয়ে রইল।

কয়েদিটি আরও কিছুক্ষণ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে সুকুমারের দিকে চেয়ে থেকে পূর্ব্বের মতো শ্লেষ সহকারে যেন আপন মনেই বলল: "হুঁঃ! বিষের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কুলোপানা চক্কোর! ওইতো প্যাকাটির মতো চেহারা বাবুর,—রাগ দেখ না! যত সব চ্যাংড়ার দল......"

মন্তব্য শুনে কেউই কোন কথা কইতে পারল না। দারুণ বিস্ময়ে স্তিমিত দৃষ্টিতে সকলে তার দিকে চেয়ে রইল।

সকলকে নির্ব্বাক দেখে আর একটা আপত্তিকর মন্তব্য প্রকাশ করে কয়েদিটি প্রস্থান করল।

"না:—ওকে একটা Lesson দেওয়া দরকার। দেখি শুভেন্দু কোথায়……" সুকুমার তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়াল।

তাকে প্রস্থানোদ্যত দেখে রজত বাধা দিয়ে বলল: "তুই বোস্—আমি যাচ্ছি।"

রজতকে প্রস্থানোদ্যত দেখে প্রণতি বলল: "অমনি শুভেন্দুবাবুকে আমাদের afternoon চায়ের কথাটাও বলে আসবেন।"

"আচ্ছা"।

রজত প্রস্থান করল। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই দেখতে পেল খাকীর সর্ট-সার্ট পরে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে স্বয়ং শুভেন্দু তাদের দিকেই আস্‌ছে। তাকে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে রজত গম্ভীর মুখে বলল: "শুভেন্দু তোমার সঙ্গে একটা ·"

বাধা দিয়ে সহাস্য মুখে শুভেন্দু বলল: "One minute please, বিশুবাবু, ও বিশু বাবু…"

পূর্ব্বদৃষ্ট কয়েদিটি অদূরে 'ঠিকরে' কড়াই ক্ষেতের মধ্যে জল দিচ্ছিল। শুভেন্দু তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আবার ডাকল: "বিশুবাবু ও বিশুবাবু…"

ডাক শুনে কয়েদিটি ফিরে তাকাল। তারপর হাতের ঝারিটা নামিয়ে রেখে বলল: "Good after-noon sir."

"Good after-noon" বলে শুভেন্দু গিয়ে তার হাতদুটি মুঠো করে ধরে নাড়া দিতে দিতে উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলল: "সু-খবর আছে মশাই

অত্যন্ত সু-খবর। আপনি মুক্ত,—এই দেখুন।" এই বলে পকেট থেকে একটা সরকারের মোহরকরা পরোয়ানা বার করে সে বিশুর হাতে দিল।

কাগজটি পড়তে পড়তে চিন্তিত স্বরে বিশু বলল: "কিন্তু আমার তো ধারণা ছিল·······"

"আপনার ধারণা ভুল ছিল মশাই। আমাদের তো আপনাদের মতো তিরিশ দিনে মাস হয় না! চলুন চলুন···"

উভয়ে অগ্রসর হলো। তারা রজতের সন্নিকটবর্ত্তী হতেই রজত আবার বলল: 'শুভেন্দু তোমার সঙ্গে একটা..."

শুভেন্দু বাধা দিয়ে বলল: One minute plase দাঁড়াও, আগে তোমাদের আলাপ করিয়ে দি। ইনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বোস একজন বিখ্যাত কংগ্রেস-কর্ম্মী; সুদীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ এখানে বন্দী অবস্থায় রয়েছেন। আর ইনি হচ্ছেন মিষ্টার রজত রায়, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার রাজীব রায়ের ছেলে। এঁরা সকলেই আমার বন্ধু।"

বিশু সস্মিতমুখে সকলকে নমস্কার করল। অন্যান্য সকলেও তাকে প্রতি নমস্কার করল।

রজতও তাকে নমস্কার করল বটে কিন্তু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ভাবে। প্রথম সাক্ষাতেই বিশু তাদের সকলকে যে বিশেষণে বিভূষিত করেছিল তার জ্বালায় সে তখনও জ্বলছিল। কিন্তু বিশুকে প্রথমে সে রাজবন্দী বলে কল্পনাও করতে পারেনি। রাজবন্দীদের সম্বন্ধে সাধারণ লোকেদের মতো তারও সম্ভবত: একটা উচ্চ ধারণা ছিল; এবং সেইজন্যই সাধারণ কয়েদিদের মতো জাজিয়া পরে বেড়ি শৃঙ্খলের আওয়াজ করতে করতে

সর্ব্ব-প্রথম বিশু যখন তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন তাকে একজন সামান্ত কয়েদি ছাড়া সে অন্য কিছু ভাবতে পারেনি। কিন্তু এখন শুভেন্দুর নিকট থেকে তার সম্যক পরিচয় অবগত হয়ে এবং তাকে তার প্রতি বিশেষ ভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে দেখে, মনে মনে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হলেও সে বিস্মিত হ'লো তার চাইতে ঢের বেশী। সে বিমূঢ়-বিস্ময়ে বিশুর দিকে চেয়ে রইল।

রজতের মতো অন্যান্য সকলেও বিশুর সত্যকার পরিচয় শুনে যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছিল। তারাও অবাক হ'য়ে কখনও শুভেন্দুর দিকে কখনও বা বিশুর দিকে চেয়ে দেখছিল।

সকলকে বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকতে দেখে' সহাস্যমুখে শুভেন্দু বলল: "একটু আশ্চর্য্য হবারই কথা বটে! বছর পাঁচেক পূর্ব্বে দেশের জন-সাধারণের মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলবার অপরাধে এঁর দেড় বছরের জন্য জেল হয়। সে সময়ে উনি যদি কোন রকম গোলমাল না করতেন তাহলে অবশ্য 'A' class prisoner হয়েই এখানে আসতেন কিন্তু ব্যাপারটা গড়ালো উল্টো দিকে। আদালতে যখন ওঁর বিচার হচ্ছিল এবং যে বাঙ্গালী ম্যাজিষ্ট্রেটটী ওঁকে দেড় বছরের জন্য জেল দিয়েছিলেন, সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে ওঁর এক সময়ে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। কলেজে পড়বার সময় তিনিও নাকি এঁদের সঙ্গে দেশের কাজে নেমেছিলেন। পরে আই-সি-এস হ'য়ে দেশে ফিরে এসে ওসব বদখেয়াল ছেড়ে দিয়েছিলেন। যাই হোক দণ্ডাজ্ঞা শুনে ইনি মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। সেই প্রকাশ্য আদালতের মাঝখানে যা মুখে এলো তাই বলে ইনি তাঁকে গালাগালি দিয়ে বসলেন। ফলে

আরও এক বছর মেয়াদ বেড়ে গেল এবং "a" class থেকেও বঞ্চিত হয়ে "c" class-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়লেন। তারপর জেলের মধ্যে এসে বেশ বাস করছিলেন, এখানকার দপ্তরখানায় একটা কেরাণীর কাজও করতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন একটি বাঙ্গালী অফিসারকে তাঁর অভদ্র ব্যবহারের জন্যে এমন প্রহার দিলেন যে তাঁকে প্রায় দু' মাস হাঁসপাতালে শুয়ে থাকতে হলো। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর মেয়াদ আরও বছরখানেকের জন্যে বেড়ে গেল। এর পরে অবশ্য কিছুদিন বেশ শান্ত হ'য়ে রইলেন। তারপর আবার একদিন ধরা পড়লেন এখান থেকে পালাবার অপরাধে। ফলে ওঁর কেরাণীগিরি গেল, হাতে পায়ে নতুন অলঙ্কার চড়ল এবং মেয়াদও বেড়ে গেল আরও দেড় বছরের জন্যে।"

শুভেন্দু স-প্রশংস দৃষ্টিতে কিয়ৎকাল বিশুর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার বল্‌তে আরম্ভ করল, "পূর্ব্বে এখানে যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের কাউকেই ইনি দেখতে পারতেন না; সম্ভবতঃ তাঁরাও এঁকে ঠিক মতো study করবার চেষ্টা করতেন না। কিন্তু আমি এখানে যাতায়াত আরম্ভ করবার পর থেকেই ওঁর মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। আজ প্রায় দেড় বছর হতে যায় এঁর তরফ থেকে আর কোন রকম গোলমাল ওঠেনি। জীবনে অনেক দুঃসাহসের কাজ ইনি করেছেন; সে সব adventure-এর কাহিনী সত্যিই শোনবার জিনিষ!"

শুভেন্দু বিশুর দিকে চেয়ে আবার একটু হাসল। অন্যান্য সকলের মতো রজতও মুগ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।

দুই

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে, কয়েদির পোষাক ছেড়ে বিশু তার ধুতী স্যাণ্ডেল ও ছিটের সার্টটি পরে জেলের প্রধান ফটকের নিকট এসে দাঁড়াল। তাকে বিদায় দেবার জন্যে শুভেন্দুও এসেছিল। মাঝে মাঝে কুশল সংবাদ দেবার জন্যে অনুরোধ করে, ম্লান ভাবে একটু হেসে সে তাকে বিদায় দিল।

জেল-ফটকের লোহার চৌকাঠ্‌টির ওপর দাঁড়িয়ে বিশু হঠাৎ বলল : "বন্দে..."

শুভেন্দু চম্‌কে উঠে সশঙ্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখল। তারপর অদূরস্থ নেপালী দ্বার-রক্ষীটির প্রতি একটা সভয়-কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে, ঈষৎ ইতস্তত: ক'রে অস্ফুটস্বরে বলল : "মাতরম্"...

রাস্তায় নেমে বিশু কিন্তু অত্যন্ত নিরাশ হ'লো। সে আশা করেছিল সহকর্ম্মীগণ, তার মুক্তির সংবাদ পেয়ে, তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্যে, নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে অবশ্যই এখানে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে কাউকে না দেখতে পেয়ে তাদের প্রতি তার মন বিষিয়ে উঠল। জেলের মধ্যে যতই তার মুক্তির দিন আসন্ন হ'য়ে আসছিল ততই তার মানশ্চক্ষে ভেসে উঠ্‌ছিল বড় বড় নেতাদের মুক্তি দিবসের বিরাট অভ্যর্থনায় মোহময় স্মৃতি। বড় বড়

ফুলের মালার ছড়াছড়ি! বিভিন্ন কণ্ঠের বিরাট 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনির কোলাহল! তারপর পুষ্পাচ্ছাদিত প্রকাণ্ড একটি মোটর গাড়ীতে চড়ে সদলবলে সহর পরিভ্রমণ!

বড় বড় নেতাদের অনুকরণে, জনসাধারণের তরফ থেকে বিরাট ভাবে অভ্যর্থিত হবার আশা অবশ্য কোন দিনই তার মনে স্থান পায় নি। কিন্তু তার সহকর্ম্মীবৃন্দ—বিশেষতঃ যাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল, তারা যে নিশ্চয়ই এসে তাকে জেলের ফটক থেকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যাবে এটুকু সে স্থির জানত। এমন কি ফুলের মালা এবং মোটর গাড়ীর আশাটাও ক্ষীণ ভাবে তার মনের কোনে জেগেছিল। কিন্তু রাস্তায় নেমে যখন সে একটিও পরিচিত মুখ দেখতে পেল না, তখন তাদের ওপর মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে ওঠা ছাড়া সে আর অন্য কোন পন্থা দেখতে পেল না।

বিরস মুখে মন্থর গতিতে চেত্‌লার পুল পার হ'য়ে সে কালীঘাট রোড্ আর হাজরা রোডের সঙ্গমস্থলে এসে উপস্থিত হ'লো। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছিল। বিভিন্ন কণ্ঠের বিচিত্র কলরবে জায়গাটা তখন গম গম করছিল। কালীঘাটের কালীমাতার নিকটতম প্রতিবেশিনী ও অন্তরঙ্গ প্রতিবেশীদের রহস্যময় পদবিক্ষেপে অনভিজ্ঞেরা মুহুঃমুহুঃ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌ছিল। সকলেই কিছু না কিছু একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বিশু শুধু অলস-মন্থর গতিতে রাস্তা অতিক্রম ক'রে চলেছিল। কোথায় যাবে সে! কার কাছে যাবে সে! দেশের কল্যানের জন্য সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল কারাদণ্ড ভোগ করার দাবী নিয়ে কার দ্বারস্থ হবে সে আজ!

মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে দাড়ীতে হাত বুলোতে বুলোতে সে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'লো।

অদূরস্থ ট্যাক্সী ষ্ট্যাণ্ডের নিকট দাঁড়িয়ে দুটি কুৎসিত দর্শনা স্ত্রীলোক, খাকী-সার্ট পরা একটা ড্রাইভারের সঙ্গে গল্প করছিল। বিশু অন্যমনস্ক হ'য়ে তাদের দিকেই চাইল। তাকে চেয়ে থাকতে দেখে একটি স্ত্রীলোক, তার সঙ্গিনীর গায়ে ঢলে পড়ল। তারপর তার স্বভাব-সুলভ কর্কশ কণ্ঠে খিল খিল করে হেসে উঠে কী একটা মন্তব্য করল।

অপর স্ত্রীলোকটি তখন বিশুর দিকে একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে তার অতিরিক্ত তাম্বুল চর্ব্বণের ফলে মিস্‌কালো রঙের দাঁতগুলি বার করে বলল: "তুই থাম্ টেঁপী! দাড়ী দেখছিস্ না—মিনসে দাগী চোর্—"

স্ত্রীলোকটার মন্তব্য শুনে বিশু চমকে উঠে আবার দাড়ীতে হাত দিল। দারুন ক্রোধে সমস্ত বাঙ্গালী জাতটার ওপরেই তার মন বিরূপ হয়ে উঠল। বাংলাদেশের জনসাধারণের নিকট দাড়ী জিনিষটা আজকাল শুধু দাগী চোরের অভিজ্ঞান স্বরূপই বিবেচিত হয়!

দ্রুতপদে সে সেখান থেকে স'রে গেল।

পকেটে তার মাত্র চৌদ্দটি পয়সা ছিল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জেলে ঢোকবার সময়ে এই চৌদ্দটি মাত্র পয়সাই ছিল তার পকেটে। পয়সাগুলি মুঠো করে ধরে সে অদূরস্থ টিনের শেডটির দিকে তাকাল। তার মনে হলো—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সে যেন এখানে দু'জন নাপিতকে বসে থাকতে দেখত।

সত্যই সেখানে দুজন হিন্দুস্থানী নাপিত ছিল। কিন্তু তারা তখন কাঁচি রেখে রুটি সেঁকছিল। তাদের একজনকে অনেক অনুরোধ

করে, প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পর সে সেই শেড-এর তলায় ইটের ওপুর গিয়ে বসল। এবং রাত্রি প্রায় সাড়ে নটার পর দশটি পয়সার বিনিময়ে চুল ছেঁটে দাড়ী কামিয়ে বেরিয়ে এলো।

এদিকে রাত্রি যতই বাড়্‌তে লাগল, তার মধ্যে আর একটা নতুন উপসর্গের উপদ্রব আরম্ভ হলো। দারুণ ক্ষুধায় সে অস্থির হ'য়ে পড়ল। কিন্তু পকেটে তার আর চারিটি মাত্র পয়সা আছে। তার মধ্যে থেকে কীই বা সে খাবে ও আর কী-ই বা সে পরের দিনের জন্যে সঞ্চয় করে রাখবে? বিশেষতঃ সে স্থির করেছিল আগামী কাল সে অনেক জায়গায় যাবে; অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে; তার ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচী সে আগামী কল্যর মধ্যেই স্থির করে ফেলবে। কিন্তু সবই তো পয়সা-খরচ সাপেক্ষ! তার সে পয়সা কোথায়? দারুণ অনুশোচনায় মন তার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌ল। রাহা-খরচ বাবদ গবর্ণমেণ্টের নিকট থেকে তার প্রাপ্যটা অমন তাচ্ছিল্য সহকারে ফিরিয়ে দিয়ে এসে সে আদৌ বুদ্ধিমানের মতো কাজ করে নি।

কিন্তু বর্ত্তমানের উৎকট পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখবার সুবিবেচনাটা তার সাময়িক ভাবে লোপ পেয়ে গেল। ব্যতিব্যস্ত হয়ে সে গলির পর গলি অতিক্রম করে চলল। শেষে বহু অনুসন্ধানের পর সত্য-পীর তলার নোংরা পল্লীটার মধ্যে সে একটা Pice hotel-এর সন্ধান পেল।

রাত্রি এগারটার পর দু'পয়সার ভাত এক পয়সার ডাল, এক পয়সার চিংড়ী-চচ্চড়ী ও ফাউ স্বরূপ দুটি পান মুখে দিয়ে সে রিক্ত-পকেটে মহাকালী ভোজনালয়ের চৌকাট পেরিয়ে রাস্তায় এসে নামল।

এবং 'পছ' করে বাড়ীর নালাটার ওপর একবার পানের 'পিক্' ফেলে হৃষ্ট চিত্তে কালীবাড়ীর নাট-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হ'লো।

নাট-মন্দিরে শুয়ে নির্ব্বিবাদে রাত্রিবাস করার কথাটা সে ইতিমধ্যেই স্থির ক'রে ফেলেছিল

*   *   *

প্রচণ্ড কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজে যখন তার ঘুম ভাঙল নাট-মন্দিরের ঘড়ীতে তখন বেলা আটটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে নিজের পায়ের দিকে চেয়েই সে চমকে উঠ্‌ল। স্যাণ্ডেল জোড়াটি ইতিমধ্যে সেখান থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিল।

সুনিদ্রার ফলে তার মনের ওপর থেকে গতকল্যকার সমস্ত গ্লানি নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল। কিন্তু স্যাণ্ডেল চুরীর ব্যাপারে আবার সে মুষড়ে পড়ল। কোলাহলমুখর নাট-মন্দিরটির মধ্যে আর এক মুহূর্ত্তও সে তিষ্ঠতে পারল না। সেখান থেকে নেমে যাত্রী-বহুল প্রাঙ্গনটির দিকে ভ্রূকুটী-কুটীল দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে ফটক পেরিয়ে উপস্থিত হ'লো সে একেবারে আদি-গঙ্গার তীরে।

অতি-পুণ্যকামী স্নানার্থিনীদের কৃপায় আদি-গঙ্গার ঘোলাটে জল তখন আরও ঘোলাটে হ'য়ে উঠেছিল। একটা অতি-প্রকাশ্যস্থানে নির্ব্বিকার মুখে প্রাতঃকৃত্য শেষ ক'রে জলের চেহারা দেখে সে হঠাৎ শিউরে উঠ্‌ল। অর্দ্ধেক কাজ গঙ্গায় সেরে বাকী অর্দ্ধেকটা সে রাস্তায় এসে কলের জলে সারল।

অবসন্ন শরীরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিল সে। ঠাকুরদাস পালিতের লেনের একটা মেসে তাদের দেশের রমেশ চৌধুরী থাকে।

অন্তত বছর পাঁচেক পূর্ব্বে থাকত। উপস্থিত সেইখানেই সে যাবে স্থির করল।

এক সময়ে এই কলকাতার সহরে তার বন্ধু-বান্ধব এবং ভক্ত-বৃন্দের অভাব ছিল না। কিন্তু আজ তাদের কারুর সঙ্গেই তার দেখা করবার প্রবৃত্ত হ'লো না। কিসের জন্য দেখা করবে সে তাদের সঙ্গে! তার কোন-কিছু ভাল-মন্দের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক তাদের! এই যে সে তাদের প্ররোচনায় পড়ে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল নিদারুণ কারাদণ্ড ভোগ করল তাতে তাদের কিছু এসে গিয়েছে কী! না হ'লে তার মুক্তির সংবাদ পেয়েও তারা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে রইল! জেলের ফটকে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে একটু উৎসাহিত করার প্রয়োজনও অনুভব করল না তারা!

ধীর-মন্থর গতিতে সে চড়কডাঙ্গার মোড়ে এসে উপস্থিত হ'লো।

হঠাৎ ঘোষ ব্রাদার্সের দেওয়াল সংলগ্ন ঘড়ীটার দিকে নজর পড়তেই সে চমকে উঠল। পৌনে দশটা বেজে গেছে? তবে আর ঠাকুর দাস পালিতের লেনে গিয়ে কী হবে? রমেশদা তো এতক্ষণ অফিসে চলে গেছে।

তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এখন কী করবে সে? কোথায় যাবে—কী খাবে! দু'মুঠো ভাতও যদি খেতে না পায়, তাহ'লে কিসের জোরে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াবে সে?

বিহ্বল দৃষ্টিতে সে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

চৌমাথার ওপর দাঁড়িয়ে একটি পুলিশ যান-বাহন নিয়ন্ত্রিত করছিল। তার হাত দেখানোর ফলে রমেশ মিত্তির রোডের দিক

থেকে একটা ছ'-সিলিণ্ডারের সিডান-বডি অষ্টিন গাড়ী বিশুর সুমখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ীর মধ্যে পিছনের আসনে দুটি তরুণী বসেছিল। তাদের দিকে দৃষ্টি পড়বামাত্র তাদের একজনকে সে চিনতে পারল। মেয়েটি লিলি। গতকাল জেলের মধ্যে রক্তদের সঙ্গে হুইল হাতে করে সেও মাছ ধরতে বসেছিল।

লিলি প্রথমে বিশুকে দেখতে পায় নি। কিন্তু বিশুকে একদৃষ্টে তাদের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে অপর মেয়েটি ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে অস্পষ্টস্বরে কী একটা মন্তব্য করল। সঙ্গিনীর মন্তব্য শুনে লিলি তখন বিশুর দিকে তাকাল এবং পরক্ষণেই বলে উঠল: আরে—আপনি? বিশ্বনাথ বাবু? আশ্চর্য্য—আসুন—আসুন…

বিশু কোন উত্তর দিল না। বিরস মুখে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

তিন

লিলির আদেশে ড্রাইভার ফুটপাথের ধার ঘেঁসে একেবারে বিশুর সামনে এনে গাড়ী দাঁড় করালো। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে সহাস্য মুখে লিলি বলল: ওকি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আসুন পৌঁছে দি—"

অপর মেয়েটি এতক্ষণ বিস্মিতদৃষ্টিতে বিশুর দিকে তাকিয়েছিল। তাকে উদ্দেশ ক'রে লিলি বলল: এই মিনিদি—হাঁ করে দেখছিস্ কী? বুঝতে পারছিস্ না,—ইনিই সেই বিশুবাবু, কাল মাছ ধরতে গিয়ে রজতদাদের সঙ্গে যাঁর ঠোকাঠুকী হয়েছিলো।

মিনি অর্থাৎ মিনতি তখন অপ্রস্তুত ভাবে একটু হেসে তাড়াতাড়ি একটি নমস্কার করে বলল: আসুন না—আপনাকে একটা lift দিয়ে যাই। কোথায় যাচ্ছিলেন?

এতক্ষণ পরে কথা কইবার মতো অবস্থা বিশুর ফিরে এলো। বিরসমুখে সে বলল: "কোথায় যাব?"

লিলি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। বলল: ওমা—তা আমি কী করে জানব?"

বিশুও তৎক্ষণাৎ তার ভুল বুঝতে পারল। সামলে নিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে সে বলল: ইয়ে—আমি এমনি একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।"

"এমনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন? কোন কাজে যাচ্ছিলেন না? তবে আমাদের ওখানে চলুন না? সত্যি—আপনার ম্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনতে এত ইচ্ছে করছে! কাল শুভেন্দু বাবুর মুখ থেকে যেটুকু শুনেছিলাম তাইতেই আমার পিলে চমকে গিয়েছিল। সত্যি—চলুন না একবার আমাদের ওখানে?"

নিজের নগ্ন-পদ এবং মলিন জামাকাপড়ের দিকে চকিতে একবার চেয়ে নিয়ে মৃদু হেসে বিশু বলল: সে কী করে হয়?"

"কেন হয় না? না—সত্যি, চলুন-চলুন..." লিলি হাত বাড়িয়ে বিশুর জামার আস্তিন ধরে আকর্ষণ করল।

লিলির আগ্রহ দেখে বিশু বিস্মিত হলো। সে হয়তো আরও কিছুক্ষণ আপত্তি প্রকাশ করতো কিন্তু অদূরস্থ ট্যাক্সী-ষ্ট্যাণ্ডের নিকট কয়েকটি বাঙ্গালী ট্যাক্সী ড্রাইভারকে তাদের দিকে চেয়ে হাসাহাসি করতে দেখে তার আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বাড়াতে প্রবৃত্তি হ'লো না। গুণ গুণ করে আপত্তি প্রকাশ করতে করতে সে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল। গাড়ী ছেড়ে দিল।

লিলির মতো একজন আপন-ভোলা চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ের পক্ষে বিশুর মতো একজন সদ্য-পরিচিত যুবকের আস্তিন ধরে টানা বা তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য অতখানি আগ্রহ প্রকাশ করাটা আদৌ অস্বাভাবিক না হলেও, তার এই অদ্ভুত ব্যবহারে বিশু কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। জন্মাবোধি সে যে সমাজের মধ্যে চলাফেরা করেছে, লিলির মতো মেয়ে বা গতকাল তার আর আর যে সব বন্ধু বান্ধবদের সে দেখেছিল, তারা যে ঠিক সেই সমাজের

লোক নয় এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি বিবেচনা তার ছিল। কিন্তু সে আশ্চর্য্য হলো লিলির ব্যবহারে। প্রথম দর্শনেই সে তার সঙ্গে এমন ভাবে কথা কইল—যেন তাদের কত কালের চেনা-পরিচয়! একটুও লজ্জা নেই, এতটুকু সঙ্কোচ নেই। বাড়ী ফিরে গিয়ে অভিভাবকদের নিকট জবাবদিহি করবার নেই ভয়। চমৎকার জীবন-যাত্রা প্রণালী এদের! ঈষৎ সঙ্কুচিত ভাবে লিলির দিকে ফিরে সে বলল: শুধু শুধু আমার জন্যে কাজের ক্ষতি হলো আপনাদের! যাচ্ছিলেন হয়তো বিশেষ কোন কাজে, আমার জন্যে সব গোলমাল হয়ে গেল!

লিলি ব্যস্ত হয়ে বলল: "কাজ আবার কোথায়? রঞ্জুদার দেরী দেখে আমরা তাকে আনতে যাচ্ছিলাম! আজ আমার বোনের জন্মদিন কিনা।"

বিশুও ব্যস্ত হয়ে বলল: "এই দেখুন তো কী মুস্কিলে ফেললেন! আপনাদের বাড়ীতে আজ কাজ-কর্ম্মের ভীড়, আর আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে চলেছেন গল্প শোনবার জন্যে? ছি, ছি, অপরিচিত লোক দেখে ওঁরাই বা কী ভাববেন।"

"বারে! অপরিচিত আবার কোথায়? কাল তো সকলেই আপনাকে দেখেছে। পুষি—মানে আমার দিদি আর কি—তাদের সকলকে আপনিও তো কাল দেখেছেন? আর আমার বাবা?… আপনার মতো একজন দেশ-কর্ম্মীকে পেলে তিনি যে কী করবেন—দেখবেন।" এই বলে সে মিনতির দিকে চেয়ে ফিক করে হাসল।

মিনতিও হাসল। হেসে বলল: কেন আপনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন? লিলির বাবা মিষ্টার ঘোষের সঙ্গে আলাপ করে আপনি সত্যিই সুখী হবেন। আর আপনার মতো লোককে পেলে তিনিও……"

কথাটা সে আর শেষ করতে পারল না। লিলির দিকে চেয়ে সেও ফিক্ করে একটু হাসল। বিশু আর আপত্তি না করে সস্মিত মুখে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল।

লিলিদের মতো উন্নত-মার্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও মেলা-মেশা করবার সুযোগ না পেলেও বিশু এদের সম্বন্ধে চিরকালই একটা খারাপ ধারণা মনে মনে পোষণ করে এসেছিল। কিন্তু আজ আর তার সে ভাব রইল না। ওদের সংস্রবের সকলকেই আজ যেন তার অত্যন্ত ভাল লাগছিল। জেল থেকে মুক্ত হবার পর মুহূর্ত্ত থেকেই—ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মী এবং ভক্ত-বৃন্দের কাউকে ফটকের বাইরে না দেখে—তার মতো একজন স্বদেশ-সেবীকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সেখানে কাউকে উপস্থিত না দেখে সমস্ত বাঙ্গালী জাতটার ওপরই তার মন বিষিয়ে উঠেছিলো। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা অতিক্রম করতে না করতেই লিলির তরফ থেকে যখন সে প্রথম অভ্যর্থিত হলো; কথার ফাঁকে ফাঁকে লিলি ও মিনতি তাকে "আপনার মতো দেশ-কর্ম্মী" বলে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করল তখন তার পূর্ব্বের ধারণা বদলে যেতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হ'লো না। মনে মনে তখন সে স্বীকার করল সাধারণ বাঙ্গালীদের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই একমাত্র শিক্ষিত-মানুষ। তাই এরা তার মতো একজন স্বদেশ-সেবীর মর্য্যাদা বোঝে!

গাড়ী ল্যান্সডাউন রোড্ একস্‌টেন্‌সন্ অতিক্রম করে বালীগঞ্জের দিকে অগ্রসর হ'লো। লিলিদের বাড়ী বালীগঞ্জে। গাড়ী ক্রমে তাদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগল।

হঠাৎ লিলি মিনতিকে বলল: বাড়ী গিয়ে হয়ত দেখব—রজতদা পুষির সঙ্গে জমে গেছে—কী বল্ ?"

"বোধ হয়।"

রজতের নাম শুনে বিশুর মনটা আবার খারাপ হ'য়ে গেল। প্রথম থেকেই লোকটাকে তার ভাল লাগে নি। যদিও আঘাতটা নির্মমভাবে তার দিক্ থেকেই বর্ষিত হয়েছিল। গম্ভীর মুখে সে লিলিকে প্রশ্ন করল: রজত বাবুদের সঙ্গে আপনাদের বুঝি অনেক দিনের আলাপ ?"

"হ্যাঁ অনেকদিনের। ওঁর বাবা আমার বাবার ক্লাস-ফ্রেণ্ড কিনা—খুব বন্ধুত্ব। সেই স্কুল থেকে ওঁরা দুজনে একসঙ্গে বেড়াতেন। বিলেতেও একসঙ্গে গিয়েছিলেন—একসঙ্গেই থাকৃতেন।"

"ও:—

গাড়ী এসে বাড়ী পৌঁছল।

প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি দোতলা বাড়ী;—সম্মুখে বাগান; বাগানের মধ্যে টেনিস-কোর্ট। বাগান অতিক্রম করে গাড়ী এসে গাড়ী-বারান্দার তলায় থামল।

গাড়ী-বারান্দার পরই একটি বিরাট হল। তার দু'পাশে চারখানি প্রশস্ত কক্ষ। হলের মধ্যে তখন অনেক লোক জমায়েৎ হয়েছিল, তাদের মধ্যে রজতও ছিল—গতকল্য-দৃষ্ট আর সকলেও ছিল। হঠাৎ লিলির সঙ্গে নগ্ন-পদে মলিন-বেশে বিশুকে প্রবেশ করতে দেখে প্রথমে সকলেই বিস্মিত হলো। পরে পরিচয় পেয়ে কেউবা এগিয়ে এসে তার কর-মর্দন করল; কেউ দূর থেকেই নমস্কার করে কাজ শেষ করল।

লিলি প্রশ্ন করল : বাবা কই ?

পুষ্প ওধারে ছিল। এগিয়ে এসে বলল : ওপরে আছেন। পরে বিশুর দিকে চেয়ে বলল : আসুন, আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই। এই বলে বিশুকে সঙ্গে নিয়ে সে কক্ষ ত্যাগ করল।

ওপরে ওঠ্‌বার সিঁড়ির নিকট এসে পুষ্প হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মুহূর্ত্তকাল বিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে কী যেন ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বলল : বাবার কাছে গেলে সহজে তো ছাড়া পাবেন না! তার আগে বরং কিছু খেয়ে নিন।"

বিশু কোন উত্তর দিল না। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে পুষ্পর দিকে চেয়ে রইল।

পুষ্পকে গতকাল সে অতটা লক্ষ্য করে নি। কিন্তু আজ তাকে দেখে একটু আশ্চর্য্য,—একটু মুগ্ধ না হয়ে পারল না। লিলির সঙ্গে সে বেশ সহজ ভাবে কথা কইতে পেরেছিল কিন্তু এর সঙ্গে কথা কইতে গেলেই মনটা হঠাৎ কেমন যেন ভীরু হয়ে যায়। লিলি কথা কয় বেশী, অপরকে কথা বলবার সুযোগ দেয় কম। এ কথা কয় কম কিন্তু অপর পক্ষের কথা বলবার সুযোগ গ্রহণ করাটাও এর ক্ষেত্রে যেন অত্যন্ত অস্বস্তিকর হয়ে পড়ে। লিলি হাঁটে যেন দৌড়ে। তার গতিভঙ্গীর মধ্যে হয়তো বা কিছু মাধুর্য্য আছে, কিন্তু তা চোখ চেয়ে দেখবার জন্য সুযোগ খুঁজতে হয় না। কিন্তু এর গতিভঙ্গী যেন ধীর স্থির মরালের মত মন্থর। সে ভঙ্গিমার সৌন্দর্য্য নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠে কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তার শাড়ীর ঈষৎ আন্দোলিত প্রান্তভাগটি ছাড়া আর যেন উর্দ্ধে উঠ্‌তে সাহসী হয় না।

লিলির গায়ের রং ফর্সা—খুব ফর্সা, ক্ষীণ ভাবে চাঁপা ফুলের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু এর রং ফর্সা হলেও খুব নয়। মানশ্চক্ষে ভেসে ওঠে শুধু দুধে-আলতা সংমিশ্রনের ফলে, ঈষৎ মলিন, ঈষৎ ম্লান অথচ অত্যদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময় একটা অপূর্ব্ব শুভ্রতা। লিলির চুল ঠিক কালো নয়, ঈষৎ তাম্রবর্ণ; ভ্রূর রংও তাই। কিন্তু এর ভ্রূ ও কেশের বর্ণ নিবিড় কাল অধিকন্তু চুলগুলি স্বভাব কুঞ্চিত। লিলি পরে হাই হিল, রঙীন শাড়ী। এ পরে নাগরা জুতো, শাদা শাড়ী। লিলির সৌন্দর্য্য সকলে সহজে উপভোগ করে। কিন্তু এর সম্বন্ধে সে প্রশ্নই ওঠে না,—এ যেন আপন মহিমায় আপনিই মহিমান্বিতা।

বিশুকে বিমূঢ় বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে পুষ্প মাথা নীচু করল। পরে অস্ফুটস্বরে বলল ঃ আসুন······

চার

লিলি-পুষ্পর পিতা মিঃ ঘোষ একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। বেশীর ভাগ সময়েই তিনি তাঁর বিরাট লাইব্রেরী ঘরটির মধ্যে বসে বেদান্ত-সূত্র ব্রহ্মভাষ্য প্রভৃতি মোটা মোটা পুঁথিপত্র নিয়ে নাড়া-চাড়া করেন, বাইরের জগতের কোন কিছুরই খবর রাখেন না। ছোটখাট ব্যাপার সাধারণত তাঁর মনে স্থান পায় না; পরন্তু অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপারকেও তিনি অতি জটীলরূপে দেখে থাকেন। বয়সে বৃদ্ধ হলেও তিনি প্রগতির উপাসক; নবীনদের মতবাদকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। যৌবনে ইনি নিজের সনাতনপন্থী পিতার নিকট থেকে তাঁর তদানীন্তন আধুনিক মতবাদ সংসারের মধ্যে সু-প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে পদে পদে বাধা পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজে যখন বৃদ্ধ হলেন তখন অতীতকে আঁকড়ে ধরে রাখবার মতো ভুল তিনি করলেন না। কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে তিনি বর্ত্তমানের জয়গানে মুখর হয়ে উঠলেন। আধুনিকদের নিকটেও তিনি অতি-আধুনিকরূপে পরিগণিত হয়ে উঠলেন। ফলে আপাতদৃষ্টিতে তাঁর সংসারের মধ্যে কোনরূপ অশান্তির বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত না হলেও আত্মীয়-স্বজনদের নিকট তিনি যেন ক্রমেই উপহাসের পাত্র হ'য়ে উঠতে লাগলেন। আড়ালে অনেকেই

তাকে পাগল বলে অভিহিত করতে আরম্ভ করল। কিন্তু কিছুতেই তিনি তাঁর মত পরিবর্ত্তন করলেন না।

বাড়াবাড়ি অবশ্যই তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু এই বাড়াবাড়িটাকেই তিনি তাঁর চিরন্তন কাম্য বলে প্রচার করতে লাগলেন। তিনি বললেন : বাড়াবাড়ি মানেই ছড়াছড়ি। যেখানে আনন্দের ছড়াছড়ি সেইখানেই তো স্বর্গ! স্বর্গই তো সকলের কাম্য। এবং যে সেই স্বর্গ রচনা করতে পারে সেই তো সকলের চাইতে সুখী!

বলা বাহুল্য এই স্বর্গ রচনার জন্য তাঁর বিশাল জমিদারীর বিরাট আয়ের বেশ বড় একটা অংশ ব্যয় করতে হতো। কিন্তু তার জন্যে কেউ কখনও তাঁকে ইতস্ততঃ করতে দেখেনি। আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে তাঁর মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে পর তিনি সশব্দে হেসে উঠে জবাব দিতেন : অতীতের মতো ভবিষ্যৎ বিলাসীও তিনি নন। তাঁর একমাত্র পরিচয় তিনি বর্ত্তমানের পূজারী। তাই লিলি ও পুষ্পর সঙ্গে বিশুকে ঘরে ঢুকতে দেখে তাকে তাঁর বর্ত্তমান স্বর্গেরই একজন দেবদূত কল্পনা করে, সাড়ম্বর অভ্যর্থনার আতিশয্যে তিনি তাকে চঞ্চল করে তুললেন।

পুষ্প বলল : বাবা—ইনি একজন দেশকর্ম্মী...

লিলি বলল : সবে কাল জেল থেকে বেরিয়েছেন। দেশের সেবা করতে গিয়ে এঁকে কত দুঃখ সইতে হয়েছে তা শুনলে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে বাবা।

লিলির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশ-কর্ম্মীদের অলৌকিক আত্মত্যাগের ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখিয়ে মিঃ ঘোষ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে

একটা বিরাট বক্তৃতা ফেঁদে বসলেন। ব্যাপার দেখে লিলি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে সরে পড়ল। পুষ্প শুধু চেয়ারের ওপর বসে পিতার কথা শুনে যেতে লাগল।

প্রায় পনের মিনিট পরে বক্তৃতা থামিয়ে তিনি দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন: "তারপর—আপনার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে কী স্থির করেছেন ?"

বিশু বলল: "এখনও কিছু ঠিক করিনি। তবে ইচ্ছে আছে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে কিছু কিছু গঠনমূলক কাজ করব। বক্তৃতা আর দোব না।

বিতৃষ্ণায় টেবিলের ওপর প্রচণ্ড একটা মুষ্টাঘাত করে মিঃ ঘোষ বললেন: "ঠিক, খুব সত্যি কথা! বক্তৃতা আবার কী—গঠনমূলক কাজই তো আসল কাজ।" এই বলে বক্তৃতা দেওয়ার বিরুদ্ধে ও গঠনমূলক কাজের স্বপক্ষে আর একটা বক্তৃতা দিতে উদ্যত হলেন। এমন সময়ে রজতের সঙ্গে লিলি আবার এসে ঘরে ঢুকল।

রজতকে দেখেই বক্তৃতা থামিয়ে মিঃ ঘোষ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। হঠাৎ কী যেন একটা পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করবার চেষ্টা করতে করতে বললেন: "হ্যাঁ হে রজত তোমাদের কি একটা দল ছিল না? দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবার জন্যে তোমরাও কী সব করে বেড়াতে না?"

প্রশ্ন শুনেই রজতের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। একটা ঢোক গিলে ইতস্ততঃ করে সে বলল: "সে কি—কে বললে?"

মিঃ ঘোষ চিন্তিত স্বরে বললেন : "কে যেন বলেছিল—ঠিক মনে পড়ছে না। ধাঃ, আমার ব্রেনটা দেখছি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। একবার ডাক্তার পাল চৌধুরীকে দেখাতে হবে। তোমরা ডাক্তার পাল চৌধুরীকে চেন তো? চেন না? তবে শোন—"

এই বলে ডাঃ পাল চৌধুরী সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা ফাঁদবার উপক্রম করলেন; কিন্তু বাধা পড়লো। টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে রজত বলল : "একবার মনে করবার চেষ্টা করুন না—কে বলেছিল কথাটা?"

—"এ্যাঁ—কে বলেছিল কথাটা—মানে,তোমার দলের কথা? আচ্ছা দাঁড়াও।"

মিঃ ঘোষ চিন্তিত মুখে আবার ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। রজত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। পুষ্প ছাড়া আর সকলে আশ্চর্য্য হয়ে উভয়ের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

—"কিছুতেই মনে পড়ছে না তো! তোমাদেরই কোন বন্ধু বলেছিল বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা দাড়ীতে কার একটা আঁচিল আছে বলতো?"

—"আঁচিল—দাড়ীতে?" রজত চঞ্চল হয়ে একবার পুষ্পর দিকে তাকাল। তারপর বলল : "দাড়ীতে আঁচিল তো আমাদের শুভেন্দুর আছে।"

ব্যস্ত হয়ে মিঃ ঘোষ বললেন : "ঠিক—ঠিক। ওই শুভেন্দুই একদিন বলেছিল বটে।"

—"কবে বলেছিল?"

—"কবে?—তা অনেকদিন হবে। সেই যে চাটগাঁয়ের ব্যাপারটা নিয়ে যখন খুব হৈ-চৈ হচ্ছিল—সেই সময়ে। ও তখন ইলিসিয়াম রো-এ কাজ করতো! সময় পেলেই আমার কাছে এসে দু-দণ্ড গল্প করে যেত।"

রজত আবার প্রশ্ন করল: "সে আর কিছু বলেছিল?"

—"হ্যাঁ বলেছিল বই কি। অনেক কিছুই তো তখন বলেছিল। কিন্তু—"

—"আঃ তোমাদের জ্বালায় কী আমরা বাড়ী ছেড়ে পালাব?"...

লিলি এতক্ষণ কোনরকমে চুপ করেছিল—আর পারল না। উত্তেজিত স্বরে সে বলল: "আমরা বসে কখন থেকে অপেক্ষা করে বসে রইছি—বিশুবাবুর adventure-এর গল্প শুনব বলে! তোমাদের কথা আর শেষই হয় না! আসুন বিশুবাবু, রজতদা যতখুসি গল্প করুক এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।"

এই বলে সে বিশুর আস্তিন ধরে সজোরে টান মারল। জামাটা প্রায় সাড়ে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার কেনা,—লিলির সজোর আকর্ষণ সে সহ্য করতে পারল না। পড়্‌পড়্‌ করে বাহুর নীচে খানিকটা জায়গা ছিঁড়ে গেল।

সকলে হো হো শব্দে হেসে উঠল। লিলি তখন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে মুখ-চোখ লাল করে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

তার গমন পথের দিকে হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রজত বলল: আঠার বছর বয়স হলে কী হবে—একেবারে ছেলেমানুষ! চলুন বিশুবাবু আমরা নীচে যাই। সকলে অপেক্ষা করে রয়েছে।"

—"চলুন।" বিশু উঠে দাঁড়াল

মিঃ ঘোষ বললেন: হ্যাঁ, তোমরা যাও। এই কঠোপনিষদটার একটা হেস্ত-নেস্ত করে আমিও নীচে যাচ্ছি। এই বলে চশমাটা চোখে লাগাতে লাগাতে তিনি তৎক্ষণাৎ টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

তাঁর দিকে চেয়ে একটু হেসে বিশুর হাত ধরে রজত ঘরের দরজার দিকে অগ্রসর হলো। পুষ্পও তাদের অনুসরণ করল।

ঘর থেকে বেরিয়েই সিঁড়ি। সিড়ির চাতালের ওপর এসে হঠাৎ রজতের হাত দুটো মুঠো ক'রে ধরে বিশু আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলল: রজতবাবু আমাকে মাফ করতে হবে। কাল আপনাকে চিনেও চিনতে পারিনি—আজ এইমাত্র পারলাম। সেদিন আমাদের দু'জনের পথ এক ছিল না। কিন্তু আজ যদি আমাকে দলে নেন, তাহলে আপনার আর দেশের স্বার্থের জন্যে আমি আমার রক্তের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত..." হঠাৎ পিছন দিকে চেয়ে পুষ্পকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে সন্ত্রস্ত হয়ে সরে দাঁড়াল।

রজত হাসল। বিশুর কথা শুনে প্রথমে তার চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল! কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য! পরক্ষণেই সেখানে ফুটে উঠল একটা স্নেহ-করুণ হাসির রেখা। পুষ্পর দিকে চেয়ে সে স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করল: "তোমার আপত্তি আছে পুষ্প?"

পুষ্প এতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বিশুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর রজতের কথা শুনে বিশু যেমনি চমকে উঠে তার দিকে তাকাল অমনি সে মুখ নীচু করল।

রজত আবার বলল : "কাল শুভেন্দুর মুখ থেকে এঁর চরিত্রের যতটুকু পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে মনে হয় এঁকে দলে নিলে আমাদের কোনদিনই ঠক্‌তে হবে না।"

পুষ্প কোন উত্তর দিল না। তাকে নীরব দেখে একটু এগিয়ে এসে তার কাঁধের ওপর একটি হাত রেখে মৃদুস্বরে রজত আবার বলল : "ওঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখ পুষ্প! দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল জেল খাটবার পরও যার মধ্যে এতখানি উত্তেজনা বর্ত্তমান, তাকে অস্বীকার করা যায় না।"

পুষ্প তবুও কোন উত্তর দিল না। রজত তখন ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল : "ওঁর সব দায়িত্ব আমার—এর পরও তুমি আপত্তি করবে?"

পুষ্প এবার উত্তর দিল। রজতের হাতটি নিজের কাঁধ থেকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বলল : "না"—

পুষ্পকে কাঁধ থেকে তার হাতটি নামিয়ে দিতে দেখেই রজত লজ্জিত-ভাবে একটু সরে দাঁড়িয়েছিল। গভীর লজ্জায় তার মুখ আরক্তিম হয়ে উঠেছিল। সে আর বিশুর দিকে চাইতেই পারল না।

পুষ্পর মুখে কিন্তু কোন ভাবান্তরই দেখা দেয়নি। পাথরে-কোঁদা নির্জ্জীব মূর্ত্তির মতো সে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু বিশুর মুখ-চোখ হঠাৎ এক প্রকার রহস্যময় হাসির ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

পাঁচ

খ্যাত-নামা ব্যারিষ্টার, বিপুল বিত্তশালী রাজীব রায়ের একমাত্র সন্তান রজতকে যে তার পরিচিত অপরিচিত সকলেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো, সে তার পিতার বিপুল অর্থ-সম্পদের জন্য মোটেই নয়। রজত ছিল ঠিক সেই শ্রেণীর যুবক, যাদের দীপ্ত প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি সহ্য করতে না পেরে পারিপার্শ্বিক জন-সাধারণ তাদেরকে অসাধারণের পংক্তিভুক্ত করে দিয়ে অকারণেই নিজেরা অতি-সাধারণের পর্য্যায়-ভুক্ত হয়ে পড়ে। এদেরকে স্ব-প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য চেষ্টা করতে হয় না। অতি রহস্য-জনক ভাবে কোন একটা সূক্ষ্ম অনুভূতির তীব্র প্রেরণার দ্বারা চালিত হয়ে এরা এগিয়ে চলে প্রদীপ্ত উৎসাহে। কী বিরাট, কী তুচ্ছ, কারুর দ্বারাই এদের অগ্রগতি ব্যাহত হয় না। কিন্তু নিজেদের এই complex সম্বন্ধে এরা যতক্ষণ অচেতন থাকে, মাত্র ততক্ষণই এদের প্রতিষ্ঠা অব্যাহত থাকে। নচেৎ অত্যুগ্র অহমিকার জ্বালায় এরা নিজেরাও যেমন জ্বলে মরে, অপরকে পুড়িয়ে মারতেও তেমনি এদের বেশী সময় লাগে না।

রজত ছিল ঠিক এই শ্রেণীর যুবক। তাদের "মুক্তি-সঙ্ঘের" প্রতিষ্ঠাতা—সে যুগের একজন নাম-করা বিপ্লবীর অকস্মাৎ তিরোধানের পর দলের সভ্যরা যখন তাকে নির্ব্বিচারে দলপতির আসনে এনে বসাল

তখন সে মোটেই আশ্চর্য্য হয় নি। এমনিই নির্ব্বিকার মুখে সে সেই বিরাট দায়িত্ব-ভার মাথায় তুলে নিয়েছিল, যেন এতদিন সে এরই জন্যে অপেক্ষা করছিল। এতটুকু ইতস্ততঃ না করে এ কার্য্যের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা না করে, সে সহাস্যমুখে মাথায় তুলে নিল সেই শতাধিক চরমপন্থী বিপ্লবীর বিপর্য্যস্ত জীবনের সকল দায়িত্ব, সকল সমস্যা।

তার মুক্তি-সঙ্ঘের প্রধানের আসন গ্রহণ করবার কিছুদিন পর থেকেই সঙ্ঘের সভ্য সংখ্যা আশাতীত রূপে বাড়তে আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সঙ্ঘ পূর্ব্বে যে সব বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হবার চেষ্টা করতো, তাদের সেই লক্ষ্য স্থির থাকলেও পথ বদলে গেছে। রজতের সুনিপুণ সংস্কারের ফলে জীবন তাদের আর ঠিক পূর্ব্বের মতো ক্ষণস্থায়ী নয়। পুলিশের ভয়ে রিভলবার হাতে করে দিন-রাত আর তাদের সন্ত্রস্ত হয়ে বেড়াতে হয় না। স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আর তাদেরকে পোর্ট ব্লেয়ারের অত্যুত্তুঙ্গ তরঙ্গ-সঙ্কুল নীল জল-রাশির দিকে চেয়ে চোখের জল ফেলতে হয়না। ক্রমে তারা মানুষ রজতকে দেবতার আসনে বসাল।

এদিকে বিপদের গুরুত্ব যত কমে আসতে লাগল সঙ্ঘের সভ্য সংখ্যাও ঠিক সেই পরিমানে বেড়ে যেতে লাগল। শুধু পুরুষ নয়, কয়েকটি মেয়েও দলে যোগদান করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল। ব্যাপার দেখে রজত পুষ্পর স্মরণাপন্ন হলো।

পুষ্প ছিল তার ছেলে-বেলাকার সাথী, তার আবাল্য সহচরী। সে কথা কয় কম, কাজ করে বেশী। অতি-পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতাসূত্রে

রজত সম্বন্ধে হয়তো বা তার মনের কোণে কোন দুর্ব্বলতা সুপ্ত ছিল, তাই রজত তাকে অনুরোধ করবামাত্রই কোন রকম দ্বিধা না করে সে সেই বিপ্লবীর দলে নাম লেখাল। বৎসর না ঘুরতে ঘুরতে মেয়েদের মুখ-পাত্রী স্বরূপ সঙ্ঘের মধ্যে সে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বসল।

লোকে কথায় বলে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। রজতের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে সঙ্ঘের সভ্য সংখ্যা এঁদিকে যেমন এক শত থেকে পাঁচ শত-তে গিয়ে দাঁড়াল, ওদিকে তেমনি তার একাধিপত্যের দিকে কটাক্ষ করে দলের মধ্যে কেউ কেউ যুক্তি তর্কের জাল বুনতে আরম্ভ করল। ক্রমে প্রতি কার্য্যেই রজত যখন পুষ্পর মতামতকে প্রাধান্য দিতে আরম্ভ করল তখন দলের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াল। তারা দাবী করল পুষ্পর মতামতের সত্যই যদি কোন গুরুত্ব থাকে তবে তা নিয়ে তিনি সাধারণ ভাবে প্রকাশ্যে সকলের সঙ্গে আলোচনা করবেন না কেন! মুক্তি-সঙ্ঘ বলতে তার পাঁচ শত সভ্যকে বাদ দিয়ে শুধু পুষ্প বা রজতকেই বোঝায় না। দলপতির ব্যক্তিগত জীবনে পুষ্পর অভিমতের যদি অন্য কোন মূল্য থাকে—থাকুক তার সঙ্গে সঙ্ঘের স্বার্থের কোন সংশ্রব নেই।

ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে দেখে রজত সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে এই আইন প্রস্তুত করল যে—এর পর থেকে সঙ্ঘের মধ্যে ডিক্‌টেটর বলে কেউ থাকবে না। পাঁচ শত সভ্য কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত চল্লিশজন বিশিষ্ট সভ্যকে নিয়ে একটি বোর্ড করা হবে এবং দলপতি স্বয়ং সেই বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে সঙ্ঘের সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করবেন।

কিছুদিনের মধ্যেই বোর্ডের সৃষ্টি হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিল। ভবিষ্যতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সকলেই দল পাকাতে আরম্ভ করল। সঙ্ঘের আসল উদ্দেশ্যর কথা বিস্মৃত হয়ে সকলেই স্ব-প্রধান হবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। এই দলাদলির হাত থেকে কেউই উদ্ধার পেল না। রজতের চেষ্টায় মেয়েদের তরফ থেকে পুষ্পও বোর্ডের একজন সভ্য হলো। এবং বিশিষ্ট সভ্য হওয়ার ফলে পুষ্পর মতামতের প্রাধান্য পূর্ব্বের মতোই সঙ্ঘের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রইল।

দলের মধ্যে যখন এইরূপ একটা বিশৃঙ্খলতার প্লাবন বয়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে বিশু সঙ্ঘের খাতায় নাম লেখায়; এবং দু'মাস না যেতে যেতেই একটা বিশেষ অধিবেশন ডেকে বিশেষরূপ তদ্বির করে রজত তাকেও বোর্ডের একজন সভ্য ক'রে নিল। সঙ্ঘের মধ্যে যারা যারা পল্লীতে গিয়ে গঠনমূলক কাজ করবার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠদের তুমুল আন্দোলনের ফলে বিশু তাদের পরিচালক পদে বরিত হলো।

বিশু পূর্ব্বে কংগ্রেস-কর্ম্মীরূপে যখন দেশে দেশে ঘুরে বেড়াত সেই সময় বহুবার তার এই মুক্তি-সঙ্ঘের সভাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল। সেই সময়েই সে একবার এদের দলপতি রজতকে দেখেছিল এবং তার নানাবিধ বিপদজনক কার্য্যকলাপের কথা শুনে তাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনও করেছিল মনে মনে। সে সময়ে এরা পুলিশের ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকিলেও, কাজও কিছু কম করেনি। তখন এরা ছিল পরিপূর্ণরূপে "এনারকীষ্ট্।" একাধারে সাম্রাজ্যবাদী ও নন্‌ভায়োলেন্স

আন্দোলন-কারীদের ঘোরতর শত্রু। সেই সময়ে বিশুও কংগ্রেসের কাজ করে বেড়ালেও মনে-প্রাণে ছিল একজন চরম পন্থী। "এনারকীষ্ট"-দেরকে নানারূপ রহস্যজনকও বিপদসঙ্কুল কাজ-কর্ম্ম করে বেড়াতে দেখে অনেক যুবকের মতো সেও তখন মনে মনে তাদের কার্য্যকলাপ সমর্থন করতো। এবং সেই জন্যেই সে সেদিন রজতের দলভুক্ত হবার জন্য অতখানি আগ্রহ প্রকাশ করে ছল। কিন্তু দলের মধ্যে এসে সঙ্ঘের বর্ত্তমান আইন-কানুন ও কার্য্য-কলাপ দেখে সে আর তার পূর্ব্বের শ্রদ্ধা বজায় রাখতে পারল না। সে দেখল এরা পিস্তল ব্যবহার করে না, চরখাও ঘুরায় না। কী যে করে তাও সব সময় বোঝা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে তার মতো একজন সত্যকার দেশ-কর্ম্মী এদের সঙ্গে মিশে অকারণ সময় নষ্ট করবে কেন? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তার—বিশিষ্ট সভ্যদের সুখ-সুবিধার জন্যে সঙ্ঘের বিপুল দায়িত্বের কথা। আজ সে রজতের কৃপাতেই সুকুমার সেনের অফিসে দেড়-শো টাকা মাইনের চাকুরী করে; Y.M.C.A. হোষ্টেলে পূব-দক্ষিণ খোলা একটি সুসজ্জিত কক্ষের মধ্যে সাড়ম্বরে রাত্রি বাস করে; দক্ষিণ কলিকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুমূল্য পোষাক পরে সদম্ভে ঘুরে ফিরে বেড়ায়। অথচ প্রথম যেদিন সে এখানে এসেছিল তখন তার পায়ে আট-আনা দামের একজোড়া স্যাণ্ডেলও ছিল না। রজতের আশ্রয় না পেলে আজ তার দু'বেলা অন্নও জুটতো কিনা সন্দেহ!

ব্যাপার দেখে প্রকাশ্যে কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ না করলেও তার মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড সংগ্রাম বেধে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় না দেশের স্বার্থ বড়? কোনটাকে ত্যাগ করে কোনটাকে বজায় রাখবে সে? পূর্ব্বের মত কংগ্রেসের এক-ঘেয়ে বিরক্তি-কর পরিস্থিতির মধ্যে

ফিরে যাওয়ার কোন ইচ্ছা তো তার ছিলই না—উপায়ও ছিল না। মুক্তি সঙ্ঘের সভ্য হওয়ার ফলে তার জীবন-যাত্রা প্রণালী এমন অদ্ভুত ভাবে বদলে গিয়েছিল যে, মোটা খদ্দরের কাপড়-জামা পরে মোটা চালের ভাত খেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কু-শিক্ষিত চাষাদের সঙ্গে মিশে দেশের কাজ করবার চিন্তাও তার নিকট অসহ্য বোধ হচ্ছিল। বিশেষতঃ সঙ্ঘ ত্যাগ করবার উপায়ও আর তার ছিল না। আপাত দৃষ্টিতে সঙ্ঘের সভ্যরা পিস্তল ত্যাগ করলেও নন্‌ভায়োলেন্সের প্রশ্ন আজও তাদের মনে উদিত হয় নি; সঙ্ঘ ত্যাগকারীর শাস্তি সম্বন্ধে আজও তারা পূর্ব্বের আইনই মেনে চলতো। সঙ্ঘ ত্যাগকারীর একমাত্র শাস্তি ছিল মৃত্যু।

কিন্তু ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার চিন্তা ক্রমে মুখ্য চিন্তা রূপে তার অন্তরে বাসা বাঁধলেও কিছু একটা করবার প্রেরণা তখনও তার মধ্যে ক্ষীণ ভাবে জেগেছিল। বোর্ডের বিশিষ্ট সভ্যপদে অধিষ্ঠিত হবার পর মাস তিনেক যেতে না যেতেই একটি বিশেষ অধিবেশনে সে একটা প্রস্তাব আনল: সঙ্ঘ ত্যাগকারীর শেষ পরিণাম যদি মৃত্যুই হয়; সঙ্ঘের তহবিল বাড়ানোর জন্যে আজও তাদেরকে যদি ভায়োলেন্সেরই আশ্রয় নিতে হয় তাহলে তারা পরিপূর্ণরূপে ভায়োলেন্সপন্থীই বা হবে না কেন?

প্রস্তাবটির মধ্যে অভিনবত্ব কিছু না থাকলেও দলের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। এবং প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে যাতে শীঘ্রই আইনে পরিণত হয় বিশু তার জন্যে বিশেষ ভাবে তদ্বির করে বেড়াতে লাগলো। ঠিক এই সময়েই তার জীবনে আশাতীত-রূপে এমন একটা সুযোগ এলো, যার ফলে, তার প্রস্তাবটি অতি অল্প দিনের মধ্যেই আইনে পরিণত হ'য়ে গেল।

ছয়

মিনতিদের বাড়ীতে সেদিন বিশেষ কারণে একটা উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। কারণটি হচ্ছে,—মিনতিদের জমীদারী গোকুল নগরের ঠিক পাশেই প্রকাণ্ড একটা মহাল বিক্রী ছিল। মিনতির পিতামহ জনার্দ্দন ঘোষাল মহাশয় সেটা প্রায় দখল করে ফেলেছেন। মহালটার ওপর ঘোষাল মহাশয়ের বহুদিন থেকেই লোভ ছিল। কিন্তু কিনে উঠতে পারেন নি। হঠাৎ তাঁর সে মনোস্কামনা পূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে। গতকাল তিনি বায়না দিয়ে ফেলেছেন; বাকী টাকাটা আর মাসখানেকের মধ্যে দাখিল করতে পারলেই জমিদারীর মালিক হবেন তিনি!—সংবাদটা আনন্দের তাই এই উৎসবের আয়োজন।

অভ্যাগতদের বসবার ব্যবস্থা হয়েছিল দোতলার প্রকাণ্ড হলটির মধ্যে। মিনতির ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধবীরা সকলেই প্রায় এসে হাজির হয়েছিল সন্ধ্যার পূর্ব্বে। বিশুও যথাসময়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল রজত পুষ্প প্রভৃতির সঙ্গে। সমবেত তরুণ-তরুণীর নৃত্য-গীত হাসি উচ্ছ্বাসে হলের মধ্যে তখন যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল।

হলের এক প্রান্তে কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে বসে শুভেন্দু কী যেন

একটা ষড়যন্ত্র করছিল। হঠাৎ একটা ছোট টিপয়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতার ভঙ্গিতে চীৎকার করে উঠল সে: Ladies and Gentlemen, এখানকার মেজরিটি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়ে আমি প্রস্তাব করছি, শ্রীমতী প্রণতির গানের পর শ্রীমতী পুষ্প দেবী রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইবেন।

প্রচণ্ড করতালিধ্বনির মধ্যে প্রস্তাবটা গৃহীত হলো। শুভেন্দুও টেবিল থেকে নেমে ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু পুষ্পর অবস্থা হ'য়ে দাঁড়াল অত্যন্ত শোচনীয়।

পুষ্প বসেছিল হলের আর এক প্রান্তে। মিনতির পিতা মিঃ বিজয় ঘোষালের (বার্ এ্যাট্-ল') সঙ্গে সে এতক্ষণ দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে মৃদুস্বরে আলোচনা করছিল। হঠাৎ শুভেন্দুর প্রস্তাব শুনে তার মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল: দেখুন তো কাকাবাবু...

বাধা দিয়ে মিঃ ঘোষাল বললেন: ওরা তো কিছু অন্যায় বলেনি মা! গাও না একখানা গান! তোমাকে তো এ পর্য্যন্ত কোথাও গান গাইতে দেখিনি। অথচ শুনেছি, তোমার গলা নাকি ভারী মিষ্টি! গাও না একখানা?

প্রকাণ্ড একটা "বিভ্যানের" অর্গানের সুমুখে বসেছিল সুকুমার সেনের বোন প্রণতি। মেয়েটি অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির। সে হঠাৎ পুষ্পর কাছে ছুটে এসে বলল: এ কিন্তু তোর ভয়ানক অন্যায় ভাই, তুই রজতদার কাছে একলা বসে গান গাইতে পারিস, আর আমাদের সুমুখে গাইলেই যত দোষ!

প্রণতির কথা শুনে কয়েকটি মেয়ে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল।

পুষ্পর মুখ-চোখও আরক্ত হ'য়ে উঠল, বিরক্তিতে সে মুখ নীচু ক'রে বসে রইল।

তখন আর একটি মেয়ে বলল: সত্যি পুষিদি, গাওনা ভাই সেই গানটা! সেদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে রজতদাকে যে গানটা শোনাচ্ছিলে। সেই যে,—ওই মরণের সাগর পারে...?

একটি তরুণী তাড়াতাড়ি বলে উঠল: না না, আজ আনন্দের দিনে মরণের গান গেয়ে কাজ নেই!

তাকে তাড়া দিয়ে প্রণতি বলল: তুই থাম্‌তো! সে গান শুনলে আর ভুলতে পারবিনা! এই পুষি, ওঠ্‌না......

পুষ্প কিন্তু পূর্ব্বের মতোই মাথা নীচু ক'রে বসে রইল। তখন মিঃ ঘোষাল মৃদু হেসে আবার বললেন: ওঠো মা, লজ্জা কী?

শেষে তিনিই এক রকম জোর ক'রে পুষ্পকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে অর্গানের সুমুখে বসিয়ে দিলেন। অগত্যা পুষ্প তখন বিরস মুখে গান ধরল:

ওই মরণের সাগর পারে চুপে চুপে এলে তুমি;
ভুবন মোহন স্বপনরূপে......

রজত প্রথম থেকেই গম্ভীর হয়ে বসেছিল। কেউ কোন প্রশ্ন করলে, সংক্ষেপে তার উত্তর দেওয়া ছাড়া সারাক্ষণেই সে চিন্তিত মুখে বসেছিল। তারপর পুষ্প যখন গিয়ে অর্গানের সুমুখে বসল তখন সে-ও উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অদূরে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন বারান্দা ছিল। সে সেইখানে গিয়ে রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

বিশুও এখানে এসে সকলের সঙ্গে বেশ হেসে হেসেই গল্প করছিল।

কিন্তু যেমনি পুষ্পর গানের প্রসঙ্গ উঠল অমনি তার মুখের ভাবও বদলে গেল। কাঁটার মতো শুধু এই প্রশ্নটাই তার বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে লাগল যে, রজতের মতো লোকের সঙ্গে এত কিসের ঘনিষ্টতা পুষ্পর? রজতের মধ্যে এমন কী আছে যার জন্যে পুষ্পর জীবনে সে এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে? নিদারুন দৈহিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করে, দিনের পর দিন উপবাস ক'রে, দেশের জন্যে সে যতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছে, তার সঙ্গে রজতের তুলনা! সে যদি রজতের মতো অত অর্থবান হ'তো, তাহলে সে-ও অমন কত গণ্ডা মুক্তি-সঙ্ঘের সৃষ্টি করতে পারত। সে দলকে সে এমন ভাবে চালিত করত, যার বিরাট কর্ম্ম শক্তির তাড়নায় স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীকে পর্য্যন্ত যে'চ এসে তার সঙ্গে আপোষ করতে হ'তো! অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকেও হয়তো একদিন তার সঙ্গে সন্ধি করতে হ'তো। তার সঙ্গে রজতের তুলনা! কিন্তু কী আশ্চর্য্য মেয়ে ওই পুষ্প! রজতের মতো একটা ধাপ্পাবাজ ডিক্‌টেটারকে ও ভালবাসে!—ব্যাপারটা সে যতই চিন্তা করতে লাগল, ততই তার মাথায় রক্ত চড়ে যেতে লাগল।

প্রায় পনের মিনিট পরে পুষ্পর গান থামল। অর্গানের কাছ থেকে উঠে আবার সে মিঃ ঘোষালের পাশে এসে বসল।

তার গান শুনে কেউ হাততালি দিলনা। একটি কথাও কইলনা কেউ। কেমন যেন একটা বিষাদ-ক্লিষ্ট দৃষ্টিতে সকলেই পুষ্পর দিকে তাকিয়ে রইল। গানটি রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু শ্রোতার-দল অভিভূত হ'য়ে পড়ল তার কাব্যাংশের মনোহারিত্বের জন্য নয়,—সুরের অভিনবত্বের জন্য! অকস্মাৎ তারা যেন নতুন করে উপলব্ধি করল বিশ্বকবির

অলৌকিক প্রতিভাকে। গানের কথার সঙ্গে এমনভাবে সামঞ্জস্য রেখে যিনি সুরের জাল বুনতে পারেন, কত বড় সঙ্গীতজ্ঞ তিনি!

প্রায় দশ মিনিট পরে সুকুমার যেন প্রস্তাব করল লিলিকে গান গাইবার জন্যে! সকলেই সে প্রস্তাব সমর্থন করল। বিপুল করতালিধ্বনির মধ্যে লিলি গিয়ে অর্গানের সামনে বসল। সেও রবীন্দ্র সঙ্গীত ধরল :

তোমার বাস কোথা যে পথিক ওগো দেশে কি বিদেশে...

কিন্তু বিশুর কানে গানের সুরটা যেন অত্যন্ত হাল্কা বলে মনে হ'তে লাগল! যদিও লিলির মতো চঞ্চল স্বভাবের মেয়ের পক্ষে হাল্কা সুরের গান ধরাটাই স্বাভাবিক; কিন্তু বিশুর মনে হ'তে লাগল,—এ যেন পুষ্পর গাম্ভীর্যাকে ইচ্ছে করেই ব্যঙ্গ করছে। শেষে আর সে সহ্য করতে পারল না। সে-ও আর একটা দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

বারান্দায় গিয়ে, বিশু রজতের দিকে না চেয়ে উল্টো দিকে অগ্রসর হ'লো। কিন্তু রজত তাকে ডাকল : বিশুবাবু শুনুন্—

রজতের গলার আওয়াজ অত্যন্ত গম্ভীর। মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেও বিশু তাড়াতাড়ি তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল।

বারান্দাটা যদিও নির্জ্জন ছিল, তবুও রজত সতর্কদৃষ্টিতে একবার চারিদিক দেখে নিল। তারপর মৃদুস্বরে বলল : আমাকে কাল সকালেই কলকাতার বাইরে যেতে হ'চ্ছে, তাই আপনার সঙ্গে একটা দরকারি কথা সেরে নিতে চাই! সঙ্ঘের গত অধিবেশনে আমাদের গোবিন্দপুর আড্ডার কাজ আরও বাড়াবার জন্যে একটা প্রস্তাব আনা হয়েছিল মনে আছে?

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বিশু বলল : আজ্ঞে হ্যাঁ কিন্তু টাকার জন্যে……

—টাকার ব্যবস্থাটা আপনাকেই করে নিতে হবে।—রজত বলল।—লোকজন যা দরকার, ঠিক ক'রে নিয়ে হপ্তাদু'য়েকের মধ্যেই আপনাকে বেরিয়ে পড়তে হ'বে।

বিশু বিমূঢ়ভাবে কিছুক্ষণ রজতের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল : কী বলছেন আপনি? টাকা যে প্রায় সত্তোর-আশী হাজার দরকার……

রজত বাধা দিয়ে বলল : সেটা আপনাকেই জোগাড় ক'রে নিতে হ'বে! গোবিন্দপুরের তিন ক্রোশ উত্তরে, নদীর ধারে গোকুলনগর গ্রাম! সেখানকার জমীদার জনার্দ্দন ঘোষালের তহবীলে শীগ্‌গীরই একদিন প্রায় লাখ খানেক টাকার খুচ্‌রো নোট্ জমা পড়বে! সেটা আমাদের চাই!

হুকুম শুনে বিশুর বুকের রক্ত জল হ'য়ে যাবায় উপক্রম করল। একটা ঢোক্ গিলে সে বলল : কিন্তু……

বিশুকে ইতস্তত করতে দেখে রজত একটু হেসে বলল : আপনি কী বলতে চান আমি তা জানি। এ কাজে এই প্রথম আপনার হাতে-খড়ি, তাই আপনি ভয় পাচ্ছেন! আমার কথার উপরেও কিন্তু বলতে সাহস করছেন। কিন্তু কী কী প্রতিজ্ঞা ক'রে সঙ্ঘের সভ্য হয়েছিলেন—মনে আছে তো?

—আপনি বিশ্বাস করুন,—বিশু সভয়ে বলল,—ভবিষ্যতে এমন ভুল আমি আর কখনও করবোনা!

—আচ্ছা! তাহলে, যত শীগগীর সম্ভব লোকজনদের শিখিয়ে

পড়িয়ে নিন্। ভয় নেই, ভয় নেই, সে সময় আমিও সেখানে থাকব।

বিশু আশান্বিত হ'য়ে বলল: আপনিও গোবিন্দপুরে থাক্‌বেন? action-এর সময়?

—হ্যাঁ! কাণ্ডটা হয়ে যাবার পর ও আড্ডাটা সম্ভবতঃ আমাদের নষ্ট করে ফেল্‌তে হ'বে। তাই আগে থাকৃতেই আমি ওখানকার কিছু মাল সরিয়ে ফেল্‌তে চাই। আচ্ছা, আপনি এখন ঘরে গিয়ে গান শুনুন গে যান্!

বিশু প্রস্থানোদ্যত হ'লো। রজত আবার তাকে ডেকে বলল: একটু হুঁসিয়ার থাক্‌বেন! কাজ শেষ ক'রে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কথাটা যেন পুষ্প জানতে না পারে!

কিছু বুঝতে না পেরে বিশু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল। কথাটা তার কাছে অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ বলে মনে হলো। যার পরামর্শ ছাড়া আজ পর্য্যন্ত রজত কোন কাজ করেনি, সেই পুষ্পকেই সে আজ দূরে সরিয়ে রাখতে চায়! সে রজতের মুখখানা একবার ভাল করে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করল। একবার ভাবল: রজত এবং তার সঙ্ঘ সম্বন্ধে এতদিন সে যা ধারণা করে এসেছিল, সমস্তই ভুল। রজতের সম্যক পরিচয় সম্ভবতঃ এতদিন সে পায় নি—তার মুক্তি সঙ্ঘের তো নয়ই! কিন্তু কী কঠিন প্রাণ এ লোকটার! মিনতিদের সঙ্গে এতদিনকার ঘনিষ্ঠ-তার বিনিময়ে এ আজ তার কত বড় সর্ব্বনাশ করতেই না উদ্যত হ'য়েছে। পাছে পুষ্প বাধা দেয় এই ভয়ে, এ আজ তার মতো সঙ্গিনীর সঙ্গেও

নিঃশঙ্কচিত্তে অভিনয় করতে আরম্ভ করেছে! লোকটা একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাও বটে!

বিশুকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকতে দেখে রজত আবার বলল: অগ্নিমন্ত্রের উপাসক হ'লেও স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকই অর্থাৎ sentimental. আমাদের সঙ্ঘের মধ্যে ওসব ভাবালুতার কোন স্থান নেই।

বিশু হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বলল: তাহলে তাদের সঙ্ঘের মধ্যে নিয়েছিলেন কেন?

—সঙ্ঘকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্যে। পুরুষ ও নারী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করবে বটে কিন্তু দু'জনের কাজের ধারা হবে, সম্পূর্ণ ভিন্ন। এইটুকু সব সময় মনে রাখবেন,—যা লক্ষ্য ক'রে আমরা এগিয়ে চলেছি, সে অগ্রগতি ব্যাহত হ'বে শুধু সেইদিনই, যেদিন আমাদের মনের মধ্যে কোন রকমের sentimentality স্থান পাবে! আচ্ছা, আপনি এখন যান্!

রজত সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। বিশু আবার গানের আসরে ঢুকল।

সাত

বিশু ঘরে ঢোকবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিলির গান থামল। গুণমুগ্ধের দল চিরাচরিত প্রথানুসারে তাকে আর একখানি গান গাইবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল। এমন সময় ঘরে ঢুকল বিশুর সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি তরুণী!

মেয়েটি রূপসী এবং বিবাহিতা। জর্জ্জেটের আঁচল দুলিয়ে, হাই-হিলের খট্ খট্ আওয়াজ করতে করতে সে সকলের মধ্যে এসে দাঁড়াল। কিন্তু সমবেত তরুণ-তরুণীর মধ্যে কেউই তাকে অভ্যর্থনা করল না। তার দিকে ফিরে তাকাল সকলেই। কেউ বা তার প্রশ্নের উত্তরে দু' একটা কথাও বলল। কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। মেয়েটির প্রতি ব্যবহারের অভিনবত্ব দেখে বিশু অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'লো।

মেয়েটি প্রণতির নিকট গিয়ে বলল: কিরে, কেমন আছিস?

প্রত্যুত্তরে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রণতি বলল: দেখতেই পাচ্ছ......

তারপর লিলির কাছে গিয়ে মেয়েটি বলল: কী লিলি, ভাল তো?

লিলির উত্তর আরও রূঢ়, আরও সংক্ষিপ্ত হ'লো। সে শুধু বলল: হুঁ—

বিশু আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখল মেয়েদের মধ্যে কেউই তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করল না। যুবকদের মধ্যে অবশ্য অনেকেই তার সঙ্গে ভাল ভাবে হেসে কথা কইবার চেষ্টা করছিল; কিন্তু তার মধ্যেও কেমন যেন একটা আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। মেয়েটি শেষে ক্ষুন্ন মনে শুভেন্দুর নিকট গিয়ে দাঁড়াল।

মেয়েটি ঘরে প্রবেশ করাবধি শুভেন্দু মাথা নীচু ক'রে বসেছিল। মেয়েটি এবার নিকটে এসে মৃদুস্বরে বলল: দাদা, তোমার বিশুবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও,—আমি চলে যাই।

মেয়েটি শুভেন্দুরই সহোদরা,—নাম বন্দনা চৌধুরী।

বন্দনা কথা বলতেই যেন বারুদের স্তূপে আগুন পড়ল। শুভেন্দু যেন একেবারে জ্বলে উঠল। তারপর চাপা গর্জ্জনে বলল: পোড়ার-মুখী, কেন তুই এখানে এলি?

শুভেন্দুর ক্রোধ দেখে বন্দনাও ভ্রূকুঞ্চিত করল; কিন্তু বিচলিত হলোনা। শান্তভাবেই বলল: আমি এখানে যেচে আসিনি! Here is it, এই বলে সে তার ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্য থেকে সোনার জলে ছাপানো, তার নাম লেখা একটা কার্ড বার করল।

ইতিমধ্যে রজত সেখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছিল। শুভেন্দু চাপা গলায় গর্জ্জন ক'রে উঠলেও আওয়াজটা তার কানে গিয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি বন্দনার হাত থেকে কার্ডখানা নিয়ে বলে উঠল: এর মানে? কাকাবাবু……

হ'লের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত চোখ বুলিয়েও মিঃ ঘোষালের দেখা পাওয়া গেল না। তিনি তখন সেখানে ছিলেন না।

—বাড়ীতে ডেকে এনে এ ভাবে অপমান করবার মানে?—রজত এবার হুঙ্কার ছাড়ল:—সরকার মশাই—

বৃদ্ধ সরকার মশাই তাড়াতাড়ি এসে ঘরে ঢুকলেন। তারপর কুণ্ঠিতভাবে বললেন: আমার অপরাধ কি বলুন? আমাকে তো কেউ কিছু বলেননি! তাই, পুরোণ লিষ্ট দেখে পূর্ব্বেকার মতোই আমি কার্ড ছেড়ে ছিলুম!

বন্দনা এবার কথা কইল। নিদারুণ অপমানে কণ্ঠস্বর তার রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। তবুও রজতের দিকে তাকিয়ে সে বলল: আমি সব বুঝিছি রজতদা! এমন জানলে আমি কখ্খোন এখানে আসতাম না,—কার্ড পেলেও না!—তার চক্ষুদুটি অশ্রু-সজল হ'য়ে উঠল।

রজত একটু ব্যস্ত হ'য়ে বলল: ছি বন্দনা,—আচ্ছা চল, আমি তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি। —এই বলে বন্দনাকে নিয়ে সে দরজার দিকে অগ্রসর হ'লো।

বিশু এতক্ষণ বিমূঢ় বিস্ময়ে ওদের দিকে চেয়েছিল। ব্যাপারটা সে আদৌ বুঝতে পারেনি। কিন্তু বন্দনার কথা শুনে এটুকু সে বুঝতে পেরেছিল যে, তার এখানে আসার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া। তাই রজত যখন বন্দনাকে নিয়ে অগ্রসর হ'লো তখন সে আর স্থির থাকতে পারল না। হঠাৎ বন্দনার সুমুখে এগিয়ে গিয়ে সে বলল: আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান? আমিই বিশু!

—আপনিই বিশুবাবু?—বন্দনা বিস্মিত ভাবে কিছুক্ষণ বিশুর

দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দরজার দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে বলল: দাদার কাছে আপনার কথা এত শুনেছি যে…একদিন আসুন না আমাদের বাড়ীতে?

সস্মিতমুখে বিশু বলল: বেশ তো!

—বেশ তো নয়, নিশ্চয়ই যেতে হ'বে। আপনার adventure-এর গল্প শুনবো!

বিশুর আত্মপ্রসাদ তখন সীমা অতিক্রম করেছিল। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সে বলল: হ্যাঁঃ, আমার আবার adventure…

কথা কইতে কইতে তিনজনে বাড়ীর কটকের কাছে এসে পৌঁছল। রজত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে দিল। তারপর ড্রাইভারের আসন শূন্য দেখে বিস্মিতভাবে বন্দনাকে বলল: কই, তোমার শোফার গেল কোথায়?

—ড্রাইভারকে আনিনি তো!—বন্দনা বলল,—অশোক ছিল আমার সঙ্গে!

—অশোক কে? সুকুমারের ভাই?

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর ও-পাশ থেকে একটি স্যুট্পরা বাইশ-তেইশ বছরের যুবক বেরিয়ে এসে লজ্জিতভাবে রজতকে নমস্কার করল। তারপর তাড়াতাড়ি ড্রাইভারের আসনে উঠে বসল।

অশোককে দেখেই রজতের মুখ অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছিল। তাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা ক'রে, সে বন্দনার উদ্দেশে একটা আচ্ছা বলেই পিছন ফিরল।

রজতের এই আকস্মিক ভাবান্তর দেখে বিশুও একটু আশ্চর্য্য

হলো। কিন্তু বন্দনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্রও করলনা। সহাস্যমুখে অশোকের পাশে উঠে বসে সে বিশুর একটি হাত মুঠো ক'রে ধরল! তারপর তাতে মৃদু চাপ দিতে দিতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল: আমার ওখানে আসছেন তো? আচ্ছা, কবে আস্‌ছেন বলুন?

বন্দনার করস্পর্শে বিশুর অবস্থা তখন শোচনীয় হ'য়ে উঠেছিল। বিদ্যুতের মতো কী যেন কী একটা মোহ-মদির শিহরণ তার শরীরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেল। সে সভয়ে একবার অশোকের দিকে চেয়ে নিয়ে শুখনো গলায় বলল: যাব, প্রথম সুযোগেই যাব—

—দেখবেন, ভুলবেন না যেন!—মুচকে হেসে, বিশুর দিকে একটা মারাত্মক কটাক্ষ হেনে বন্দনা কুশনের ওপর ঢলে পড়ল। অশোক গাড়ী ছেড়ে দিল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বন্দনার গাড়ী রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেল। কিন্তু বিশু সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল অভিভূতের মতো! কোথা দিয়ে যে কী হ'য়ে গেল সে যেন তখনও বুঝতে পারছিল না! অবশ্য, বুঝতে পারবার মতো অবস্থাও তার তখন ছিলনা! তার শরীরের প্রতি তন্ত্রীটি যেন তখনও নিবিড়ভাবে অনুভব করছিল বন্দনার মোহময় করস্পর্শ! ক্ষণিক শৃঙ্গারের একটা অবসাদপ্রবণ রসস্রোত যেন একটা অদ্ভুত বিপ্লব বাধিয়ে তুলেছিল তার দেহের মধ্যে। ক্ষণে ক্ষণে সেটা তার ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে পদাঙ্গুলীর দিকে নেমে এসে, পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর মতো যেমন তার শরীরের বাইরেটাকে অচেতন করে দিচ্ছিল, তেমনি কম্পনের আতিশয্যে ভেতরটাকেও ক'রে তুলছিল কণ্টকিত! কিমৃকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে সে অর্থহীন দৃষ্টিতে রাস্তার দিকেই তাকিয়ে রইল।

কতক্ষণ সে ওইভাবে দাঁড়িয়েছিল জানেনা হঠাৎ রজতের কণ্ঠস্বরে তার সম্বিৎ ফিরে এল। বিশুর সুমুখে এসে, কোমরে হাত দিয়ে রূঢ় স্বরে রজত বলল: বন্দনার গাড়ী তো অনেকক্ষণ চলে গেছে! এখনও এখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন আপনি?

রজতের কণ্ঠস্বর শুনে বিশু হঠাৎ অপরাধীর মতো মাথা নীচু করল! রজত তখন তাকে আর কিছু না বলে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'লো। বিশুও পিছনে গেল।

দোতলার হলের মধ্যে তখন মাত্র কয়েকটি মেয়ে বসে মৃদুস্বরে কথা কইছিল। সম্ভবতঃ তারা, বন্দনার আবির্ভাবে যে লজ্জাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করছিল। হঠাৎ রজতদের ঘরে ঢুকতে দেখে থেমে গেল!

রজত তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করল: কই, আর সব গেল কোথায়?

—ওরা সব খেতে গেছে?

—আপনারা বুঝি পরের ব্যাচে খাবেন?

—নাঃ, আমাদেরও খাওয়া হ'য়ে গেছে।

রজত তখন বিশুকে নিয়ে একটা নির্জ্জন জায়গায়, গিয়ে বসল। তারপর গম্ভীরভাবে বলল: শুনুন বিশুবাবু, আপনাকে একটা দরকারি কথা বলে নি। মুক্তিসঙ্ঘ আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে, তাই বলছি, Beware of that girl বন্দনা! সর্ব্বদা ওকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করবেন, না হ'লে, ও আপনাকেও ruin করে ছেড়ে দেবে।

কিছু বুঝ্‌তে না পেরে বিশু বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইল। রজত তখন আবার বলল: ও আমাদের অনেকের সর্ব্বনাশ করেছে, এখনও করছে! ভবিষ্যতে আপনি ওকে দেখলেই পালাবার চেষ্টা করবেন।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বিশু বলল: উনি তো আমাদের শুভেন্দুবাবুর বোন,—তবে?

রজত তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিতে পারল না। শেষে অনেক ইতস্তত: করে সে বলল: ব্যাপারটা কী ক'রে যে আপনাকে বোঝাব, বুঝতে পারছি না! মেয়েটি শুভেন্দুরই ছোট বোন। এক সময় এই সমাজের মধ্যে ও সকলের সঙ্গে সমান ভাবেই মেলামেশা করতো। কিন্তু আজ ওকে সকলেই ত্যাগ করেছে। ভদ্রসন্তান মাত্রেই আজ ওর সঙ্গে মিশ্‌তে ঘৃণাবোধ ক'রে। আজ তার প্রমানও কিছু পেয়েছেন আপনি!

—কিন্তু কেন?

—তাহলে অনেক কথাই বলতে হয়!—রজত গম্ভীরভাবে বলল, মেয়েটি ছোট বেলা থেকেই, একটু বেশী রকমের চঞ্চল প্রকৃতির ছিল। কিন্তু যতই বয়স বাড়তে লাগল, ততই ওর মধ্যে আর একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। Psycho-pathologist-রা রোগটার নামকরণ করছেন Nymphomania—নামটা শুনছেন তো?

বিশু আরক্তমুখে সম্মতি জানাল।

রজত পূর্ব্বের মতো গম্ভীর মুখেই বলল, অবশ্য আমাদের সমাজের মধ্যে ও রকম রোগী যে আর কেউ নেই, তা নয়। তবে তাদের

সঙ্গে ওর তফাৎ হ'চ্ছে এই যে, কাজটাকে তারা লজ্জার কাজ মনে ক'রে লুকিয়ে ক'রে, ও তা একেবারেই ক'রে না। এইসবের জন্যেই ওকে আজ সকলে ত্যাগ করেছে!

—কিন্তু, উনি তো বিবাহিত!

—হ্যাঁ, সেও এক অদ্ভুত ব্যাপার! শুভেন্দুর বাবা খুব অর্থবান লোক ছিলেন, জানেন তো! আই-বি'তে খুব বড় চাক্‌রী করতেন তিনি। তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর মেয়ের গুণ এমনই ছড়িয়ে পড়েছে যে কেউই ওকে বিয়ে করতে রাজী হ'বে না, তখন পয়সা খরচ ক'রে, সামান্য একটা "ইন্‌ফরমার্"-কে কিনে এনে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

—বলেন কী, সে লোকটা রাজী হ'লো?

—পয়সায় কী না হয়, বলুন?—একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে রজত বলল: লোকটা শুধু নামে মাত্র ওকে বিয়ে করেছে বইতো নয়! কিন্তু বিনিময়ে কী পেয়েছে সেটাও দেখুন! দশহাজার টাকার যৌতুক, সাহেব পাড়ায় প্রকাণ্ড একটা বাড়ী, তাছাড়া এস্-বি'তে মোটা মাইনের একটা চাক্‌রীও পেয়েছে! সেই পয়সায় সে এখন তার স্ত্রী পুত্রকে ভালভাবে প্রতিপালন করতে পারছে!

—স্ত্রী-পুত্র?—বিশু চম্‌কে উঠল,—লোকটার আর এক স্ত্রী বর্ত্তমান নাকি?

—নিশ্চয়ই! বন্দনাকে বিয়ে করা তো তার চাক্‌রীর "সিকিউরিটি"!

—আশ্চর্য্য! দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বিশু বলল: এমন ঘটনাও ঘটে?

চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে রজত বলল : ঘটে ! বন্দনার মতো মেয়ে পৃথিবীতে চিরকালই ছিল, আজও বেঁচে আছে ! নিজেদের সঙ্গে তুলনা ক'রে সাধারণ লোকেরা এদেরকে অসাধারণ বলে মনে ক'রে, এবং সেই জন্তই এদের যা স্বাভাবিক জীবন যাত্রা প্রণালী, আমাদের কাছে তা-ই মনে হয় অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্ত বা বৈচিত্র্যপূর্ণ!

রজতের কথা শুনে বিশু কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল। তারপর চিন্তিতভাবে আবার প্রশ্ন করল : আর একটা ব্যাপার আমার বড় অদ্ভুত মনে হ'চ্ছে। অতখানি অপমান সহ্য ক'রে বন্দনা চলে যাবার পরও শুভেন্দুবাবু কেমন ক'রে আবার সকলের সঙ্গে হাসিমুখে মিশতে পারলেন ? হাজার হ'লেও তাঁরই তো ছোট বোন বন্দনা ?

এবার রজত একটু হাসল। বলল : ওর দুর্ভাগ্য যে বন্দনা ওর বোন ! কিন্তু তাই বলে তো বোনের জন্তে সমাজ ত্যাগ করা যায় না ! তাছাড়া আর একটা কারণও আছে। বিশেষ কোন কারণে শুভেন্দু মিনতিকে অসন্তুষ্ট করতে চায়না। বুঝ্‌লেন ?

বিশুও হেসে ফেলল। বলল : বুঝেছি !

এই সময় যারা খেতে গিয়েছিল তারা হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে হলে এসে ঢুকল। ভীড়ের মধ্যে মিনতি ও মিঃ ঘোষালও ছিলেন। তিনি রজতকে দেখেই ব্যস্তভাবে বলে উঠ্‌লেন : আরে, তোমরা এতক্ষণ ছিলে কোথায় হে ? চলো চলো, টেবিল তৈরি, রাতও অনেক হ'য়ে গেছে......

ঘড়ীতে তখন সত্যই এগারটা বেজে গিয়েছিল। রজত ও বিশু তাড়াতাড়ি ডাইনিং-হলের দিকে অগ্রসর হ'লো।

আট

ডাইনিং-হলে গিয়ে রজত ও বিশু খেতে বসল। ওদের দু'জন ছাড়া সকলেরই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, মিঃ ঘোষালও অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন। তাই মিনতি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের যত্ন ক'রে খাওয়াতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢুকল পুষ্প। সে মিনতির কাছে বিদায় নিতে এসেছিল। বলল, তুই এখানে···

—হ্যাঁ, এঁদের খাওয়াচ্ছি! ঘুরে দাঁড়িয়ে সহাস্যমুখে মিনতি বলল: বাবুরা রাত সাড়ে বারটা পর্য্যন্ত অনেক মেহন্নৎ করে আড্ডা মেরে এলেন, যত্ন ক'রে না খাওয়ালে অভিমান হ'বে যে!

মিনতি খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। রজত ও বিশুও হেসে ফেলল। হাসল না শুধু পুষ্প। রজতের বন্দনাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার কথাটা সে নিজের কানেই শুনেছিল। তাই এক রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে বলল: আড্ডা মারতে যাবেন কেন—বন্দনাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন:

—কী ক'রে জানলে বলতো? কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ দুটি বড় বড় ক'রে রজত বলল: আমি যে প্রাণপণে ও-কথাটা তোমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করেছিলাম!

পুষ্প ছাড়া আবার সকলে হেসে উঠল। রজত সেই সুযোগে পুডিং-এর প্লেটটা সরিয়ে রেখে "ন্যাপকিনে" মুখ মুছল।

রজতকে মুখ মুছতে দেখেই মিনতি ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। বলল: ওকি! না না, ওর সবটা আপনাকে খেতেই হ'বে! ওটা যে আমি নিজে তৈরি করেছি!

রজত সহাস্যমুখেই বলল: আর যে ভাল লাগছে না!

মিনতি সবেগে মাথা নেড়ে বলল: বাঃ, আমি বলে কত কষ্ট ক'রে সমস্ত দিন ধ'রে তৈরি করলাম! না, সত্যি, ওটা আপনাকে খেতেই হ'বে!

"ন্যাপকিন্"রেখে রজত আর একটা ছোট প্লেট থেকে এক টুকরো এলাচ নিয়ে মুখে দিল। তারপর সস্মিত মুখে বলল: খুব কষ্ট ক'রে তৈরি করেছ বলেই তো গলা দিয়ে নাম্‌তে চাইছে না!

এ কথা শুনে মিনতির মুখ কালো হ'য়ে গেল। সে আর কিছু বলতে পারল না, শুধু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে রজতের দিকে চেয়ে রইল।

রজতের নিকট থেকে খোঁচা খেয়ে পুষ্পর মন পূর্ব্বে থেকেই তার ওপর বিরূপ হয়েছিল। এখন আবার অকারণ মিনতিকে আঘাত করতে দেখে সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ভ্রূকুঞ্চিত করে কঠিনস্বরে সে বলল: তার মানে? তুমি কি বল্‌তে চাও পুডিংটা ভাল হয়নি?

রজত পূর্ব্বের মতোই হাসিমুখে বলল: সে বিষয় সন্দেহ আছে নাকি? আচ্ছা মিনতি, তোমার যা ডিপার্টমেণ্ট নয়, তার মধ্যে হঠাৎ তুমি মাথা গলাতে গেলে কেন বলতো? অন্য খাবারের মতো

পুডিংটাও যদি বাবুর্চিকে করতে দিতে, তাহলে সকলেই তো খেয়ে তৃপ্তি পেত!

মিনতি কোন কথা বলতে পারল না। কিন্তু পুষ্প এবার রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। বলল: তার মানে, তুমি বলতে চাও মিনতি রাঁধতে জানে না?

—শুধু মিনতিকে দোষ দিলে তো চলবে না—রজতের মুখে হাসিটা এবার যেন আর ভাল ক'রে ফুটল না। বলল: আমাদের দেশের কোন মেয়েই রাঁধতে জানে না। তা যদি হতো, তাহলে পাড়ায় পাড়ায় এত হোটেল-রেস্তঁারা গজিয়ে উঠত না।

—যদি কিছু মনে না করেন,—বিশু হঠাৎ বলে উঠল,—আপনার মন্তব্যর মধ্যে যুক্তি আছে নিশ্চয়ই?

—নিশ্চয়ই! রজত এবার উত্তেজিতভাবেই বলল: এ দেশের সাধারণ লোকেরা, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যদি বাড়ীর মেয়েদের কাছ থেকে ভাল রান্না খেতে পেত, তাহলে নিশ্চয়ই তারা সখ করে হোটেলে খেয়ে রোগে ভুগে মরতো না।

রজতের উত্তেজনা দেখে বিশু এবার সত্যাই বিস্মিত হ'লো। রজত সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত তার যতটুকু অভিজ্ঞতা হ'য়েছে, তাতে, তাকে উত্তেজনা-প্রবণ নিশ্চয়ই বলা চলে না! অথচ আজ এমন কী ঘটল যা তাকে এতখানি অভদ্র,—এমনই বক্তার ক'রে তুলল!

রজত আবার মিনতির উদ্দেশে বলল: আজ যে আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে এত খারাপ রোগের ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে, তার একমাত্র কারণ, হচ্ছে হোটেলে খাওয়া! তারা যে আজ সব

জেনে-শুনেও হোটেলে খাওয়ার লোভ সামলাতে পারেনা তারও একমাত্র কারণ তাদের বাড়ীর মেয়েরা ভাল রান্না কাকে বলে তা জানে না। তোমরা চিরকাল রান্নার ব্যাপারটাকে মাইনে-করা লোকের হাতে ছেড়ে দিয়ে ড্রইং-রুমে ব'সে নাকীসুরে "শেলী" আওড়াচ্ছ,—আচম্কা রান্না করতে গেলে পারবে কেন বলতো ?

রজতের ব্যাপার দেখে বিশু এবার বিচলিত হয়ে উঠল। তার সন্দেহ হলো, কোন বিশেষ একটা মৎলব নিয়ে রজত অভিনয় করছে না তো !

দম্ নিয়ে রজত আবার বলল : রান্না জিনিষটা অত সোজা নাকি ! ওটা একটা কত বড় আর্ট তা জান ? আমাদের ঠাকুমাদের আমল পর্য্যন্ত এ আর্টের কদর ছিল। সংসারের সমস্ত কাজ নিজের হাতে করার মতো, স্বামী-পুত্রকে দু'বেলা ভাল ক'রে রেঁধে খাওয়াবার সৎ-প্রবৃত্তিটাও তাঁদের মধ্যে সর্ব্বদা জেগে থাকত। রান্না করাটাকে তাঁরা তোমাদের মতো হীন কাজ মনে ক'রে মাইনে-করা লোকের হাতে ছেড়ে দিতেন না। তাঁরা নিজের হাতে রান্না করতেন। কিসে তরকারীর আস্বাদ ভাল হয়,—কোন তরকারীতে কী কী মসলা, কত পরিমাণ দিলে তরকারী আরও মুখরোচক হয়, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তা তাঁরা আবিস্কার করতেন। তোমাদের মতো পাক্-প্রণালীর পাতা উল্টিয়ে, হঠাৎ একদিনের জন্যে অখাদ্য রান্না ক'রে তাঁরা বাহাদুরী নেবার চেষ্টা করতেন না !

এতক্ষণে স্পষ্ট বোঝা গেল, রজত বক্তৃতা সুরু করেছে। কিন্তু ভূতের মুখে রামনাম শোনার মতো, বিষয়-বস্তুর বিশ্লেষণ শুনে মিনতি

ও পুষ্প উভয়েই অভিভূত হ'য়ে পড়ল। রজতের এ রূপ তারা পূর্ব্বে কখনও দেখেনি। তার এ পরিচয় তারা আগে কখনও পায়নি। এতাবৎকাল রজতকে তারা শ্রদ্ধাই করে এসেছিল। বিশেষতঃ সমাজের অন্যান্য যুবকদের মতো তাকে কখনও কোন মেয়ে সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করতে না দেখে, তাদের সেই শ্রদ্ধা হয় তো বা তার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ তার মুখে এইরূপ অচিন্ত্য-পূর্ব্ব অদ্ভুত বক্তৃতা শুনে, হঠাৎ তাদের সন্দেহ হলো,—নারী সম্বন্ধে রজতের নীরবতাটা তার নারী-বিদ্বেষের পরিচয় নয় তো।

মেয়েরা কিছু বুঝতে না পারলেও বিশু কিন্তু রজতের এই আকস্মিক ভাবান্তরের একটা তাৎপর্য্য আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিল। তবুও মেয়েদের মনের অবস্থা কল্পনা ক'রে সে বলল : আপনার যদি আপত্তি না থাকে,—এ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে!

রজত সহাস্য মুখেই বলল : বেশ তো, বলুন!

—কিন্তু, মতান্তরে মনান্তরের সৃষ্টি হ'বে না তো!

—নিশ্চয়ই না।

—বাঙ্গালীর ছেলেদের হোটেলে খাওয়ার কারণ সম্বন্ধে আপনি যে যুক্তি দেখালেন,—আমার মনে হয় সেটা আপনার ভুল ধারণা! আমাদের ঠাকুমাদের আমলে দেশে এত হোটেল রেঁস্তারার ছড়াছড়ি ছিল না, মধ্যবিত্ত ঘরের কোন ছেলে সেখানে খেতেও পেত না! সুতরাং সেকেলে মেয়েদের রান্নার বৈশিষ্ট্যের কথাটা এক্ষেত্রে একেবারেই অবান্তর! তা ছাড়া, বর্ত্তমানে ছেলেদের হোটেলে খাওয়ার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আপনি যে অভিমত ব্যক্ত করলেন, সে সম্বন্ধে আমি

শুধু এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে, হাজার বছর যাবৎ ভিন্ন-ধর্ম্মী বিদেশী রাজা-বাদশাদের অধীনে দাসত্ব করার পরিণামে রাজার জাতের সব-কিছুকে অনুকরণ করার কু-প্রবৃত্তিটা আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে! আপনি নিশ্চয়ই জানেন, বাঙ্গলা দেশে যিনি প্রথম জাতিয়তাবাদ প্রচার করেছিলেন,—যে মহাপুরুষ সর্ব্বপ্রথম দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন বাঙ্গালীর মনে, তিনিও অন্যমনস্ক হ'য়ে মুসলমানী-পোষাক পরতেন! আজকালকার ছেলেরাও ঠিক্ সেই রকম অন্যমনস্ক হ'য়েই হোটেলে গিয়ে বিলিতী-খানা খেয়ে আসেন।

বিশুর অভিমত শুনে রজত চট্ করে কোন উত্তর দিল না। সস্মিতমুখে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর আস্তে আস্তে বলল: আমরা যে অকারণে কোন কাজ করি না বা কথা কই না, এটা বোধ হয় আপনি স্বীকার করেন?

—নিশ্চয়ই! বিশু চঞ্চল হয়ে বলল: সেই জন্যেই তো বলছি, এ সব আলোচনা এখন থাক!

—না না থাকবে কেন?—রজত হাসিমুখেই বলল: আপনি যে মেয়েদের মনোস্তুষ্টি করবার চেষ্টা করছেন, এ তো আমরা সকলেই বুঝতে পেরেছি। তবে আসল victim-টি কে, সেটা এখনও বুঝতে পারিনি বটে!

এবার বিশুর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। সে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে উত্তেজিতস্বরে বলল: রজতবাবু, এ সব অত্যন্ত আপত্তিকর,—অত্যন্ত অসম্মানজনক……

—দেখবেন বিশুবাবু,—রজত এবার সশব্দে হেসে উঠল। বলল: মতান্তরে যেন মনান্তরের সৃষ্টি না হয়!

শুনেই বিশু আবার ধপ্‌ ক'রে বসে পড়ল। ঠিক এই সময় মিঃ ঘোষাল এসে তাকে রক্ষা করলেন! তিনি ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকে বললেন: তোমাদের ব্যাপার কী বলতো? রাত একটা বেজে গেছে, এখনও গল্প করছ? ও পুষু তোমার বাবা যে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এই মাত্র ফোন করছিলেন! যাও যাও বাড়ী যাও! রজত, বিশু, বাড়ী যাও বাবা! ইস্‌ অনেক রাত্‌ হ'য়ে গেছে যে!

ঘড়ীর দিকে এতক্ষণ কারুরই খেয়াল ছিল না। মিঃ ঘোষালের কথা শুনে সকলেই লজ্জিতভাবে প্রস্থানোদ্যত হলো!

আলোচনার প্রারম্ভে মিনতির মনের কোনে যে মেঘ জমা হ'য়েছিল, শেষ পর্য্যন্ত তা অপসৃত হ'য়েছিল কি না জানা গেল না বটে কিন্তু সে বেশ হাসিমুখেই সকলকে বিদায় দিল!

পুষ্প কিন্তু যাবার সময় কারুর সঙ্গে একটিও কথা কইল না! এমন কি মিনতির সঙ্গেও না! আজ সে হঠাৎ রজতের নিকট থেকে আঘাত পেয়েছে। অত্যন্ত রূঢ়ভাবে রজত আজ তাকে মিনতি ও বিশুর সামনে অপমান করেছে। কিন্তু এর জন্যে দায়ী তো মিনতি-ই! সে যদি মিনতির হ'য়ে কথা কইতে না যেত তাহলে অবশ্যই রজত তাকে অমন ক'রে বিঁধতে পারত না!

গাড়ীতে যেতে যেতে তার চোখে জল এল।

নয়

হোষ্টেলে ফিরে বিশু সে রাত্রিতে ঘুমোতে পারল না। মিনতিদের বাড়ীর ঘটনাগুলো কেবলি তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। রজতের ডাকাতী করবার প্রস্তাব; বন্দনার আবির্ভাব; তার অত্যদ্ভুত চরিত্র-বৈচিত্র্যের কাহিনী; রজতের সঙ্গে তার রহস্যময় কথোপকথন, এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘুরে ফিরে কেবলি তার মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল। বিশেষতঃ মিনতিদের দেশের বাড়ীতে ডাকাতী করার প্রস্তাবটা তাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলল। মিনতিদের সঙ্গে এতদিনকার ঘনিষ্টতার বিনিময়ে রজত যে তাদের এতবড় সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হবে একথা সে কোন দিন কল্পনাও করতে পারেনি! এ পর্য্যন্ত রজতের অনেক পরিচয়ই সে পেয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে যে এতখানি নিষ্ঠুরতা বর্ত্তমান থাকতে পারে তা সে কখন ভাবতেও পারেনি। কিন্তু রজত এ কথা পুষ্পর কাছে গোপন করতে চায় কেন? পুষ্প রজতের ছেলেবেলাকার সঙ্গিনী। তাদের কৈশোরের বন্ধুত্ব যৌবনে হয়তো বা ভালবাসায় পরিণত হয়েছে,—অন্তত অনেকেরই ধারণা এইরূপ, কিন্তু তবুও তারমধ্যে এত লুকোচুরী কেন? মিনতিদের সর্ব্বনাশে রজতের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই! সঙ্ঘের অর্থ ভাণ্ডারের

দৈন্যের কথা ভেবেই সে এ কাজ করতে উদ্যত হয়েছে। তবে সে কথা কেন সে পুষ্পের কাছে লুকোতে চায়? সঙ্ঘের কর্ম্মীদের মধ্যে অনেক কিছু তথাকথিত আইন বিধিবদ্ধ থাকলেও আসলে দলপতির আদেশকেই একমাত্র আদেশ বলে শিরধার্য্য করে নিতে আজও সকলে বাধ্য হয়। পুষ্পও সঙ্ঘের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী! দলপতির যে কোন আদেশকে সেও নির্ব্বিচারে মেনে নিতে বাধ্য! নির্ব্বিকার চিত্তে সঙ্ঘের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করাই তার ধর্ম্ম। তবে স্ত্রীলোকের sentimentality-র দোহাই পেড়ে রজত কেন তার কাছে এতবড় একটা ঘটনা গোপন করবার চেষ্টা করছে। উভয়ের মধ্যে ভালবাসাটা অত্যন্ত গভীর বলেই কি পুষ্পর জীবনে রজতের "ডিক্‌টেটারীর" কোন মূল্য নেই!

কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্য! পুষ্প সম্বন্ধে সত্যই কি রজতের মনে কোন দুর্ব্বলতা প্রচ্ছন্ন আছে! বিশুর সন্দেহ হয়! যে লোক মেয়েদেরকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করবার একটা সামান্য সুযোগকেও কখন অবহেলা করে না, তারপক্ষে কোন নারী সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা পোষণ করা কি সম্ভবপর? অপর পক্ষে রজতের নারী-বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও পুষ্পের মতো মেয়ের মনেও কি কোন রকম দুর্ব্বলতার বীজ সুপ্ত থাকা স্বাভাবিক?

সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্‌ করে বিশু শেষে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। রজতের নারী-বিদ্বেষ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে একটা অদ্ভুত স্বস্তি অনুভব করল সে মনে মনে। তারপর পরদিন সকালে উঠেই তার প্রথম কাজ হ'লো বালীগঞ্জের ট্রাম ধরা।

সমস্ত রাত্রি চিন্তা করে এইটুকু সে বুঝতে পেরেছিল যে, মিনতিদের আসন্ন বিপদের কথাটা পুষ্পকে জানান তার অবশ্য কর্ত্তব্য। রজতের নিষ্ঠুরতার কথা,—পুষ্পর নিকট এসব কথা গোপন করবার কথা, অর্থাৎ তাকে যে রজত অবিশ্বাস করে, এ কথাটা পুষ্পকে না জানিয়ে সে স্থির থাকতে পারবে না। অবশ্য নিজের এই অদ্ভুত ব্যাকুলতার জন্যে চিন্তারও অন্ত ছিল না তার। কিন্তু ইচ্ছাকে দমন করবার শক্তিও তখন তার লোপ পেয়ে গিয়েছিল! দলপতির আদেশ অমান্য করার পরিণাম যে কত মারাত্মক তা সে ভাল করেই জানে! সে শাস্তি যে কত ভীষণ, তার ভয়ঙ্কর চিত্রটিও মাঝে মাঝে তার ইচ্ছার উগ্রতাকে দুর্ব্বল ক'রে তুলছিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার আশঙ্কিত মৃত্যুর আতঙ্ককে ম্লান করে দিয়ে আরও একটা রমণীয় ছবি তার চোখের সামনে ফুটে উঠছিল : রজতের সত্য পরিচয় জানতে পেরে পুষ্প কি পরিমান অভিভূত হয়ে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গেই সে উপলব্ধি করবে বিশুর চরিত্রের দৃঢ়তাকে। মৃত্যুকে তুচ্ছ করেও সে কর্ত্তব্য করতে এসেছে, শুধু পুষ্পরই মঙ্গলের জন্য! রজতের মতো লোককে বিশ্বাস করার পরিণামে যে সব অভিশাপগুলো অপরিহার্য্য হয়ে উঠতো তার ভবিষ্যৎ জীবনে সেই সব অবাঞ্ছিত ঘটনাস্রোতকে রোধ করতে এসেছে সে! অনিবার্য্য ধ্বংসের কবল থেকে পুষ্পকে রক্ষা করতে এসেছে বিশু! বিনিময়ে...

পুষ্পর সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাতের রমনীয় পরিস্থিতিটা কল্পনা করে বিশু আত্মবিস্মৃত হলো। বিশ্বাসঘাতকের অনিবার্য্য পরিণামের কথা বিস্মৃত হয়ে সে রোমাঞ্চিত কলেবরে চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে পড়ল। তারপর

এগিয়ে চলল দ্রুতপদে। রজতের সত্য পরিচয়টা পুষ্পকে জানিয়ে দিতেই হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব!

বালীগঞ্জের বাড়ীতে পৌঁছে বেয়ারাকে দিয়ে খবর পাঠাতেই পুষ্প ওপর থেকে নেমে এল। কিন্তু তার চেহারা দেখেই বিশু তার উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। ব্যস্ত হ'য়ে বলল: একি! আপনার অসুখ করেছে নাকি? চোখ দুটো অত ফুলল কী করে?

বিশুর উৎকণ্ঠা দেখে পুষ্প লজ্জিত ভাবে একটু হাসল। তারপর বলল: ও কিছু নয়! কিন্তু আপনি এত সকালে যে?

—কারণ আছে! বিশু গম্ভীর হ'বার চেষ্টা করে বলল: একটা জরুরী কথা আলোচনা করতে চাই!

পুষ্প বুঝল বিশু সজ্ব সম্বন্ধেই কিছু বলতে চায়। সে একবার ঘরের ভেতরটা ভাল করে দেখে নিল। তারপর মৃদুস্বরে বলল: কিন্তু, সে তো এখন হ'তে পারে না! লিলি আজ দুপুরের ট্রেনেই খুলনা যাচ্ছে। তার জিনিষপত্রগুলো একটু গুছিয়ে দিতে হবে কি না—

—লিলি দেবী খুলনা যাচ্ছেন,—হঠাৎ?

—সেখানে আমাদের এক পিশিমা আছেন। তাঁর কাছেই বেড়াতে যাচ্ছে।

—ওঃ, কিন্তু, আমার কথাটাও যে বড্ড দরকারি ছিল……

পুষ্প একটু চিন্তা করে বলল: আচ্ছা, অফিস্-ফেরৎ বিকেল বেলায় একবার আসতে পারবেন না? তখন বেশ নির্জ্জনে কথা বলা যেত…

—বেশ, তাই আসব! বিশুকে অগত্যা তখন প্রস্থান করতে হ'লো।

কিন্তু বিকাল বেলাতে তার আসা হ'য়ে উঠলনা। বেলা পাঁচটার

সময় পুষ্পদের বাড়ীতে যাবার উদ্দেশ্যে যেমন সে অফিস থেকে বেরুতে যাবে ঠিক সেই সময়ে বেয়ারা এসে খবর দিল, টেলিফোনে কে তাকে ডাকছে!

হয়তো পুষ্পই তার engagement সম্বন্ধে কিছু বলতে চায়, এই ভেবে সে তাড়াতাড়ি গিয়ে রিসিভারটা কানে নিল। কিন্তু শুনল পুষ্প নয়, মিনতি তাকে ডাকছে।

—হ্যাল্লো, বিশুবাবু আপনার ছুটি হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে, এক্ষুনি একবার আমাদের এখানে চলে আসুন, ভীষণ দরকার।

বিশু আশ্চর্য্য হয়ে বলল: ব্যাপার কী?

—আগে আসুন, তারপর বলব; লক্ষীটি, দেরী করবেন না যেন! শীগ্‌গীর চলে আসুন, ভীষণ দরকার······এই বলে ফোন ছেড়ে দিল।

বিশুও তখন চিন্তিতভাবে অফিস থেকে বেরিয়ে বালীগঞ্জের বদলে পার্ক সার্কাসের ট্রামে চড়ে বসল। মিনতিদের-বাড়ী পার্ক সার্কাসে।

সেখানে পৌঁছতে বেলা প্রায় পৌনে ছ'টা বেজে গেল। মিনতি বাইরে বেরুবার কাপড়-চোপড় পরে ড্রইংরুমে বসে অপেক্ষা করছিল। বিশুকে দেখেই বলল: এসেছেন? চলুন—

—কোথায়?

—পিকচার হাউসে,—টেমিং অফ দি শ্রু দেখতে! আজ শেষ দিন···

—কিন্তু আমার যে একটা দরকারী engagement আছে! বিশু ব্যস্ত হ'য়ে উঠল।

—কার সঙ্গে? মুচকে হেসে মিনতি বলল, পুষির সঙ্গে তো?

বিশু কোন উত্তর দিতে না পেরে বিমূঢ় ভাবে মিনতির দিকে চেয়ে রইল।

মিনতি আবার বলল: ও engagement-এর শেষ তো কোনদিনই হবে না! কিন্তু আপনি না নিয়ে গেলে আমারও যে ছবিখানা দেখা হয় না! কী করি বলুন? ওদের মতো একলা বেরুনো অভ্যাস নেই যে! যাকেই ফোন করি, সে-ই শুনি বাড়ী নেই। পুষিকে ডাকলাম, বললে engagement আছে! এ ক্ষেত্রে আপনি ছাড়া আমার গতি কী বলুন?

—কিন্তু······

—চলুন চলুন, আর মুখভার করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। এই বলে সে এক রকম জোর করেই বিশুকে টেনে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে বসল।

মিঃ ঘোষালের মোটর এতক্ষণ বাড়ীর ফটকেই অপেক্ষা করছিল। ওরা উঠে বসতেই ড্রাইভার ধর্ম্মতলার দিকে গাড়ী চালিয়ে দিল।

টেমিং অফ দি শ্রু ছবিখানা সৌখীন সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। ছবিটাতে স্বামী স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাঙ্ক ও মেরী পিক্‌ফোর্ড। অভিনয়ও হয়েছিল প্রথম শ্রেণীর। কিন্তু বিশুর মনের মধ্যে সে অভিনয়ের কোন ছাপই পড়লনা। মিনতির মতো সে-ও একদৃষ্টে রূপালী পর্দ্দাটির দিকে তাকিয়েছিল; কিন্তু কিছুই তার মাথায় ঢুকছিল না। ঘুরে-ফিরে কেবলই তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল, সকাল বেলাকার দেখা পুষ্পর সেই পাণ্ডুর মুখখানি! তার ফুলো ফুলো চোখের অশ্রু সজল দৃষ্টি,—ব্যথা

কাতর কণ্ঠস্বর ! রুগ্ন মেয়েদের মতো তার সেই অলস-মন্থর গতিভঙ্গী ! তার কেবলই মনে হচ্ছিল, সকাল বেলাকার মতো এক রাশ রুক্ষ কোঁকড়ান চুল এলিয়ে উৎকন্ঠিত দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে, পুষ্প হয়তো এখনও তার জন্যে অপেক্ষা করছে !

অভিনয় শেষ হ'তে রাত্রি প্রায় পৌনে নটা বেজে গেল। মিনতিকে বাড়ী পৌছে দিয়ে সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে বিশু যখন পুষ্পদের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছল, কলকাতার ঘড়িতে তখন রাত্রি সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছিল। আকণ্ঠ উৎকণ্ঠা নিয়ে সে ভেতরে খবর পাঠাল।

কয়েক মিনিট পরেই পুষ্প ওপর থেকে নেমে এল। বিশুকে এত রাত্রি করে আসতে দেখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সে বলল : এতক্ষণে বুঝি আপনার অফিসের ছুটি হ'লো ?

বিশু অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বলল : আজ্ঞে না ! একটা মুস্কিলে পড়ে গিয়েছিলাম—

পুষ্প হাসল। বলল : কী মুস্কিলে পড়েছিলেন আবার ?

বিশু তখন একটু ভরসা পেয়ে মিনতির সঙ্গে ছবি দেখতে যাওয়ার কথাটা বলল।

কৈফিয়ৎ শুনে পুষ্প ভ্রূকুঞ্চিত করল। বলল : মিনতি আমাকেও ফোন করেছিল। কিন্তু আপনার জন্যেই আমি যেতে পারিনি ! যাক্ আপনার কী কথা আছে বলুন !

পুষ্পর কণ্ঠস্বর শুনে বিশুর আবার সব উৎসাহ লোপ পেয়ে গেল। সে ইতস্তত করতে লাগল।

পুষ্প আবার বলল : রাত্তির অনেক হ'য়ে গেছে বিশুবাবু।

বিশু তখন অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বলল: দেখুন, কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আপনাকে প্রথমেই অনুরোধ করছি, ইয়ে, আমার নামটা আপনি কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না।

—তার মানে?

—মানে, কথাটা আপনাকে বলতে বারণ আছে।

—বারণ আছে তো বলতে এসেছেন কেন? পুষ্প বিরক্ত হয়ে বলল, আমি তো আপনাকে অনুরোধ করিনি।

বিশু এর পর আর কী বলবে ভেবে পেল না। বিমূঢ়ভাবে সে পুষ্পর দিকে চেয়ে রইল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরবে বসে রইল।

তারপর পুষ্প হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল: আপনার আর কোন কাজ আছে?

পুষ্পকে প্রস্থানোদ্যত দেখেই বিশুর মুখ শুকিয়ে গেল। কিন্তু মুখ দিয়ে তার একটা কথাও বেরুল না।

—তাহলে, আপনি এখন আসুন,—রাত্তির অনেক হয়ে গেছে। পুষ্প আর অপেক্ষা না করে অন্দরের দিকে অগ্রসর হ'লো।

—দাঁড়ান। পুষ্পকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে, ঠিক শেষ মুহূর্তে বিশু যেন চীৎকার করে উঠল। তারপর দ্রুতপদে তার কাছে এগিয়ে গেল।

পুষ্পও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বিশু তখন চাপাস্বরে বলল: যা বলতে এসেছিলাম সেটা শুনে যান। আপনার রজতদা মিনতি দেবীর সর্বনাশ করতে চান।

—সেকি !—পুষ্প চমকে উঠল।

পুষ্পর মুখের দিকে চেয়ে বিশুর আবার সব গোলমাল হ'য়ে গেল। সে আর কিছু বলতে না পেরে শুধু একটা ঢোক গিলল।

—কী বলতে চান বলুন না। পুষ্প যেন ধমক দিল।

বিশু তখন আর একবার ঢোক গিলে বলল : মিনতি দেবীর পিতামহ জনার্দ্দন বাবু একটা জমিদারী কিনছেন—

—আঃ, সে তো জানি,—বাধা দিয়ে পুষ্প বলল : কিন্তু আপনি কী বলতে চান ?

—বলছি, সেই মহালটার বায়না হয়ে গেছে,—কিছুদিনের মধ্যেই বাকী সত্তোর আশী হাজার টাকা দাখিল করে······

—আঃ, ও সব তো জানি,—পুষ্প এবার রীতিমত ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠল।

বিশু তাড়াতাড়ি বলল : দেনা-পাওনাটা গোবিন্দপুর রেজিষ্ট্রারী অফিসেই হ'বে, অর্থাৎ, আগের রাত্রিতে টাকাটা জনার্দ্দন বাবুর তহবীলেই থাক্‌বে—

—তারপর ? পুষ্প এবার চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

—আমাদের দলপতি টাকাটা সেই রাত্রিতেই লুট করতে চান,—সঙ্ঘের জন্যে !

ব্যাপারটা কল্পনা করে পুষ্প স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।

পুষ্পের চোখের দিকে চেয়ে বিশু তার মনের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারল। বলল : ডাকাতী করবার ভারটা পড়েছে আমার ওপর। কিন্তু কথাটা বিশেষ করে আপনাকে জানাতে বারণ আছে।

পুষ্প অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করল : কে বারণ করেছে ?

—কে আবার! মুচকে হেসে বিশু বলল: আপনার রজতদা!

বিশুর হাসিটা লক্ষ্য করেই পুষ্প আবার ভ্রুকুঞ্চিত করল। তারপর স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল: দলপতি বারণ করা সত্ত্বেও কথাটা আমাকে জানাতে এসেছেন কেন?

পুষ্প যে এ ধরণের কোন প্রশ্ন করতে পারে, এ চিন্তা একবারও বিশুর মাথায় আসেনি। সে কোন উত্তর দিতে না পেরে বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রইল।

পুষ্প তখন আস্তে আস্তে বলল: মিনতির সঙ্গে আপনার যে আজ কাল খুব ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছে তা আমি জানি। কিন্তু তার উপকার করবার জন্য আপনি আমাকে দলে টানবার চেষ্টা করছেন কেন?

এবার বিশুর বুক গুর গুর ক'রে উঠল।

—সঙ্ঘগুরুর আদেশ অমান্য করবার পরিণাম যে কী,—তা কি আপনি জানেন না?

বিশু স্খলিতকণ্ঠে কী একটা বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছু বোঝা গেল না।

পুষ্প আবার বলল: মিনতির জন্যে বিদ্রোহ যদি করতেই হয়,—আপনি একলাই করবেন।

—এ সব আপনি······আমি······

—আমি ঠিকই বলছি। বিশুর উৎকণ্ঠাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পুষ্প আবার বলল: রজতদা আপনাকে চিনতে পারেনি, কিন্তু আমি পেরেছিলাম। তাই আপনাকে দলে নিতে আমার আপত্তি ছিল।

আচ্ছা নমস্কার—এই বলে আর কোনদিকে না চেয়ে সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিশু আতঙ্কগ্রস্তের মতো সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তার শরীরটা একবার থরথর করে কেঁপে উঠল।

দশ

Himalayan Blunder কথাটার সঙ্গে বিশুর পরিচয় ছিল। কংগ্রেসে থাকার সময় High Command প্রদত্ত বিবৃতির মধ্যে কথাটা সে বহুবার দেখেছে ; কিন্তু ব্যাপারটা সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞতা তার কিছুমাত্র ছিল না।

তাই, বিপদটা যখন তার নিজের জীবনে দেখা দিল তখন সে একেবারে দিশেহারা হ'য়ে গেল। নিজের অবিমৃষ্যকারীতার ভয়াবহ পরিণাম কল্পনা করে সে প্রথমেই তৎপর হয়ে উঠল আত্মগোপনের জন্য। রজত অবশ্য উপস্থিত কলকাতায় নেই। কিন্তু তার বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রচার করে দিয়ে পুষ্প তো তাকে এই মুহূর্ত্তেই বন্দী করাতে পারে! এমন কি,—ব্যাপারটা কল্পনা করতেই বিশুর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল,—স্বয়ং পুষ্পই যদি সঙ্ঘের পুরোণ সভ্যদের ডেকে ব্যাপারটা সব খুলে বলে, তাহলে ?

সে কল্পনা করবার চেষ্টা করে : সঙ্ঘের বিরাট হলটির মধ্যে বিপ্লবীরা সকলে মিলিত হয়েছে তার বিচারের জন্যে। পুষ্প তাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব! কণ্ঠস্বর তার ধীর এবং গম্ভীর। তারপর তার আত্মপক্ষ সমর্থনের ছেলেমানুষীকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে বোর্ড

বজ্রগর্জ্জনে উচ্চারণ করছে তার চরম শাস্তির কথা : Liquidate him and immediately.

তারপর ?

বিশুর কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। আর সে কিছু ভাবতে পারল না, শুধু উন্মুখ হয়ে উঠল আত্মগোপনের জন্য। হোষ্টেলে ফিরে নিজের নির্দ্দিষ্ট কক্ষটির মধ্যে রাত্রিবাস করবার প্রশ্নটা তার কাছে নিছক পাগলামী বলে মনে হ'লো। কিন্তু এত রাত্রিতে কোথায় যাবে সে ? অনাগত মৃত্যুদণ্ডের কবল থেকে মুক্তি পাবার উপায় স্বরূপ একের পর একটা ক'রে অনেক রকমের মতলবই তার মাথায় এল। কিন্তু বিপদের গুরুত্ব অনুযায়ী মস্তিস্ক তার তৎপর হ'লোনা। শেষে আত্মগোপনের অজুহাতে জনতার মধ্যে গিয়ে রাত্রিবাস করাটাই তার কাছে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হলো। বহুকাল পরে আবার সে উপস্থিত হ'ল গিয়ে কালীঘাটের নাট-মন্দিরে।

পরদিন সকালে উঠে বিশুর কিন্তু প্রথমেই মনে হ'লো নাট-মন্দিরের মতো একটা নোংরা জায়গায় কিছুতেই কায়েমীভাবে বাস করা যেতে পারে না। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে আবার পথ হাঁটতে আরম্ভ করল। দিনের আলোয় কর্ম্মব্যস্ত সহরের দিকে তাকিয়ে গত রাত্রির ভয়-প্রবণতাকে তার যেন অত্যন্ত ছেলেমানুষী বলে মনে হ'তে লাগল। একটা অলীক আশঙ্কাকে সত্যের মর্য্যাদা দিয়ে, হতভাগা লক্ষ্মীছাড়ার মতো যত্র তত্র রাত্রিবাস ক'রে সে যেন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছে ! ক্রমে বিরক্তিটা তার ক্রোধে পরিণত হ'লো।

কিন্তু উপায় কী !

রাজপথ ত্যাগ ক'রে বিশু অলি-গলির সন্ধান করে পথ চলতে আরম্ভ করল। সঙ্গে অর্থ ছিল। সুতরাং উদর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে সে উপায় চিন্তা করতে করতে সহর টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল। কি করা যায়···

হঠাৎ একটা রাস্তার নাম চোখে পড়তেই সে থমকে দাঁড়াল। ঠাকুরদাস পালিতের লেন। এই গলিটারই তিন নম্বর বাড়ীতে তার গ্রামের রমেশদা থাকে। তার কাছ থেকে নিজের বাস্তুভিটের বর্ত্তমান অবস্থাটা জেনে গেলে কেমন হয়! অবশ্য গ্রামের প্রতি তার অন্তরের টান এতটুকুও নেই। কিন্তু সেখানে একটা পৈত্রিক বাড়ী তো তার আজও আছে! উপস্থিত সেখানে গিয়ে তো সে কিছু দিন আত্মগোপন করে থাকতে পারে! কিন্তু বর্ত্তমানে বাড়ীটা আছে কী অবস্থায় সেটা আগে জানা দরকার! ছ' বছর পূর্ব্বে সে তার বাড়ীর চাবীটা দিয়ে এসেছিল মেজ-কাকার হাতে। কিন্তু কাকাটি তার নিতান্তই আপনার বলেই তো বেশী ভয়! পিতার সহোদর তিনি, বিষয়ের সরীক। ভাইপোর অনুপস্থিতির সুযোগে তিনি যে তার বাস্তুর উপর এতদিনে কাটুরা চাষ আরম্ভ করে দেননি, সে সম্বন্ধে আগে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিশু তিন নম্বর ঠাকুর দাস পালিত লেনে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। বাড়ীটা একটা কেরাণী মেস! বাইরে তখন দিনের আলো উজ্জল থাকা সত্ত্বেও বাড়ীটার মধ্যে কিন্তু অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। উনুনে সম্ভবতঃ কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই আগুন দেওয়া হয়েছিল। ঘুঁটে এবং কেরোসিনের বিকট ধোঁয়ায় বাড়ীটার আবহাওয়া তখন হয়ে উঠেছিল ভারাক্রান্ত। তার ওপর বাড়ীটার তিন দিক বন্ধ; রাস্তার দিকটি ছাড়া

আর কোন দিক্‌ থেকেই আলো বাতাস আসবার উপায় ছিল না। তাই বড় বড় কুণ্ডলী পাকিয়ে সেই বিরাট ধূম্রস্রোত সদর দরজা দিয়েই বেরিয়ে আসছিল।

নাকে কোঁচার খুঁট্‌ চাপা দিয়ে বিশু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করল। সদর দরজা পেরিয়েই ক্ষুদ্র একটি উঠান। তার সর্ব্বত্র তরকারির খোসা ও মাছের আঁশের ছড়াছড়ি! এক কোনে ঘুঁটে ও কয়লা রাখবার ছোট একটি খুপরি। তার পাশেই জলের কল, স্নানের চৌবাচ্ছা ও পাইখানা।

উঠানটা যে এক সময় সিমেণ্ট করা ছিল সেটা বোঝা যায়। কিন্তু উপস্থিত শ্যাওলার আধিক্যে এত পিচ্ছিল যে খুব সাবধানে না হাঁটলে দুর্ঘটনা ঘটা অপরিহার্য্য! বিশু অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে, ধীরে ধীরে উঠানটুকু পার হয়ে রান্নাঘরের ভাঙ্গা রোয়াকটির ওপর উঠে দাঁড়াল। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল : ঠাকুর—

কেউ সাড়া দিলনা। বাড়ীটার সর্ব্বত্রই যেন একটা বিশ্রী নির্জ্জনতা বিরাজ করছিল। বার কয়েক ডাকাডাকির পর সাড়া না পেয়ে সে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র কুঠুরীর সামনে দাঁড়াল। অস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল, কুঠুরীটার মধ্যে মাদুর পেতে একটি লোক আদুড় গায়ে শুয়ে রয়েছে এবং তার শিয়রের কাছে বসে স্থূলাঙ্গিনী একটি স্ত্রীলোক ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথা কইছে।

বিশুকে সামনে দেখেই লোকটি বলল : কে হ্যা ?

—এখানে রমেশবাবু থাকেন ?

—রমেশবাবু ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, থাকেন এখানে ?

স্ত্রীলোকটি ইতিমধ্যে উঠে এসে বিশুর সুমুখে দাঁড়িয়েছিল। বিশুর প্রশ্ন শুনে সে একবার পিছন দিকে তাকাল। তারপর দোক্তা-খাওয়া মিশ কালো রঙের দাঁতগুলি বার ক'রে ফিক্ ক'রে একটু হাসল। বলল : ওমা, রমেশবাবু আবার কে গো !—ভাষার টানে বোঝা গেল স্ত্রীলোকটি উৎকল দেশীয়।

বিশু বলল : রমেশবাবু,—মানে, রমেশ চৌধুরী,—এম্ মিত্তিরের অফিসে চাকরী করে !

এবার লোকটি উত্তর দিল। পূর্ব্ববৎ শুয়ে শুয়েই বলল : না, এখানে রমেশবাবু-টাবু কেউ নেই !

—নেই ? ওঃ, দেখুন, পাঁচ বছর পূর্ব্বে তিনি এখানে থাকতেন ! এখন কোথায় থাকেন, বলতে পারেন ?

লোকটি গম্ভীর ভাবেই বলল : না।

—না ?—উত্তর শুনে বিশু অকারণ একবার মাথায় হাত দিল।

তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলল : তুমি "ম্যানিজর" বাবুর কাছে চল গো বাবু। তিনি ঠিক বলতে পারবে।—বলে সে নিজেই বিশুকে নিয়ে দোতলায় উঠল। যেতে যেতে আবার প্রশ্ন করল : তুমি বুঝি এই মেসে থাকবে গো বাবু

—কেন বলতো ?

—তাহলে, তোমার যা কেনা-কাটার দরকার, আমাকে দিয়েই আনিও। ও বাণেশ্বর মুখপোড়াকে দিও না,—ব্যাটা পুকুর চুরী করবে।

বিশু এতক্ষণে বুঝল স্ত্রীলোকটা এখানকার ঝি এবং বাগেশ্বর সম্ভবতঃ চাকর।

ম্যানেজারের কক্ষটিও ক্ষুদ্র। ভদ্রলোক একটা নোংরা বিছানার ওপর শুয়েছিলেন। ইনিও চাকুরী-জীবি এবং অন্যান্য মেস-মেম্বরদের মতো অফিস্ থেকে ফিরে এঁরও আর বসে থাকবার ক্ষমতা থাকে না,—শুয়ে পড়েন! বিশুর প্রশ্ন শুনে তিনিও প্রথমে ঘাড় নাড়লেন, কিন্তু একেবারে নিরাশ করলেন না! লোকটি পাঁচ বছর পূর্ব্বে এখানে থাকত শুনে তিনি চিন্তিত হ'য়ে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তারপর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন : নাঃ, মনে পড়ছে না তো! আচ্ছা, চলুন দেখি একবার পোষ্ট অফিসের কাছে......

বিশুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আর একটা ক্ষুদ্র কুঠুরীতে প্রবেশ করলেন। বিশু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল,—এইটুকু ঘরের মধ্যে চারজনের বিছানা পাতা রয়েছে। একটা বিছানার ওপর একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক চীৎ হয়ে শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে বিঁড়ি টানছিলেন। বিশু সমভিব্যাহারে ম্যানেজারের আবির্ভাবে তিনি পা নাচানো বন্ধ ক'রে ভ্রূকুটী করলেন!

ম্যানেজার প্রশ্ন করলেন : হ্যাঁ হে পোষ্টঅফিস, রমেশ চৌধুরী নামে কারুকে তোমার মনে পড়ে? বছর পাঁচেক্ পূর্ব্বে এখানে থাকৃত?

পোষ্ট-অফিস কথাটার তাৎপর্য্য, ভদ্রলোক নাকি, একখানি গেজেট্ বিশেষ। পৃথিবীর সব খবরই নাকি তাঁর নখ-দর্পণে থাকে এবং সত্যই তিনি পোষ্ট-অফিসে চাকুরী করেন!

প্রশ্ন শুনে পোষ্ট-অফিস উঠে বসলেন। তারপর নিঃশেষিত নির্ব্বাণোন্মুখ্ বিড়িটাতে একটা সজোর টান দিয়ে বললেন: এতদিন পরে সে শালার খোঁজ কেন হে?

সম্বোধন শুনে বিশু ভড়্কে গেল।

পোষ্ট অফিস বলে চললেন: আজ দেখি না, ব্যাটা একটা প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে চলেছে। আমার সঙ্গে চোখাচখি হ'লো,—শালা আমাকে চিনতেই পারলে না! পঁয়তাল্লিস্ টাকা মাইনের মার্চ্চেণ্ট অফিসের কেরাণী, পাঁচ বছর পূর্ব্বেকার সেই রমেশ চৌধুরী আজকাল মোটর ছাড়া চড়ে না হ্যা! হরি হে আর কত দেখাবে বাবা!

কিছু বুঝতে না পেরে বিশু বলল: বলেন কী?

পোষ্ট-অফিস এবার উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। বললেন: সেই কথাই তো বলছি! শালা,—একটা বিধবার ছেলেকে ফাঁসিয়ে পুলিশে বড় চাকরি পেয়ে গেছিস বলে ধরাকে একেবারে সরা দেখবি? শালা, আমাকে চিনতেই পারলে না?

বিশু ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারে নি। তার সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে পোষ্ট-অফিস্ তাঁর স্বভাব-সুলভ সুললিত ভাষায় যা বললেন তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে: রমেশ চৌধুরী যখন এই মেসে থাকত, তার বহুদিন পূর্ব্বে থেকেই সে গোপনে গুপ্তচর-বৃত্তি অবলম্বন করেছিল। বছর চারেক পূর্ব্বে পুলিশকে একটি বিরাট বোমার মাম্লার হদিশ্ বাৎলে দিয়ে সে প্রকাশ্যে পুলিশের চাকরী গ্রহণ করে এবং পূর্ব্বের কেরাণীগিরি ত্যাগ ক'রে। এই বোমার মামলার প্রধান আসামী ছিল এক দরিদ্র বিধবার একমাত্র সন্তান। রমেশ চৌধুরী সেই ছেলেটির সঙ্গে বন্ধুত্বের

অভিনয় ক'রে, এমন কৌশলে কাজ হাঁসিল করেছিল যে, সমস্ত এন্‌-কি ডিপার্টমেণ্ট তার রহস্যময় কর্ম্মকুশলতা দেখে প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠেছিল। সেই থেকেই তার চাকরীর উন্নতি এবং আজ সে প্রকাণ্ড আট্ সিলিণ্ডারের বুইক্ চড়ে বেড়ায়, বাস ক'রে সাহেব পাড়ার প্রকাণ্ড একটা বাড়ীতে এবং উন্নত মার্গের-সম্প্রদায় ছাড়া মেশে না।

রমেশ চৌধুরীর উন্নতির ইতিহাস শুনে বিশু অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কোন মন্তব্য না করে সে বিনীতভাবে পোষ্ট-অফিসের কাছে তার ঠিকানাটা চাইল।

—ঠিকানা আবার কী?—পোষ্ট অফিস বল্লেন,—সট্ ষ্ট্রীটে গিয়ে যাকেই জিজ্ঞাসা করবেন, সেই দেখিয়ে দেবে! কিন্তু ব্যাপারখানা কী বলুন তো মশাই! চাকরীর চেষ্টায় যাচ্ছেন নাকি? বেশ বেশ, পুলিশের চাকরী খুব ভাল মশাই,—বেশ দু' পয়সা আছে।

বিশু তখন উঠে দাঁড়াল এবং উভয়কে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হ'লো।

—আরে মশাই, যাচ্ছেন কোথায়—দাঁড়ান না,—পোষ্ট-অফিসও তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। দড়ির আলনা থেকে একটা ছেঁড়া ফতুয়া টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বল্লেন: চলুন না, এক সঙ্গেই বেরুনো যাক্—

খড়ম পায় দিয়ে বিশুর সঙ্গে রাস্তায় এসে পোষ্ট-অফিস্ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: আচ্ছা মশাই, রমেশ বাবু আপনার আত্মীয় হন, না?

পোষ্ট অফিসের গলার আওয়াজটা ইতিমধ্যেই বদলে গিয়েছিল। বিশু আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: কেন বলুন তো?

—তাকে আমার কথাটাও একটু বলবেন! একদিন আমি তার room-mate ছিলাম!······আমার যা রোজগার তাতে দেশে আমার ছেলেমেয়েরা দু'বেলা খেতেও পায় না······বলেই তিনি দ্রুতপদে একটা একটা গলির মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন!

বিশু অবাক হ'য়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

এগার

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার পর বিশু রমেশ চৌধুরীর বাড়ী খুঁজে বার করল। কিন্তু বাড়ীতে ঢুকতে পেল না। ফটকে মোতায়েন ছিল দু'জন সঙ্গীনধারী গুর্খা সেপাই, তারা বাধা দিল। বিশু তার নাম-ধাম বলে ভেতরে এত্তেলা পাঠাতে অনুরোধ করল। কিন্তু সেপাইরা সম্মত হলো না। বলল : আভি ভাগো, সবেরে অফিস্ মে যাও।

মেজাজ খারাপ না করে বিশু তাদেরকে মিষ্টি কথায় বোঝাবার চেষ্টা করল,—সে সাহেবের আপনার লোক। কিন্তু তারা কিছুতেই রাজী হলো না। পূর্ব্বের মতো সাফ্ জবাব দিল : আভি ভাগো...

বিশুও নাছোড়-বান্দা। রমেশদার সঙ্গে দেখা তাকে করতেই হবে।—ব্যাপারটা ক্রমে বিতণ্ডায় দাঁড়িয়ে যাবার উপক্রম করল। দেখতে দেখতে দু-চার জন ক'রে লোকও জমতে আরম্ভ করল রাস্তার ওপর। এমন সময়ে একটি ভৃত্যস্থানীয় লোক ভীড় ঠেলে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল। লোকটার হাতে ঝাড়নে বাঁধা গোটা চারেক বোতল ছিল। সে পোঁটলা সামলে সিপাইদের উদ্দেশে বলল : ক্যেয়া হয়েছে রে?

সিপাই দুজনও সমস্বরে অভিযোগ করল : আরে, দেখো তো বন্সী ভাই...

তাদের কথা শেষ হ'তে না হতেই বিশু এগিয়ে গিয়ে সেই লোকটির কাঁধে হাত দিল। তারপর বলল : কী রে বংশী, তুইও আমাকে চিন্‌তে পারলি না ?

বংশী সাঁপুই তার গ্রামের লোক। সে একবার অবাক হয়ে বিশুর দিকে তাকাল। তার পর সহর্ষে বলে উঠল : তুমি ? বিশুদা ? জেল্ থেকে কবে ছাড়ান পেলে ? এসো, এসো,—

বংশী অতি সমাদরে বিশুকে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করল। ওদিকে হাওয়া উল্টো দিকে বইতে দেখে রাস্তার জনতা এবং সেপাই দুজনও বিমূঢ়ভাবে পরস্পর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

বিশুকে ড্রইংরুমে বসিয়ে বংশী ভেতরে খবর দিতে উদ্যত হলো। বিশু বাধা দিয়ে বলল : বংশী, তুই যে এখানে ?

বংশী একটু হাসবার চেষ্টা করল।

—গ্রাম ছেড়ে শেষে চাক্‌রী করতে বেরিয়েছিস্ নাকি ?

—চাকরী না করলে চলে ? ছেলে-পুলে খাবে কী ?

—আগে চলত কী করে ?

বংশী আর কথা বাড়াল না। হাতের বোতলগুলো দেখিয়ে বলল : তুমি বসো দাদা, আমি এগুলো দিয়ে আসি—

—ও গুলো কী রে ?

—বীয়ার !

—বীয়ার, মানে,—মদ ?—বিশু অবাক হয়ে বংশীর দিকে তাকাল। বলল : কে খাবে রে,—রমেশদা নাকি ? বাঃ, দাদার আমার সব দিক্ দিয়েই উন্নতি হ'য়েছে দেখছি।

—হুঁ,—মুখের ওপর একটা বিরস ভাব ফুটিয়ে তুলে বংশী বলল: তুমি একটু বসো, আমি খবর দি'।—বলে, সে পর্দ্দা ঠেলে ভেতরে চলে গেল।

রমেশ চৌধুরীর চাকৃরীতে উন্নতি হওয়ার আসল কারণটি শোনার পর থেকেই বিশুর মন খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। এখন আবার বংশীর কাছে তাঁর মদ খাওয়ার কথা শুনে, তার সমস্ত শরীরটা যেন বিষিয়ে উঠল। রমেশ চৌধুরী একজন অসহায় বিধবার একমাত্র সন্তানকে পণ্য ক'রে নিজের চাকৃরীর উন্নতি করেছে,—এটা তার কাছে খুব বড় অপরাধ বলে মনে হয়নি! সে কাজটা রমেশদা না করলে অন্য আর একজন কেউ নিশ্চয় করতো! Intelligence Branch-এর পিছনে গভর্ণমেণ্ট তো অকারণ অত অর্থব্যয় করে না! কিন্তু চাকৃরীর উন্নতি হলে মানুষকে যে মদ খেতেই হ'বে, এ কেমন কথা।

কিন্তু অতঃপর তার কর্ত্তব্য কী? পাঁচ বছর পূর্ব্বে সে যে রমেশদাকে দেখে গিয়েছিল, সে লোক এখন মরে গিয়েছে! সুতরাং এই শ্রেণীর জীবগুলোর সঙ্গে আর কোন রকম সম্পর্ক রেখে লাভ কী?

বিশু বসেছিল একটা কোমল কুশন কোচের ওপর। হঠাৎ অস্বস্তি ভরে সে উঠে দাঁড়াল।—রমেশদার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে নিজের জীবনের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনটাও হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার। পাঁচ বছর পূর্ব্বে সে নিজে যা ছিল, এখন তো আর তা নেই। সেদিন পুলিশের হাতে বন্দী হ'বার জন্যে অপেক্ষা করতো সে অবজ্ঞাভরে। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারীর দল তাকে ধরতে আসত

রাজদ্রোহের অপরাধে, কিন্তু তারা আসত শ্রদ্ধাভরে, অপরাধীর মতো মাথা নীচু ক'রে। কিন্তু আজ?

এখন পুলিশকে সে ভয় করে কিনা সেটা পরের কথা! কিন্তু পুলিশকে সর্ব্বতোভাবে এড়িয়ে চলতে না পারলে সঙ্ঘ তার প্রতিভা সম্বন্ধে সমালোচনা আরম্ভ করবে। প্রয়োজন হলেই, সঙ্ঘ-দণ্ড-বিধির সতের নম্বর ধারাটা তার ওপর প্রয়োগ করা হ'বে। সমষ্টিকে রক্ষা করবার জন্যে বিপ্লবীরা একজন মাত্র অপদার্থকে ধ্বংস করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবে না! সুতরাং এ সিংহের গুহায় আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করার সার্থকতা কী!

মনে মনে অনেক কিছু ভাঙ্গা-গড়া করল সে। অনেক প্রয়োজনীয় কথাই তার মনে এলো; শুধু মনে পড়লনা আজ সে কেন এসেছিল এখানে। নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিল বলেই সে আজ সারাদিন সহরের অলিগলির মধ্যে টহল দিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন Special Branch কর্ম্মচারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার বা তাঁর আশ্রয়ে আত্মগোপন করে থাকার ফলাফলটা তার নিরাপত্তার দিক থেকে যে কতখানি সুবিধাজনক হ'তে পারে সে সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত একেবারেই তার মাথায় এল না।

মন স্থির করে বিশু তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হ'লো। ঠিক এই সময় স্বয়ং রমেশ চৌধুরী দ্রুতপদে এসে ঘরে ঢুকলেন।

—কবে বেরুলি তুই? একটা খবরও দিতে নেই রে,—রমেশবাবু আর কিছু বলতে পারলেন না, শুধু দৃঢ় মুষ্টিতে বিশুর একটি হাত মুঠো করে ধরে অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হ'লেন।

বাইরের ড্রইংরুমের অনুকরণে সাজান আর একটা ঘরের মধ্যে বিশুকে বসিয়ে রমেশবাবু হুঙ্কার ছাড়লেন : ওরে বংশী, তোর বৌদিকে একবার……

বংশী তৎক্ষণাৎ এসে ঘরে ঢুকল। তারপর গম্ভীরভাবে বলল : বৌদির ভাই এসেছেন,—ওপরের ঘরে বসে তাঁরা কথা-বার্ত্তা কইছেন—

—ওঃ, আচ্ছা তুই যা! রমেশবাবু তখন সেইখানেই বসে পড়ে বিশুকে বলিলেন : এখন তোর সব খবর কী বল দেখি! কবে ছাড়া পেলি, কোথায় আছিস্, কী করছিস্?

বিশু সংক্ষেপে সব কথার উত্তর দিল।

সে দেড়শো টাকা মাইনের চাক্‌রী করছে শুনে রমেশবাবু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তারপর হঠাৎ আবার দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বলে গেলেন : তুই একটু বোস, আমি এক্ষুনি আসছি।

রমেশদা'র কুৎসিত মনোবৃত্তি সম্বন্ধে বিশুর মনে যে অন্তর্দ্বন্দ্বটা চলছিল, সেটা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'বার পরমুহূর্ত্তেই অন্তর্হিত হ'য়ে গেল! ন্যায়ের বিধানে, মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, এ নিয়ে তার বিচারপ্রবণ মন আর মাথা ঘামাতে স্বীকৃত হলো না। আসন্ন বৌদি সম্ভাষণের আশায় সে উন্মুখ হয়ে উঠল! রমেশদা'র স্ত্রী রমাও তার গ্রামের মেয়ে। সেও ছিল তার ছোট বেলাকার খেলার সাথী! কিন্তু, দীর্ঘ অদর্শনের পর আজ সে আবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে কুশল প্রশ্ন করতে পারবে তো! বিশু চঞ্চল হয়ে উঠল। অগ্নিমন্ত্রের উপাসক সে, তুচ্ছ একটা পল্লী-নারীর আসন্ন 'স্নেহ-সম্ভাষণের সম্ভাবনায় তার অবসন্ন স্নায়ুগুলো যেন উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল।

চোখ বুজে সে কল্পনা করবার চেষ্টা করল : একমুখ হাসি নিয়ে, মাথার ঘোম্‌টা সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে ছুটে আসবে রমা-বৌদি। কিন্তু তার দিকে দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে ; তারপর তার দিকে বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে, গালে হাত দিয়ে বলবে : ওমা, তোমার একি চেহারা হয়েছে ভাই ঠাকুরপো!—বহুকাল পূর্ব্বে তার মা যেমন তার দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে বলতেন : ওমা, তোর একি চেহারা হয়েছে বিশু!

মেয়েদের এই অদ্ভুত স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের কথা স্মরণ করে হঠাৎ চোখ দুটো তার অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে! গলার মধ্যেও কী যেন কী একটা জিনিষ আট্‌কে গিয়ে অস্বস্তির সৃষ্টি ক'রে! জিনিষটা যেন কেবলই ঠেলে ঠেলে ওপর দিকে আসবার চেষ্টা ক'রে।

বংশী এসে ঘরে ঢুকল। বলল : চল দাদা, তোমাকে ওপরে ডাকছে!

আবার কক্ষ পরিবর্ত্তন করার প্রস্তাবে বিশু বিরক্ত হ'লো। বলল : বাবা রে বাবা! তার চেয়ে রমা-বৌদিকে একবার ডাক্ না, দেখা করে চলে যাই!

ঘরের ঘড়ীটার দিকে চোখ রেখে বংশী বলল : না, তুমি ওপরেই চল।

বংশীর সঙ্গে দোতলায় উঠে সে যে ঘরটায় ঢুকল তার সাজ-শয্যা ও আস্‌বাব-পত্র শোবার ঘরের মতো। কিন্তু ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। সেখানে তখন রমেশবাবু ছাড়া আর যারা ছিল, তারাও তার অপরিচিত নয়। সে অভিভূতের মতো চৌকাঠের ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিশুকে দেখে শুভেন্দুও অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলল: একি? বিশুবাবু,—আপনি?

বন্দনাও কম বিস্মিত হয়নি। কিন্তু সে ভাবটা সামলে নিয়ে সে কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করল: Oh my...আসুন আসুন! আপনি যে এত শীগ্‌গীর আপনার কথা রাখবেন ভাবতে পারিনি—

ব্যাপার দেখে রমেশবাবুও হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন: ইয়ে, তোমরা ওকে চেন নাকি?

বন্দনা উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলল: Oh my…ওঁকে চিনিনা? চলুন বিশুবাবু আমরা অন্য ঘরে যাই এ ঘরে ওঁর আবার কে ভাই আসবে আলাপ করতে……

বাধা দিয়ে রমেশবাবু বললেন: আরে, ওই তো আমার সেই ভাই!

—Oh my,—বন্দনা উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার বসে পড়ে বলল: How strange!

কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমে উঠল। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত রমা বৌদির দর্শন না পেয়ে বিশু মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তার রাগ হ'তে লাগল শুভেন্দুর ওপর! মানুষের শোবার ঘরে বসে আড্ডা মারাটা কোন দেশী ভদ্রতা? শুভেন্দু রমেশদার যত বড় বন্ধুই হোক না কেন, বাইরের লোক তো বটে। তার সুমুখে রমা বৌদির মতো পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বার হবে কেমন করে?

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপারও তাকে চঞ্চল ক'রে তুলল। বন্দনার মতো মেয়ের সঙ্গে রমেশদার এত ঘনিষ্ঠতা কেন? ব্যাপারটা সম্ভবপর

হলোই বা কী ক'রে? শুভেন্দু পুলিশে চাকরী ক'রে, সুতরাং তার সঙ্গে রমেশদার বন্ধুত্ব হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বন্দনা? সে কি শুধু শুভেন্দুর ভগ্নি বলেই এ বাড়ীতে এতখানি আধিপত্য লাভ করেছে? কিন্তু এ রকম ঘনিষ্ঠতা তো রমা বৌদির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে! রজতের মুখে শোনা সেদিনকার কাহিনীটা আবার নতুন ক'রে তার মনে পড়ে গেল, Beware of that girl বন্দনা—

হঠাৎ বন্দনা প্রস্তাব করল: আজ যখন আপনাকে পেয়েছি, ছাড়ছি না। খাওয়া দাওয়ার পর সমস্ত রাত্তির জেগে আজ আমরা আপনার adventure-এর গল্প শুনবো!

সঙ্গে সঙ্গে রমেশবাবুও তাকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু শিশুর মুখ দিয়ে আপত্তি করবার মত একটা আওয়াজও বেরুল না। একটা কল্পনাতীত ঘটনাকে সে অতি সহজ ভাবেই মেনে নিতে বাধ্য হ'লো। যে সর্ব্বনেশে আশঙ্কাটা মুহূর্ত্তপূর্ব্বেও তার মনে জাগেনি, তার স্বাভাবিক স্বরূপ প্রত্যক্ষ ক'রে কিছুক্ষণের জন্য সে শুধু নির্ব্বাক হয়ে গেল।

বিশুর মুখের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে বন্দনা এবার খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল! বলল: Oh my···অত ঘাবড়ে যাবার কি আছে এতে? এতদিন পরে দাদার বাড়ীতে এলেন, এমনি ছাড়া পাবেন নাকি?

এবারেও বিশু কোন কথা কইতে পারলনা। তখনও সে স্তম্ভিত হয়ে ভাবছিল: বন্দনার মতো মেয়েও যে স্বামীর ঘর করতে পারে, এই সোজা কথাটা পূর্ব্বে তার মাথায় আসেনি কেন?

বারো

ডিনার খাওয়াটা সেদিন আর ঘড়ি ধরে হ'য়ে উঠল না। উন্নত মার্গের বাঙ্গালীর বাড়ীতে এ ধরণের অঘটন অবশ্য কল্পনারও অতীত। কিন্তু সামাজিক নিয়মতান্ত্রিকতার চাইতে বন্দনা নিজের ব্যক্তিগত খেয়ালের মূল্য দিত বেশী। তাই, ডাইনিং-হ'লের খিদ্‌মত্‌গার্‌টা ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময় এসে সেলাম ক'রে দাঁড়াতেই বন্দনা তাকে তাড়া দিল। বলল : আভি ভাগ্‌! পিছে সেলাম দেও—

—সেকি! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রমেশবাবুও চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লেন বললেন : অকারণ দেরি ক'রে লাভ কী?

বন্দনা বলল : অকারণ নয়! আমরা খাব, আর বিশু বাবু বুঝি হাঁ করে চেয়ে থাক্‌বেন ?

—সেকি! রমেশবাবু আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন : বিশু খাবে না কেন ?

—পেটে জায়গা থাকলে তো খাবে। দেখলে না, তোমার সামনেই তো এক কেট্‌লী চা খেয়ে ফেললেন। ওটা আগে বেরিয়ে যাক—

—ওঃ, রমেশবাবু নিরস্ত হলেন। কিন্তু বিশু ভয়ানক লজ্জিত হ'য়ে পড়ল। অথচ এ ক্ষেত্রে সে যে আর কী বলতে পারে তা-ও চট্‌

ক'রে ভেবে পেল না। চিরাচরিত প্রথানুসারে তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বন্দনা চায়ের ফরমাস্ করেছিল। চা-টা এসেছিল এ বাড়ীর ফ্যাসান্ অনুযায়ী ট্রে-র ওপর ক'রে সরঞ্জাম সমেত। বন্দনাও যথারীতি তাকে এক বাটী চা তৈরি করে দিয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসেছিল। কিন্তু বিশু তখন আত্মবিস্মৃত হ'য়েছিল। সমস্ত দিন অনাহারের পর, প্রচুর দুধ্-চিনির সঙ্গে কেট্‌লী-ভরা লিকার্ হাতের কাছে পেয়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে মিনিট্ পনেরর মধ্যেই কেট্‌লী নিঃশেষ ক'রে ফেলেছিল। ব্যাপারটা বন্দনার দৃষ্টি এড়ায়নি!

—কী মুস্কিল! অত্যন্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে বিশু কী একটা কথা বলবার চেষ্টা করল।

বন্দনা বাধা দিল। বলল: মুস্কিলের কথা পরে হ'বে। এখন, আপনার সেই লেক্‌চার্‌টা একবার শোনান্ তো!

—লেক্‌চার্ আবার কী?

—সেই যে, যার জন্যে আপনার মেয়াদ্ বেড়ে গিয়েছিল। কোর্টে দাঁড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেট্‌কে গালাগালি দিয়েছিলেন—

—যাঃ! বিশু লজ্জিতভাবে বলল: আপনার সব বাড়াবাড়ি—

—ওমা. বাড়াবাড়ি আবার কিসের? আচ্ছা দাদা, তুমিই বলতো, খবরের কাগজওয়ালারা সেদিন হৈ হৈ ক'রে ওঠেনি?

শুভেন্দু এতক্ষণ অন্যমনস্ক হ'য়ে কী যেন ভাবছিল। বন্দনার কথায় চট্ ক'রে একবার ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল: তা সত্যি! বলুন না বিশুবাবু, সেদিন্‌কার ঘটনাটা!

—কী মুস্কিল! সে সব কথা কী আজ মনে আছে?

বন্দনা বলল: তবু—

—ম্যাজিষ্ট্রেট্ বিচার করছিলেন, আমি রাজদ্রোহী কি না! আমি তখন কোর্টকে ডেকে বললাম,—রাজদ্রোহী আমি নিশ্চয়ই নই! আমাদের রাজা থাকেন বিদেশে। তাঁর সম্বন্ধে কোন খবরই আমরা রাখি না। সুতরাং যাঁকে চিনিনা জানিনা, তাঁর বিরুদ্ধে কোন রকম বিদ্রোহের প্রশ্নই উঠ্‌তে পারে না! আমাদের বিদ্রোহ,—তাঁর বেতনভুক্ আম্‌লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। আমাদের বিদেশী রাজা তাঁর ভারত-সাম্রাজ্যের শান্তি-রক্ষার জন্যে যে সব কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেছেন, সত্যিকার রাজদ্রোহী হ'চ্চে তারা! এই সব শয়তানের দল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এ দেশের জনসাধারণকে হত্যা করছে তিলে তিলে। (এই হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়েছে বহু বছর পূর্ব্বে,—আজও চল্‌ছে সমানে! এদের অত্যাচার অবিচার, শাস্তির নামে শাস্তি, শাসনের বদলে শোষণ, দেশের সর্ব্বত্র আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে! কিন্তু মানুষের-দেওয়া এই অভিশাপ মানুষ আর কতদিন সহ্য করবে! তাই এই চরম মুহূর্ত্তে ক্ষেপে উঠেছি আমরা! কিন্তু রাজদ্রোহী আমরা নই! সত্যিকার রাজদ্রোহী তারা,—যারা বাইরে রাজানুগত্যের মুখোস পরে কলঙ্কিত করছে ধর্ম্মাধিকরণ,—সর্ব্বনাশ করছে সাম্রাজ্যের,—ক্রমাগত ঘা মেরে মেরে ক্ষেপিয়ে তুলেছে দেশের জনসাধারণকে!—এই ধরণের গোটাকতক কথা বলেছিলাম বোধ হয়!)

—বাঃ,—বন্দনা ফোঁস্ ক'রে উঠল। বলল: ও তো summary হ'লো! ভাল করে বলুন! না, সত্যি, লক্ষ্মীটি—

—কী মুস্কিল! এই কি ভাগ ক'রে বলবার সময়? দেখছেন না, আপনার দাদা কী রকম ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চাইছেন।

—Exactly! এবার রমেশবাবু বললেন: সত্যি, শুভেন্দুকে আমাদের তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া উচিত। ওর কাজ রয়েছে—

অগত্যা সকলের সঙ্গে বন্দনাকে গিয়ে খানা-টেবিলে বসতে হলো।

খেতে বসে, বিশু কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে একটু বিস্মিত হ'লো। গল্প-গুজবে বন্দনা যেমন মুখর হ'য়ে উঠেছিল, শুভেন্দু ও রমেশবাবু ঠিক যেন তেমনিই নির্ব্বাক হ'য়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য, তার আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য রমেশবাবুর নীরবতার একটা গুহ্য কারণ থাকা স্বাভাবিক;—অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে তাঁকে। কিন্তু শুভেন্দু তো একজন পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ গপ্পে লোক! তার আজ হঠাৎ হ'লো কী?

শুভেন্দু যেন আজ একটু বেশী গম্ভীর—একটু বেশী অন্যমনস্ক!—কেন?

আহারাদির পর শুভেন্দু একটা সিগারেট ধরিয়ে রমেশবাবুকে বলল: আমি তাহলে আজ চলি। তোমাকেও তো তৈরী হ'তে হ'বে—

—হুঁ্যা! রমেশবাবুও একটা সিগারেট ধরালেন।

শুভেন্দু তখন বিশুকে শুভরাত্রি জ্ঞাপন ক'রে বিদায় নিল। বন্দনাও তার সঙ্গে গেল। যাবার সময় বিশুকে বলে গেল: বসুন, এক্ষুনি আসছি আমি!

ঘর ফাঁকা হতেই বিশু ধীরে ধীরে রমেশবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু কোন কথা কইতে পারল না। একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল যে সে কোনটা রেখে কোনটা আগে বলবে ভেবে পেল না!

বিশুর মুখের দিকে চেয়ে রমেশবাবুও সম্ভবতঃ তার মনের ভাব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু নিজে থেকে কোন কথা কইলেন না! মুখের হাসিটাকে যতদূর সম্ভব বজায় রেখে তিনি ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে লাগলেন!

কিছুক্ষণ পরে বিশু বলল, বেশ শান্ত ভাবেই বলল: ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মানুষ,—বিশেষতঃ বাঙ্গালী যে কত নীচে নামতে পারে, তা আমি জানি! কিন্তু বুঝতে পারছিনা, সব জেনে-শুনেও বন্দনার মতো মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে পারলে কী ক'রে?

রমেশবাবুর মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি বিচলিত হলেন না। আরক্ত চক্ষে বিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ সংযতকণ্ঠেই বললেন তিনি: বন্দনার সম্বন্ধে কোন খারাপ remark করোনা। সে আমার স্ত্রী—

—হুম্, কিন্তু রমা-বৌদি?

প্রশ্ন শুনেই রমেশবাবু এবার অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। তারপর অস্ফুটস্বরে কী একটা বলে দ্রুতপদে ড্রইং-রুমের দিকে প্রস্থান করলেন।

মানুষের মনের মধ্যে ঘৃণার পরের অবস্থাটা সম্ভবতঃ ক্রোধ! কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ-মস্তিষ্ক যখন সেই তীব্র অনুভূতির জ্বালা সহ্য করতে পারে না, তখন প্রয়োজন হয় মনকে চোখ ঠারবার!

প্রকৃতির প্রেরণায় মানুষ তখন নিজেই সেই তীব্রতার ওপর একটা প্রলেপ দেবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। নিজেদের রুচি-প্রবৃত্তি অনুযায়ী মনের মধ্যে একটা যুক্তি খাড়া করে তারা তখন কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করবার চেষ্টা করে। তাই, বিশুরও হঠাৎ মনে হ'লো, রজতের কাহিনীর সব অংশটুকু বোধ হয় সত্য নয়। স্ত্রী বর্ত্তমান থাকলে রমেশদা কখনই বন্দনার মতো মেয়েকে আবার বিবাহ করতে পারতো না। রমা-বৌদি নিশ্চয়ই মারা গেছেন!

একতলার বাবুর্চ্চিখানায় খানসামার দল তখন নিজেদের আহারাদির উদ্যোগ করছিল। বংশী তাদের তদারক করছিল ঘুরে ঘুরে। বিশু এগিয়ে গিয়ে দরজার বাইরে থেকে তাকে ডাকল।

বংশী বাইরে এলে জিজ্ঞাসা করল: রমা-বৌদি মারা গেছে?

বংশী তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিতে পারল না। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

বিশুর অনুমান বিশ্বাসে পরিণত হবার উপক্রম করল। সে আবার জিজ্ঞাসা করল।

বংশী তখন আস্তে আস্তে বলল: না, কিন্তু মরে গেলেই ছিল ভাল!

বিশু দমে গেল, বলল: ব্যাপার কী বংশী? এ সব কী কাণ্ড?

—বলছি! কিন্তু তুমি তার নাম এ বাড়ীতে মুখে এনোনা দাদা! তোমায় দাদা বলতে বলে দিয়েছে।

—কেন? রমা-বৌদির কথা এরা কেউ জানে না নাকি?

বংশী মাথা নেড়ে বলল: আর সকলে জানলেও,—নতুন-বৌদি বোধহয় এখনও জানে না!

—হুম্!

বিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে বংশী আবার বলল: তবে, মন্দের ভাল হিসেবে এটুকু বলতে হ'বে যে, সফরে যাবার নাম ক'রে তোমার দাদা এখনও মাঝে মাঝে দেশে যান। ছেলেমেয়েদের দেখে-শুনে আসেন, খরচ-পত্রও দিয়ে আসেন!

—এ বিয়ের কথা রমা-বৌদি জানে?

—জানে বৈকি!

—বলিস কী রে? বাধা দিলে না?

—কী করবে বল? সে তো আর লেকা-পড়া জানা সহুরে মেয়ে নয়!

এই সময় ফট্ ফট্ করে স্যাণ্ডেলের শব্দ করে বন্দনা সেখানে এসে উপস্থিত হলো। বলল: আপনি এখানে,—আর আমি সারা বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি! চলুন চলুন, ওপরে চলুন—

বন্দনাকে দেখেই বিশু নিজেকে সামলে নিয়েছিল। সঙ্গে যেতে যেতে বলল: রমেশদা' কোথায়?

ভ্রূভঙ্গী ক'রে বন্দনা বলল: তিনি এখন অফিস্-ঘরে বোতল নিয়ে বসেছেন!

বিশু দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল: আপনি চলুন, আমি ওকে একটা কথা বলেই আসছি।

—আবার কথা! আচ্ছা, দেরি করবেন না যেন! বলে বন্দনা ওপরে চলে গেল। বিশু তখন গম্ভীর মুখে এগিয়ে গেল অফিস-ঘরের দিকে।

অফিস্-ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা সেক্রেটারিয়েট্ টেবিলের সামনে

বসে রমেশবাবু কী সব কাগজ-পত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন, বিশুকে দেখেই সেগুলো তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেললেন। তারপর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহাস্যমুখে চেয়ারের ওপর হেলে পড়লেন! অনেকটা-যেন, বিশুর অনুযোগ শোনবার জন্যেই তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন!

বিশু ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বীয়ারের বোতলটার দিকে একটা কটাক্ষ করে জলদ-গম্ভীরস্বরে বল্‌ল : তোমার উন্নতি দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছি! এত আশ্চর্য্য বোধহয় জীবনে আর কখনও হইনি!

রমেশবাবু কোন কথা কইলেন না, শুধু একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌তে বস্‌তে বিশু আবার বল্‌ল : চাক্‌রীর জন্যে মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত বিকিয়ে দিলে!

রমেশবাবু এবার কথা কইলেন। বিশুর প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে তিনি অন্য কথা পাড়লেন। বললেন : অনেকদিন তো হয়ে গেল, এবার দেশ থেকে একবার ঘুরে আয়। Immediately তোর একবার সেখানে যাওয়া দরকার!

—কেন?

—কয়েক বিঘে ধেনো জমি এখনও তোর রয়েছে। সেগুলোর একটা বিলি-বন্দোবস্ত করে আয়। না হলে সেগুলোও যে তোর কাকাদের গর্ভে ঢুকে যাবে!

—যাক্‌গে—

—যাক্‌গে নয়, শোন, বিশুর একটা হাত মুঠে করে ধরে রমেশবাবু বললেন : ও সব পাগলামি ছাড় বিশু! কতদিন আর ছন্নছাড়ার মতো

স্বদেশী করে বেড়াবি বল ? ভাল চাক্‌রী জোগাড় করেছিস্, এবার দেশে গিয়ে বিয়ে-থা' করে সংসারী হ'—

—তুমি থাম ! সজোরে হাতে ছাড়িয়ে নিয়ে বিশু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর সশ্লেষে বলল : পরকে উপদেশ দিতে লজ্জা করেনা তোমার ? তোমার যতটুকু পরিচয় পেয়েছি তাতে তোমার সঙ্গে মুখের আলাপ রাখাও পাপ !—বলেই সে সক্রোধে প্রস্থানোদ্যত হলো।

রমেশবাবু বাধা দিলেন। তাকে আবার চেয়ায়ের উপর বসিয়ে দিয়ে সহাস্যমুখে বললেন : নাঃ, বয়সে বাড়লে কী হবে, তুই ঠিক আগের মতোই পাগলা আছিস্। শোন···

এই সময় ঢং করে ঘড়িতে একটার ঘা পড়ল। রমেশবাবু ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে দেখেই টেবিলের ওপরে রক্ষিত কলিংবেলটা টিপলেন। তারপর আবার বললেন : শোন পাগলামী করিস্‌নি, ওসব করে দেশ স্বাধীন হয়না কখনও—

বংশী এসে ঘরে ঢুকল এবং কোন কথা না বলে গম্ভীরমুখে রমেশবাবুকে পোষাক পরাতে আরম্ভ করল।

রাত্রি একটার সময় রমেশবাবুকে পোষাক পরতে দেখে বিশুও একটু আশ্চর্য্য হলো। জিজ্ঞাসা করল : এত রাত্তিরে তুমি আবার বেরুচ্ছ কোথায় ?

—অফিসে।

—এত রাত্তিরে অফিসে ?

—ওই তো আমাদের চাকরীর মজা রে ! শুধু অফিস ? সেখান

থেকে আবার ঠিক সাড়ে তিনটের সময় ফোর্স নিয়ে ছুটতে হবে বালীগঞ্জের দিকে, বলেই রমেশবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন।

বালীগঞ্জের দিকে? বিশুর বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন কেমন ক'রে উঠল। সে আর কিছু না বলে বিমূঢ়ভাবে রমেশবাবুর দিকে চেয়ে রইল।

কোটের বোতাম এঁটে, ষ্ট্যাণ্ডের ওপর থেকে টুপীটি নিয়ে মাথায় দিয়ে রমেশবাবু বিশুকে বললেন: তুই কোথাও যাস্‌নি যেন। আমি কাল সকাল দশটার মধ্যেই ফিরব, বুঝলি!—তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বিশু সেইখানে, সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। নানা রকমের দুশ্চিন্তায় তার মস্তিষ্ক আলোড়িত হতে লাগল। তারপর হঠাৎ একটা অত্যন্ত সহজ কথা মনে পড়ে যেতেই সে যেন একবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বন্দনা ও শুভেন্দুর সঙ্গে তার আলাপের উৎপত্তিটা কোথায় সে সম্বন্ধে রমেশদা' তাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করল না কেন।

তেরো

দুশ্চিন্তার অন্ত রইল না বিশুর। রমেশদার মৎলব কী? রাত্রি সাড়ে তিনটের সময় পুলিশ ফোর্স নিয়ে তাঁকে বালীগঞ্জের দিকে যেতে হবে কেন? সার্চ করতে?

বন্দনা এসে ঘরে ঢুকল। পিছন দিকে হাত দুটি উঁচু করে, অবিন্যস্ত কবরীটি সুবিন্যস্ত করতে করতে সহাস্যমুখে বলল সে: বেশ লোক তো আপনি? আমাকে একলা বসিয়ে রেখে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কড়িকাঠ গুণছেন! কী ভাবছেন এত?

বিশু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ল। বলল: না ভাবছিলাম আপনি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাই......

—বেশ তো! বিশুর দিকে একটা কটাক্ষ হেনে মুচকে হেসে বন্দনা বলল: দরজা তো খোলাই ছিল,—আপনি গিয়ে না হয় আমার ঘুম ভাঙ্গাতেন।

—যাঃ, কী যে বলেন আপনি! দারুণ লজ্জায় বিশুর চোখ-মুখ লাল হ'য়ে উঠল।

তার অবস্থা দেখে বন্দনাও খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। তারপর

তার একটা হাত ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বলল : ভারী লাজুক তো আপনি ! চলুন ওপরে—

—দেখুন, শোবার ঘরে আর নাই বা গেলেম। অত্যন্ত অসহায়ের মত বিশু বন্দনার দিকে তাকাল। বলল : এইখানেই বসা যাক না—

—ধেৎ, খাওয়া-দাওয়ার পরে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে নাকি ! চলুন চলুন—

অগত্যা অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বিশু বন্দনার সঙ্গে তার শোবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো। বন্দনা তাড়াতাড়ি একটা চতুষ্কোন কৌচের ওপর গোটাকয়েক কুশন বালিশ সাজিয়ে দিয়ে বলল : আপনি এখানে বসুন। ইচ্ছে করলে অবশ্য খাটের ওপর গিয়ে শুতেও পারেন।

বিশুর মুখ আবার লাল হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি কৌচটার ওপরই বসে পড়ল।

তার অবস্থা দেখে বন্দনা আবার একটু মুচকে হাসল। তারপর খাটের ওপর আড়্ হয়ে শুয়ে পড়ে বলল : এইবার গল্প করুন। জেলের মধ্যে সেই ওয়ার্ডেনটাকে কী করে ঠেঙ্গিয়ে ছিলেন, সেই গল্পটা বলুন।

বিশু কিন্তু কোন কথাই কইতে পারল না। চিন্তিত মুখে মুখ নীচু ক'রে বসে রইল।

—কই, কী হলো ? বলুন,—বুকের তলায় একটা বালিস গুঁজে দিয়ে বন্দনা উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ল।

তবুও, বিশু তার দিকে চাইতে পারল না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল সে।

—আপনি কি ভাবছেন, আমি কিন্তু তা জানি! কিছুক্ষণ পরে বন্দনা বলল।

বিশু চম্‌কে উঠল। সন্দিগ্ধ মন তার উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠল। বলল: কী ভাবছি?

—আপনি ভাবছেন,—একটু ইতস্তত: করে বন্দনা বলল: আপনি ভাবছেন আমার কথা,—মানে, আমার ব্যবহারের কথা!

বিশু এবার হেসে ফেলল। আশ্বস্ত হয়ে বলল: কী ক'রে জানলেন বলুন তো? আপনি অন্তর্যামী নাকি?

—না, সত্যি, ইয়ার্কী নয়! একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বন্দনা বলল: একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে, না? ভাবছেন, মেয়েটা কী বেহায়া, না?

—কী আশ্চর্য্য! বিশু ভদ্রতা করে বলল: ও সব ভাবতে যাব কেন?

—ভাবছেন না আপনি? সত্যি বলছেন?

—কী মুস্কিল! অকারণ মিথ্যে কথা বলেই বা আমার লাভ কী বলুন?

—তাহলে বলতে হবে, আপনি একজন অসাধারণ মানুষ! কিন্তু সাধারণ স্তরের সামাজিক জীব হ'লে, এ ব্যাপারটাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতেন!

বন্দনার কথার ভঙ্গি লক্ষ্য ক'রে বিশু একটু বিস্মিত হলো। বলল: আপনার বক্তব্যটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন।

—এর মধ্যে অপরিষ্কার তো কিছু নেই! রাত দুপুরের সময় শোবার

ঘরে ঢুকে আপনাকে নিয়ে আমি যে রকম হৈচৈ করছি, সাধারণ লোকে তার কি অর্থ করবে বুঝতে পারছেন না?

বিশু এবার ভ্রূকুঞ্চিত করল! বন্দনার সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছে তার মাত্র কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে রজতের সাবধান বাণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে মর্ম্মে মর্ম্মে! মেয়েটা সত্যই অত্যন্ত সুলভ। কিন্তু, উপস্থিত অসাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির দোহাই পেড়ে আলোচনাটাকে সে যে ঠিক কোন পথে চালিয়ে দিতে চায় তা সে বুঝতে পারল না।

—কপাল কুঁচকে ভাবছেন কী? বলুন না তারা কী বলবে?

প্রশ্নটা যেমন স্পষ্ট তেমনি অস্বস্তিকর! অথচ বিরক্তিকর নয়। তবুও, সব সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে সোজা প্রশ্নের সরল উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হ'লো সে। বলল: যা স্বাভাবিক, তাই বলবে!

বন্দনা মুচকে হেসে বলল: কিন্তু, কথাটা কী সেটা বলুন?

উত্তর দেবে কী, বিশু যেন একেবারে মরমে মরে গেল।

—By Jove! এত লজ্জা আপনার? কী রকম ব্যাটাছেলে আপনি?

বিশু ভ্রুকুটি করল। নিজের অজ্ঞাতসারে বন্দনা একেবারে তার সব চাইতে দুর্ব্বল জায়গাটি নিয়ে রসিকতা করে ফেলেছিল। বিরক্তি চেপে সে অস্পষ্টস্বরে বলল: আপনিই বলুন না—

—বলব? ভ্রুভঙ্গি করে বন্দনা বলল: তারা প্রথমেই দেখবে আমাদের বয়স। আমারও বয়স বেশী নয়, আপনিও বুড়ো নন্। তারপর তারা খুঁজবে কারণ। আমি যে আমার সব কিছু স্বাতন্ত্র্য

বিসর্জ্জন দিয়ে আপনার সঙ্গে এই রকম হৈ-হুল্লোড় করছি, তার এক মাত্র কারণ···তারা বলবে···আমি নিশ্চয়ই আপনাকে ভালবেসেছি! বলেই আবার সে বালিশের ওপর ঢলে পড়ে হেসে উঠল।

বিশু শুধু আরক্ত চোখে চেয়ে রইল,—কোন কথা কইল না।

কী অদ্ভুত! হাসি সাম্‌লে বন্দনা আবার বলল: একটি মেয়ে যদি একটি ছেলেকে দেখে সত্যিই ভালবেসে ফেলে, অমনি সেটা হবে অপরাধ। তার ওপর মেয়েটি যদি বিবাহিতা হয়...ওরে বাবা···তাহলে রক্ষে নেই, সেটা হ'বে অবৈধ! আচ্ছা বলুন তো, ভালবাসার ওপর মানুষের হাত আছে? ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে প্রেম! সেই প্রেমকে অপরাধ বা অবৈধ বলে প্রচার করবার স্পর্দ্ধা বোধ হয় আমাদের দেশের লোকদের ছাড়া আর কারুর নেই, না?

বিশু কোন উত্তর দিল না; বন্দনার প্যাঁচ্‌টা তার কাছে এতই সস্তা মনে হচ্ছিল যে সমস্ত শরীরটা যেন তার ঘিন্‌ ঘিন্‌ ক'রে উঠছিল।

—সত্যি, বলুন তো? বন্দনা হঠাৎ খাটের ওপর থেকে নেমে পড়ল। তারপর নিজের বিশৃঙ্খল জামা-কাপড়ের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না ক'রে তাড়াতাড়ি গিয়ে বসে পড়ল—বিশু যে কৌচ্‌টার ওপর বসেছিল তারই একটা হ্যাণ্ডেলের ওপর। বলল: সভ্য জগতের কোন জাতি, কোন ধর্ম্ম, ভালবাসা সম্বন্ধে এ রকম কুৎসিত কথা কখনও ভাবতে পেরেছে! বলুন না? আমার তো মনে হয় These evils can be manufactured only on this Indian soil—নয়? কথা কইছেন না কেন? বিশুর মাথাটা ধরে একটু নাড়া দিয়ে সে আবার বলল: বাক্য হ'রে গেল নাকি?

বিশু হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে টাল সামলাতে না পেরে বন্দনাও বসে পড়ল সেই কৌচ্‌টার মধ্যে।

কিছুক্ষণ পায়চারী করে বেড়াল বিশু। নিজের কর্ত্তব্য সে ইতিমধ্যেই স্থির করে ফেলেছিল। বন্দনাকে চটিয়ে এবাড়ী ঢোকার পথ সে কিছুতেই বন্ধ করবে না। মনের বিতৃষ্ণাকে সে প্রাণপণে দমন ক'রে রাখবে। প্রয়োজন হ'লে বন্দনার লালসাকে প্রশ্রয়ও দেবে সে। নিজের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সে ইন্ধন জোগাবে বন্দনার কামনার আগুনে! কিন্তু নিজে পুড়ে মরলে তার চল্‌বে না! তার গত রাত্রির হৌত্যকে পুষ্প যে ভাবেই গ্রহণ করুক না কেন, সঙ্ঘের বিপ্লবীদের কাছে সে তার সততার প্রমাণ দেবেই। নিজের বিরাট কর্ম্মশক্তির দ্বারাই সে প্রতিষ্ঠা করবে তার বিপ্লববাদের আদর্শ! সুতরাং বন্দনাকে ক্ষুণ্ণ করলে চলবে না।

তার জীবনে বন্দনার আবির্ভাব আজ ভবিষ্যৎ সাফল্যেরই সূচনা করছে। স্ত্রীর দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ ক'রে তার স্বামীর গোপনীয় নথি-পত্রের সন্ধান রাখা সম্ভবতঃ অসম্ভব হ'বে না। সাবধানে কাজ করতে পারলে তার পক্ষে হয়তো অসাধ্য সাধন করাও সম্ভবপর হ'তে পারে। শুধু প্রাদেশিক গুপ্তত‌থ্য বিভাগ নয়,—সর্ব্ব ভারতীয় মিলিটারী—গতিবিধির গোপন তথ্য সংগ্রহ করার মতো অসাধ্য সাধনও হয়তো সে একদিন ক'রে ফেলতে পারে। ফলে—

মুক্তি সঙ্ঘের শত শত বিপ্লবীর জীবনে সে পরিগ্রহ করবে দেবতার আসন। তারা তখন বুঝতে পারবে বিশুর দূরদর্শিতা—তার অনন্য-সাধারণ প্রতিভা। তুলনা করবে সত্যকার কর্ম্মশক্তির সঙ্গে বড় বড়

বক্তৃতাবাজির অসারতা। উপলব্ধি করবে,—সঙ্ঘের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হলে প্রয়োজন আত্মম্ভরী ডিক্টেটারের পরিবর্ত্তে একজন সত্যকার কর্ম্মী নেতার। তারপর চাকা যেদিন সত্যিই ঘুরে যাবে—

সেদিন পুষ্প এগিয়ে আসবে জয়মাল্য নিয়ে! বিগত দিনের কথা স্মরণ করে হয়তো সে অবনত মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু তার সেই নীচু মাথা উঁচু করবে বিশু! বলবে : জয়মাল্য চাই না—বরমাল্য দাও—

হটাৎ ক্যাঁচ্ ক'রে একটা আওয়াজ হলো। বন্দনা সবেগে কৌচ্ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর খাটের দিকে এগিয়ে গেল দ্রুতপদে।

শব্দ শুনেই বিশু দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বন্দনার আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের অবস্থাটাও অনুমান করে নিতে বিলম্ব হ'লো না তার। সে তখন তাড়াতাড়ি আবার বসে পড়ে নিজের ভুল সংশোধন করবার জন্য-তৎপর হ'য়ে উঠল!

—আবার বসলেন যে বড়!—তীক্ষ্ণকণ্ঠে বন্দনা বলল : বেশ তো পায়চারী করছিলেন—

—আপনার কথাই ভাবছিলাম।—একটু হেসে বিশু বলল : ভেবে দেখলাম, আপনার ধারণা ঠিক নয়—

—ঠিক্ নয়!—বিশুর মেজাজ দেখে বন্দনা আবার উৎসাহিত হ'য়ে উঠল। বলল : আপনি জানেন India-র এই রাস্কেলগুলো কত mean,—কী এদের আসল Tradition?

—কী ক'রে জানব বলুন? বিশু বেশ বিনীত ভাবেই বলল : স্কুল কলেজে যা বই-পত্তর পড়েছি, তাতে তো আমাদের দেশের

ঐতিহ্য সম্বন্ধে কিছু লেখা নেই—সব ওদের দেশের গুণ কীর্ত্তনেই ভর্ত্তি…

—বইয়ের কথা হ'চ্ছে না!—বাধা দিয়ে বন্দনা বলল: আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থার কথা বলছি! আমরা বুদ্ধিজীবি মানুষ না জড়্ পুতুল? রক্ত মাংসের শরীর আমাদের,—আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দাম নেই? আপনাকে যদি আমার ভাল লাগে, সেটা হ'বে অপরাধ, অবৈধ! আর সেই ভালবাসাটাকে গোপন করে একটা Particular স্বামীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করলেই আমি হ'বো সতী-সাধ্বী, আদর্শ নারী?

—আপনি দেখছি বড্ড চট্‌ছেন!—খুব সাবধানে অগ্রসর হ'তে লাগল বিশু। আত্মরক্ষা ও কার্য্যসিদ্ধির জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই সে প্রশয় দেবে বন্দনাকে,—তার বেশী নয়! বেশ মোলায়েম ভাবেই সে হেসে বলল: আমাদের সমাজের কথা যতটুকু আমি জানি তাতে মনে হয়, আমার সঙ্গে আপনার এই মেলামেশাটাকে কেউই অপরাধ বা অবৈধ বলে মনে করবে না—

—মেলামেশার কথা হ'চ্ছে না,—আড়্ চোখে বিশুর দিকে চেয়ে বন্দনা বলল: আমি বলছি আপনাকে ভালবাসার কথা—

—আমিও তো সেই কথাই বলছি! এটা যদি অন্য দেশ হ'তো তাহলে সম্ভবতঃ আমাদের বদনাম্ কিন্‌তে হতো। কিন্তু দেশটা যখন বাঙলা দেশ, তখন ভয় কী আমাদের?

—মানে?

—মানে, আমাদের দেশের ঘরে ঘরে অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে

স্বভাবতঃই এমন একটা মধুর ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠবার সুবিধে থাকে,—যার বাইয়ের রূপ দেখে শুধু বিদেশীদের পক্ষেই কদর্থ করা সম্ভবপর হ'তে পারে। ইংরেজের ভাড়াটে লেখিকা মিস্ মেয়ো 'মাদার ইণ্ডিয়া' লেখবার মাল্-মশলা জোগাড় করেছিল আমাদের সমাজের এই রকম গোটা কতক বাইরের চেহারা দেখেই। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা আজ যতই বিদেশী অনুকরণ করুক না কেন, তারা তো আর সত্যিই সাহেব হয়ে যায়নি যে—আমাদের ভয় পেতে হ'বে।

বন্দনা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। বলল : কিছুই বুঝ্লাম না—

—বুঝলেন না? আমাদের দেশের লোকগুলো আজ যতই আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়ুক না কেন,—সাধারণভাবে আজও তো তারা মা-বোনের সম্মানের কথা ভুল্তে পারেনি। নিজের মাকে অপর একজনের স্ত্রীরূপে কল্পনা করতে বা নিজের সহোদরার সঙ্গে মামাতো-পিশতুতো বোনেদের আলাদা করে দেখতে আজও তো তারা অভ্যস্থ হয়নি। সুতরাং আমাদের ঘনিষ্টতা দেখেও তারা লোকেরা কোন কিছু ভাবতে পারবে না।

—কেন?

—এ যে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার। আমাদের সমাজে দেওর-ভাজের সম্পর্কটা যে বড় মধুর—বড় পবিত্র। এর বাইরের রূপ দেখে বিদেশীরা ভুল করলেও,—এদেশের লোকেরা কখনও কুৎসিত সমালোচনা করবে না।

বন্দনা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

বিশু আবার বলল : বৌদি বল্তে আমরা বুঝি, একাধারে

মা-বোন-বন্ধুরূপে একজন শুভাকাঙ্খিনী পূজনীয়াকে !—এতে আমাদের ভয় পাবারও কিছু নেই,—লজ্জা পাবার তো নয়ই !

বন্দনা আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বিশুর দিকে। তারপরই হঠাৎ একেবারে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

—কি হলো ? বিশুও ভড়কে গেল।

—ওঃ আপনি কী দুষ্টু ! অনেক কষ্টে হাসি সামলাতে সামলাতে বন্দনা বলল : কী বুদ্ধি আপনার ! এতও ভেবে রেখেছেন ? কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবেনা...বৌদি ঠাকুরপো সম্বন্ধ......Oh my... সে আবার বালিশের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল !

বিশুও তড়িৎপৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়াল !

চৌদ্দ

হায় ভগবান্ !—বিশুর কপাল ঘেমে উঠল,—বন্দনার অসাধ্য কিছুই নেই। তার এতখানি চেষ্টার পরিণাম হ'লো,—এই বিপরীত অর্থ ! এর পর আর সে কেমন ক'রে আত্মরক্ষা করবে এই রাক্ষসীর গ্রাস থেকে।

বিশুকে উঠে দাঁড়াতে দেখেই বন্দনা বলল : ওকি, উঠ্‌লেন যে ?

বিশু কী উত্তর দেবে ভেবে পেলনা।

বন্দনা আবার বলল : কী হ'লো ? আবার উঠ্‌লেন কেন ?

—ইয়ে,—বিশু বিমূঢ়ভাবে একবার ঘরের চারদিকে তাকাল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল কক্ষ-সংলগ্ন বাথরুমের খোলা দরজাটা। তখন তাড়াতাড়ি বলল : একবার বাথরুমে যাব !

শুনে বন্দনা কী বুঝল কে জানে ! সলজ্জ ভাবে বালিশে মুখ লুকিয়ে অস্ফুটস্বরে সে বলল : ওই তো রয়েছে,—যান্ না—

বিশু বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। ঘরটার মধ্যে রাস্তার দিকে শার্সি-বসান ছোট একটা জানালা ছিল। বিশু প্রথমেই সেটা খুলে দিল। বাইরে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছিল বিরাট একটা দেবদারু গাছ ! তার পাতা কাঁপিয়ে ঝির্ ঝির্ ক'রে বাতাস আসছিল। বাইরের

বাতাস গায়ে লাগতে বিশুর উত্তপ্ত মাথা কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে এল সেইখানে দাঁড়িয়েই ভাবতে লাগল সে।

সঠিকভাবে জানতে না পারলেও, রমেশবাবু যে আজ সদল-বলে বালীগঞ্জের দিকে কোন একটা বাড়ীতে সার্চ করতে যাবেন, সে সম্বন্ধে তার সন্দেহ ছিল না। হয়তো সে বাড়ীটা পুষ্পদের না-ও হ'তে পারে। কিন্তু পূর্ব্বাহ্লে সাবধান হতে দোষ কী! কিন্তু কী ক'রে সে খবর দেবে পুষ্পকে! বন্দনা তাকে নিয়ে যে রকম মাতামাতি আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, তাতে তার পক্ষে আজ রাত্রিতে এ বাড়ীর বাইরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এক উপায় আছে, টেলিফোনে সংবাদ দেওয়া। কিন্তু তা-ই বা সম্ভব হ'বে কী ক'রে! হঠাৎ পুষ্পকে টেলিফোন করতে দেখলে বন্দনার মন অবশ্যই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠ্‌বে এবং কথাটা রমেশদার কানে উঠ্‌তেও দেরি হ'বেনা। ওদিকে এত রাত্রিতে পুষ্পকে ডাক্‌লে তার বাড়ীর লোকেরাই বা কী ভাব্‌বে! অথচ যেমন করেই হোক আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পুষ্পকে তার একটা খবর দিতেই হ'বে!—ভাবতে ভাবতে বিশুর মাথা আবার গরম হয়ে উঠল। কী করা যায়!

গত রাত্রের ঘটনাগুলো আবার মনে পড়ে গেল তার; পুষ্পর চেহারাটাও ভেসে উঠ্‌ল চোখের সামনে। কিন্তু—

একটা অস্বস্তিকর সম্ভাবনার কথা মনে হতেই বিশুর মন আবার নিরাশায় ভারি হ'য়ে উঠল। গত রাত্রের মতো পুষ্প যদি আবার কোন মন্তব্য ক'রে;—তার সঙ্গে বন্দনার ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক নিয়ে? তাহলে কী উত্তর দেবে সে?

পরক্ষণেই মন তার উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। মিনতির সম্বন্ধে বক্রোক্তি ক'রে পুষ্প হয়তো তাকে আঘাত করবারই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অনুরূপ উক্তি সে বন্দনার সম্পর্কে নিশ্চয়ই সহ্য করবে না। পুষ্প যে তার ব্যক্তিত্ব নিয়ে এই ভাবে যদৃচ্ছা মন্তব্য করবে,—এত সস্তা সে নিশ্চয়ই নয়। সে পুষ্পর মুখের ওপর স্পষ্ট বলবে : পুরুষের পোষাক-পরা এক শ্রেণীর ক্লীবদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে ক'রে অভ্যাস খারাপ হ'য়ে গেছে তার। নাহলে সে বুঝতো—বন্দনার সঙ্গে বিশুকে জড়িয়ে কোন রকম কিছু কল্পনা করার সরল অর্থ,—বিশুকেই অপমান করা! পুষ্পর জানা উচিত,—বাঙ্গালা দেশের পুরুষ সমাজ নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়নি আজও! যাকে চাইবার আগেই পাওয়া যায় তাকে তুচ্ছ করবার মতো পুরুষ আজও অনেক আছে এ দেশে। একটা বিশেষ-ব্যাধিগ্রস্থ স্ত্রীলোককে নিয়ে আত্মবিস্মৃত হ'বে, ঠিক অতখানি সুলভ সে নয়। তার সাধনা দুর্লভের! তাকে পাবার জন্যে সে জন্ম-জন্মান্তর সাধনা করবে! কিন্তু—

হঠাৎ পিঠের ওপর একটা কোমল স্পর্শ অনুভব ক'রে বিশু চমকে উঠল। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বন্দনা। তারপর অদূরস্থ দরজাটির দিকে নজর পড়তেই নিজের ভুল বুঝতে পারল সে। বাথরুমে ঢোকবার সময় দরজাটা বন্ধ ক'রে দেবার কথা তার একেবারেই মনে পড়েনি!

বন্দনা ভ্রূভঙ্গি ক'রে বলল : কী হয়েছে বলুন তো আপনার?

—কিছু হয়নি তো। এমনি একটু হাওয়া খাচ্ছিলাম এখানে দাঁড়িয়ে। চলুন—

—বুঝেছি, মশাই বুঝেছি। অভিমানিনী বালিকার মতো মুখ ভারি করে বন্দনা আবার শোবার ঘরে এসে ঢুকল।

—সত্যি, বলছি, এমনি ওখানে একটু দাঁড়িয়েছিলাম। পিছনে আসতে আসতে বিশু বলল: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের রূপ দেখছিলাম।

—থাক্, যথেষ্ট হয়েছে।—বন্দনা সটান গিয়ে খাটের ওপর শুয়ে পড়ল।

—সত্যি বলছি, এমন কিছুই নয়। ভাবছিলাম, হোস্টেলে একটা খবর দেওয়া হ'লোনা,...

—ইস, তাদের তো আপনার জন্যে ভাবনার আর সীমা নেই। এতই যদি কর্ত্তব্য-জ্ঞান আপনার, একটা ফোন্ করে দিলেন না কেন?

—ইস্, দেখেছেন!—কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ দুটি বড় বড় ক'রে বিশু বলল: ও কথাটা আমার একেবারেই মনে হয়নি! দাঁড়ান,—এক্ষুনি আসছি!

অভাবনীয়রূপে বন্দনার তরফ থেকে ফোন্ করবার কথাটা উঠতেই বিশু তাড়াতাড়ি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। একতলায় অফিস্-ঘরে ঢুকে প্রথমেই সে দরজার ছিট্‌কিনি লাগিয়ে দিল। পরমুহূর্ত্তেই আবার দরজাটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিয়ে দুরু দুরু বক্ষে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দরজার দিকে চাইতে চাইতে কম্পিত হস্তে রিসিভারটা তুলে নিয়ে পুষ্পদের বাড়ীর নম্বর চাইল।

প্রায় মিনিট দু'য়েক পরে ওধার থেকে শ্লেষ্মা-জড়িত গম্ভীর গলার আওয়াজ এল: হ্যালো!

—হ্যালো, মিঃ ঘোষ কি শুয়ে পড়েছেন ?

—অনেকক্ষণ! আপনি কে ?

—আপনি কে ?

—আমি বিশ্বম্ভর মিত্তির,—মিঃ ঘোষের এষ্টেটের ম্যানেজার।

—ওঃ, দেখুন, মিঃ ঘোষের সঙ্গে একটা দরকারী কথা ছিল। কিন্তু···আচ্ছা, আপনি পুষ্পকে একবার খবর দিন তো।

—তিনিও ঘুমোচ্ছেন। কী কথা আমাকে বলতে পারেন, আমি কাল সকালে মিঃ ঘোষকে জানাবো।

বিশু এবার একটু ইতস্তত: করল। তারপর গলা ঝেড়ে বলল: হ্যালো, দেখুন, আমার বড় মেয়ে পুষ্পর সঙ্গে একটু কথা কইতে চায়। সে কাল ভোরেই এখান থেকে চলে যাচ্ছে কিনা! আপনি দয়া ক'রে তাকে একবার খবর দিন।

ওধার থেকে গুরু গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন হ'লো: কিন্তু, আপনি কে ?

—আমি ? আমি মিষ্টার ঘোষাল কথা কইছি।

—আচ্ছা, একটু ধরুন।

বিশ্বম্ভরবাবু সম্ভবত পুষ্পকে খবর দিতে গেলেন। এদিকে বিশু সভয় দৃষ্টিতে দরজার দিকে চেয়ে ঘন ঘন কোঁচার খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। ওধার থেকে আওয়াজ আসতে যত দেরী হ'তে লাগল হৃদ্‌পিণ্ডের গতিও তার তত বেড়ে যেতে লাগল। শেষে, অনেক্ষণ পরে, ওধার থেকে স্ত্রী কণ্ঠে আওয়াজ এল: হ্যালো—

বিশু চাপাগলায় তাড়াতাড়ি বলল: কে, পুষ্প দেবী ?

—হুঁ আপনি কে ?

—আমি বিশু—

—কী দরকার? পুষ্পর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ না হলেও, তার বিরক্তিটাও চাপা রইল না।

বিশু জিজ্ঞাসা করল: আপনার ম্যানেজার কি এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন?

—হ্যাঁ, কেন?

—তাহলে, আপনি আর কোন কথা কইবেন না। শুনুন, আজ রাত্রিতেই বোধহয় পুলিশ হানা দেবে আপনাদের বাড়ীতে। সামলাতে পারবেন তো?

—হুঁ।

—আচ্ছা, ছেড়ে দি'?

—দিন!

বিশুর টেলিফোন ছাড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বন্দনা এসে ঘরে ঢুকল। বলল: বাবারে বাবা! আপনার কথা কওয়া আর শেষ হয় না। আমাকে একলা ফেলে,……তবু যদি জান্‌তাম interesting কারুর সঙ্গে কথা কইছেন।

বিশু এগিয়ে এসে বন্দনার কাঁধের ওপর একটা হাত রাখল। তারপর একটা ঝাঁকানি দিয়ে উচ্ছসিতভাবে বলল: কথা কইতে আর পেলাম কই! ঘুম্ ভাঙ্গাতেই যে রাত ভোর হ'য়ে গেল। কিন্তু আপনার ঘুম পাচ্ছে না তো?

পুষ্পকে সাবধান ক'রে দিয়ে সাফল্যের আনন্দে বিশু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কে যেন তার ভেতর থেকে বলে দিচ্ছিল: এ সাফল্যের

জন্য সে বন্দনার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তাকে সন্তুষ্ট করা তার কর্ত্তব্য!

ওদিকে বিশুর ব্যবহারে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রে বন্দনার চোখদুটিও যেন আবেশে বুজে আসছিল। সে বিশুর বাহুমূল ধরে তাকে আস্তে আস্তে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে লাগল।

বিশুও এবার আর কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। কিন্তু অসাবধানও হ'লো না। বন্দনার আসন্ন আলিঙ্গনের কবল থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সে তাকে একটা কৌচের ওপর জোর করে বসিয়ে দিল। পরে নিজেও আর একটা কৌচের ওপর বসে পড়ে চীৎকার ক'রে বংশীকে ডাকল।

—এত রাত্রে বংশীকে আবার কী দরকার? বন্দনা একটু বিরক্ত হ'লো।

—এঁ্যা! একটা ঢোক গিলে বিশু বলল: একটু জল খাব।

কৈফিয়ৎ শুনে বন্দনা এবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। বলল: জল তো আমিও এনে দিতে পারতাম। আমাকে না বলে বংশীকে ডাকবার মানে?

—তাও তো বটে! আর কোন উত্তর দিতে না পেরে বিশু বোকার মতো একটু হাসলো!

—হুম্! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বন্দনা। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল: আপনি আমাকে কী ভেবেছেন বলুন তো?

বন্দনার ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে বিশু আর কোন কথা কইতে ভরসা করল না!

—My dear friend. ক্রোধটা বেশী হ'য়ে গেলে বন্দনাও অনেকের মতো মাতৃভাষা বিস্মৃত হ'তো! বলল: তুমি যা ভেবেছ আমি তা নই! বন্দনা মোটেই সস্তা মেয়ে নয়!—বলেই, সে যেন ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল!

পনের

বন্দনা বিরূপ হ'লেও বাড়ীতে বংশী ছিল। সুতরাং বিশুকে খুব বেশী অসুবিধা ভোগ করতে হ'লো না। পরদিন সকালে উঠে সে প্রথমেই ফোন করল সুকুমার সেনের বাড়ীতে। গত কাল বিনা নোটীশে সে অফিস কামাই করেছিল। তার একটা বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ৎ গতকালই দেওয়া উচিত ছিল তার সুকুমারকে; কিন্তু অন্যমনস্কতার জন্য হ'য়ে ওঠেনি। তাই কর্ত্তব্য হিসাবে কাজটা সে প্রথমেই সম্পন্ন ক'রে রাখল। সুকুমার সেন শুধু তার বন্ধু নয়—মনিবও বটে!

সৌভাগ্যক্রমে সুকুমার তখন বাড়ীতেই ছিল। সাড়া পেয়ে বিশু কৈফিয়ৎ দিল: নিদারুন ঔদরিক গোলযোগের জন্য গতকাল সে অফিস যেতে পারেনি।

—তাই নাকি? সুকুমার ভদ্রতা করে বলল: আজ কেমন আছেন?

—একটু ভাল আছি। তবে বড় দুর্ব্বল—

—It doesn't matter, আজকের দিনটাও তাহলে আপনি বিশ্রাম নিন।

—ধন্যবাদ।

অফিস যাওয়া থেকে রেহাই পেয়ে বিশু তখন রমেশবাবুর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে লাগল। পুষ্পদের বাড়ীর সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না তার। মাঝে মাঝে তার প্রচণ্ড লোভ জাগছিল,—টেলিফোনে খবর নেবার জন্যে। কিন্তু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাওয়ার আশঙ্কায় শেষ পর্য্যন্ত সে ইচ্ছাকে সে দমন ক'রে রাখল। গত রাত্রিতে নিজের বুদ্ধিতে সে যতটুকু দুঃসাহস প্রকাশ ক'রে ফেলেছে, তার ফলাফল চিন্তা ক'রে ইতিমধ্যেই সে সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত কী দাঁড়ায় সেটা তার আগে জানা দরকার।

বেলা এগারটার সময় বংশী এসে তাকে অনুরোধ করল,—মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য।

বিশু স্বীকৃত হ'লো না। বলল: বাড়ীর কর্ত্তা গেছেন বাইরে,—গিন্নী গোঁসা ক'রে বসে আছেন শোবার ঘরে! এ অবস্থায় তুই আমাকে খেতে বলিস কোন সাহসে?

—যত্তো সব ছেলে মানুষী, চলো চলো।

বংশী তাগাদা করতে লাগল। কিন্তু বন্দনার সঙ্গে তার মনোমালিন্যের কারণ সম্বন্ধে সে একটাও প্রশ্ন করল না দেখে বিশু হঠাৎ যেন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ল। লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে একটু বিরক্তও হলো সে। বলল: কেন জ্বালাতন করছিস। এ বাড়ী যদি তোর হ'তো, তাহলে বলতে হ'তো না।

বংশী তবুও আশা ছাড়ল না। বলল: তবে যে সকাল বেলায় জল-খাবার খেলে?

কথাটা সত্য! বিশু একটু চিন্তা ক'রে বলল: তখন অন্যমনস্ক ছিলাম! তুই যা, বিরক্ত করিস নি!

বংশী অগত্যা নিরস্ত হ'লো।

ঘড়িতে ক্রমে বারটা বেজে গেল। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত রমেশবাবুর প্রত্যাবর্ত্তনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ব্যাপার কী?—বিশুর দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল। যে লোকের দশটার মধ্যে বাড়ী ফেরার কথা, সে এখনও ফিরছে না কেন? শেষ পর্য্যন্ত ভরাডুবি হ'লো নাকি?

অবশেষে ঘড়িতে যখন একটার ঘা পড়ল, তখন উৎকণ্ঠা আর সহ্য করতে না পেরে, বিশু বংশীর কাছে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করল।

রাস্তায় এসে বিশু প্রথমেই একটা ট্যাকসী ভাড়া করল। পুষ্পর সঙ্গে তাকে তাড়াতাড়ি দেখা করতে হ'বে,—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু গাড়ীর ড্রাইভারটা যেন কী!

—এই জল্‌দি চলো,—আউর জল্‌দি—

কিন্তু বিশুর মনের গতির সঙ্গে তাল রেখে গাড়ী চালানো ট্যাকসী চালকের পক্ষে সম্ভবপর হ'লো না। কর্ম্মব্যস্ত সহর সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য রেখে সে আরও সাবধানে এগোতে লাগল। ফলে, সর্ট ষ্ট্রীটের মোড় থেকে ভবানীপুর এলাকায় পৌঁছতে গাড়ীর সময় লাগল দশ মিনিটেরও ওপর!

কিন্তু এই কয়েক মিনিটের হের-ফেরে বিশুর চঞ্চল মস্তিষ্ক আর একটা নতুন আশঙ্কার কথা কল্পনা করতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিল। পুষ্পদের বাড়ীতে এতক্ষণে তার জন্যে অন্য কোন রকমের বিপদ অপেক্ষা করছে না তো! অমঙ্গলের আভাষ পেয়ে এ পর্য্যন্ত সে

যা কিছু করেছে,—সবই সে করেছে সন্ত্রস্ত হৃদয়ে,—চঞ্চল মস্তিষ্কের অতিদ্রুত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী! কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়,—বিপদ মাথায় ক'রে তাড়াতাড়ি কোন কিছু করার পরিণাম, কখনও কল্যাণকর হয় না। আগে থাকতে খোঁজ খবর নিয়ে অগ্রসর হ'তে দোষ কী?

সত্যই যদি আজ পুষ্পর জীবনে বিপদ দেখা দিয়ে থাকে, সেরূপ ক্ষেত্রে নিছক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর সরল অর্থ,—ভাব-বিলাসিতা! এর সার্থকতা কী! কেবলমাত্র একজনের অভাবে মুক্তি-সঙ্ঘের অগ্রগতি ব্যাহত হ'বে, এরূপ চিন্তা করা তো যে কোন আদর্শবাদী বিপ্লবীর পক্ষেই অপরাধ! সুতরাং সে-ই বা কেন অকারণ পুষ্পর বিপদের সঙ্গে নিজেকে জড়িত ক'রে সঙ্ঘের ক্ষতি করবে! বরং তার তখন কর্ত্তব্য হ'বে, অধিকতর সাবধান হ'য়ে, দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ ক'রে, পুষ্পর মতো একজন কর্ম্মীর অভাব মোচন করা!

—এই রোকো, রোকো—

ট্যাক্সী চাউলপটির কাছাকাছি এসে পৌছতেই বিশু তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। তারপর গাড়ী-ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে চলল নিজের হোস্টেলের দিকে!

কিন্তু নিশ্চিন্ত সে হ'তে পারল না। যুক্তির জাল বুনতে বুনতেই সে একে একে স্নানাহার শেষ করল। কিন্তু বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বিছানায় গিয়েও সে শুতে পারল না! শেষে—

সঙ্ঘের আদর্শের জৌলুষ ক্ষীণ হ'য়ে গেল তার কাছে! চোখের

সামনে কেবলই ভেসে উঠ্‌তে লাগল বিপদাপন্ন পুষ্পর বিভ্রান্ত মুখখানি,—তার চোখের বিহ্বল দৃষ্টি!

বিশু আরও চঞ্চল হ'য়ে উঠল! পুষ্পকে এমন অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে কল্পনা করবার সুযোগ কখনও সে পায়নি এর পূর্ব্বে। তার মনের উদ্‌গ্র কামনা এতাবৎকাল বার বার প্রতিহত হয়েছে পুষ্পর বিরাট ব্যক্তিত্বের দুর্ভেদ্য আভিজাত্যের নিকট! কিন্তু আজ? আজ যদি সে রজতের অনুপস্থিতির সুযোগে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়! তার শাস্তির গুরুত্ব,—পরিণামের দায়িত্ব আজ যদি সে তার সঙ্গে ভাগাভাগি করে ভোগ ক'রে! তাহলে,—তার মনের কথা আর কেউ না বুঝুক পুষ্প তো বুঝবে!……

শেষে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বিশু আবার ট্যাকসী ধরল।

পুষ্পও উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। বিশু ঘরে ঢুকতেই সে তাকে ম্লান ভাবে একটু হেসে অভ্যর্থনা করল। মৃদুস্বরে বলল: এতক্ষণে বুঝি মনে পড়ল?

বিশুর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। পুষ্প যে লম্বা কৌচটার ওপর বসেছিল, সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে তারই একধারে বসে পড়ল। তারপর বলল: ওরা এসেছিল নাকি?

—হ্যাঁ, অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে—

এই সময় সিঁড়িতে চটি-জুতোর আওয়াজ শোনা গেল।

—চুপ, বাবা আসছেন!—এই বলে পুষ্প উঠে গিয়ে আর একটা লম্বা কৌচের ওপর বসল।

পরমুহূর্ত্তেই ঘরে ঢুকলেন মিঃ ঘোষ! বিশুকে দেখে বললেন: ইস্‌, এ সব কী কাণ্ড বলতো! শুনেছ তো সব?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! আশ্চর্য...

বিশু লক্ষ্য করল, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মিঃ ঘোষের চেহারাটা যেন একেবারে বদলে গেছে! তাঁর সেই সদাহাস্যময় মুখের ওপর কে যেন কালী মাখিয়ে দিয়েছে এক চোপ্! তাঁর প্রশান্ত ললাটটি কলঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে গভীর রেখা বাহুল্যে! এমন কি, পূর্ব্বের মতো একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলার দুর্ব্বলতাটা পর্য্যন্ত যেন তাঁর লোপ পেয়ে গেছে! ভদ্রলোকের মনের অবস্থা কল্পনা করে বিশু সত্যই অত্যন্ত দুঃখিত হ'লো।

মিঃ ঘোষ যেখানে বসেছিলেন, ঠিক তার সামনের দেয়ালে টাঙ্গানো ছিল তাঁর পরলোকগতা পত্নীর বিরাট একখানা অয়েল পেন্টিং। উদাসভাবে সেইদিকে চেয়ে তিনি ধীরে ধীরে বললেন: আমার শান্তির সংসারে এ সব কী কাণ্ড ঘটতে আরম্ভ করল—ছিঃ ছিঃ···তিনি একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার বললেন: কিন্তু, কিছুই তো বুঝতে পারছিনা। আমি আমার মেয়েদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছি। তারা ইচ্ছে মতো হৈ চৈ করে বেড়ায়। কিন্তু কোন নোংরা ব্যাপারের সঙ্গে যে তারা সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে, এ কথা তো কখন ভাবতেও পারিনি! ছিঃ ছিঃ, লিলির মতো মেয়ে......

—আঃ বাবা, কী আবোল তাবোল বক্‌ছো?—একটু বিরক্ত হয়েই পুষ্প বলল্।

ধমক খেয়ে মিঃ ঘোষ্ যেন নিজেকে সামলে নিলেন। পরে একটা ঢোক গিলে গুন্ গুন্ করে বললেন: না, তাই বলছি! লিলি তার

পিশির ওখানে গেছে, বাড়ীতে এখন রয়েছ একমাত্র তুমি—তোমাকেই শেষে ওরা সন্দেহ করল নাকি? নাঃ, ওদের অসাধ্য কাজ কিছু নেই দেখছি। বলে, তিনি একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

দেখাদেখি বিশুও হাসল। কিন্তু পুষ্পর ধমক দেওয়া এবং মিঃ ঘোষের সামলে নেওয়ার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে তার সন্দেহ হলো, পুলিশের বাড়ী সার্চ্চ করা ছাড়াও সম্ভবতঃ এ ব্যাপারের মধ্যে আরও কোন রহস্য নিহিত আছে। মিঃ ঘোষ অবশ্যই লিলির সম্বন্ধে কিছু একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিলেন! কিন্তু পুষ্প তাঁকে বাধা দিল কেন? পুলিশ শেষে লিলির সম্বন্ধেও কোন কিছু আবিষ্কার করে ফেলল নাকি? —বিশু বিস্মিত হলেও, পুষ্পকে অনিচ্ছুক দেখে সাময়িকভাবে নিজের কৌতুহলটা দমন করে রাখল।

—একটা কথা তখন থেকে কেবলি মনে হচ্ছে!—মিঃ ঘোষ আবার বললেন: অনেকদিন পূর্ব্বে কে যেন আমাকে বলেছিল, রজতের নাকি একটা দল আছে! যদিও রজতকে যারা জানে, তারা কিছুতেই ও কথা বিশ্বাস করবেনা। তবুও, মনে হচ্ছে, কথাটা হয়তো একেবারে মিথ্যা নাও হতে পারে! হয়তো ওর সঙ্গে মেলামেশা করার জন্যেই পুলিশ আমার মেয়েদের সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে! তোমার কী মনে হয়?

বিশু তাচ্ছিল্যভরে বলল: আপনি অকারণ অত ভাবছেন। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি এটুকু বুঝছি যে, পুলিশের এই সার্চ্চ করার মূলে অধিকাংশ সময়েই কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণ থাকে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ওরা আঁধারে ঢিল ছুঁড়ে অপরাধীদের মনে আতঙ্ক জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করে। এই যে আপনার বাড়ীতে সার্চ্চ হয়ে গেল,

এ খবরটা এরই মধ্যে প্রচার হয়ে গেছে, অর্থাৎ অপরাধী যারা তাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। ফলে, পুলিশের কর্ম্মতৎপরতার জন্যে তারা আরও সাবধান হ'বে, আর তাদের সেই অতি সাবধানতার জন্যে শীগগীরই হয়তো ধরাও পড়ে যাবে তারা! কিন্তু এটুকু আপনি নিশ্চিত জানবেন, গোপনে দল পাকিয়ে একদিন যারা দেশোদ্ধার করবার চেষ্টা করেছিল তাদের বংশ আজ নির্ম্মূল হ'য়ে গেছে!

—কী জানি বাবা! ও সব নিয়ে কখন মাথাও ঘামাই নি,—বুঝিও না কিছু। আচ্ছা, তোমরা বসো, আমি চলি। লাইব্রেরী ঘরটাকে গোছাতে হবে। ব্যাটারা বইগুলো নিয়ে যেন গেণ্ডুয়া খেলে গেছে··· মিঃ ঘোষ চলে গেলেন।

পুষ্প বলল: সত্যি অমন দামী দামী বইগুলো নিয়ে তারা যে রকম ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিল,—দেখলে কষ্ট হয়!

মিঃ ঘোষ প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গেই বিশু উঠে দাঁড়িয়েছিল। ইচ্ছা ছিল আবার গিয়ে পুষ্পর পাশে বস্‌বার। কিন্তু ঠিক সেই সময় বাইরে একটা মোটর থামবার শব্দ হ'লো। পরমুহূর্ত্তে রজত এসে ঘর ঢুকল। সর্ব্বাঙ্গ তার ধুলি-ধূসরিত, চুল উস্কখুস্ক, চোখে মুখে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন সুস্পষ্ট!

—আশ্চর্য্য লোক তুমি! রজতকে দেখেই পুষ্প উত্তেজিতভাবে বলল: কোথায় ছিলে এ ক'দিন? বাড়ীতেও বলে যাওনি···

—হঠাৎ যেতে হলো কি না! একটা সোফার ওপর দেহ এলিয়ে দিয়ে রজত বিশুর দিকে একটা কটাক্ষ করল। তারপর বলল: এক বাল্যবন্ধু হঠাৎ জোর করে টেনে নিয়ে গেল,—তার বিয়েতে—

—আজই ফিরলেন বুঝি? বিশু তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল।

—আজই নয়'—এখুনি। বলেই রজত পুষ্পর দিকে চাইল। দেখল, সে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে! সে দৃষ্টির মধ্যে কী ছিল কে জানে,—রজত হঠাৎ সঙ্কুচিতভাবে চোখ নামিয়ে নিল।

রজতের অবস্থা দেখে বিশু আবার অন্য কথা পাড়ল। বলল: এদিকে, এখানে কী কাণ্ড হয়েছে শোনেন নি তো?

—না শুন্‌লেও, অনুমান করতে পারছি। রজত বেশ নির্ব্বিকার-ভাবেই বলল: সার্চ্চ হয়েছে তো?

রজতের ভাব দেখে বিশু ও পুষ্প উভয়েই অবাক হয়ে গেল।

—এ রকম একটা ব্যাপার যে শীগ্‌গীরই ঘটবে— এ সন্দেহ আমার হয়েছিল! সেই জন্যই তো তাড়াতাড়ি চলে এলাম। যাক্‌ গে,—ছিল নাকি কিছু?—প্রশ্নটা সে পুষ্পকেই করল।

পুষ্প গম্ভীরভাবে বলল: সঙ্ঘের সাত নম্বর রেগুলেশানের খান্‌ তিনেক ইস্তাহার ছিল!

—এই রে, তার পর?

—বিশু বাবুর ফোন পেয়েই সেগুলোর ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম!

রজত এবার বিস্মিত হয়ে বিশুর দিকে তাকাল!

বিশু তখন সবিস্তারে গত রাত্রের ঘটনাগুলো বলল। শুনে, রজত একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বিশু আশা করেছিল, তার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে রজত অবশ্যই তার সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। কিন্তু—

—কী ভাবছেন? রজতের ভ্রূকুটীকুটীল মুখের দিকে তাকিয়ে বিশু সভয়ে প্রশ্ন করল: ভাল করিনি?

—কী করে বলি বলুন!—একটা নিঃশ্বাস রোধ করে রজত বলল: আপনার মতো সুযোগ সুবিধে পেলে আমিও নিশ্চয়ই পুষ্পকে সাবধান করে দিতাম! কিন্তু টেলিফোন কোম্পানীকে সাক্ষী রেখে কোন কাজ করতাম না নিশ্চয়ই! যাক,—আপনি উঠবেন তো? চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাই!

বিশুর মনের অবস্থা তখন কল্পনাতীত। সে পুষ্পর দিকে আর চোখ তুলে চাইতে পারল না পর্যন্ত। শুধু কোন রকমে বলল: চলুন—

ষোলো

পুষ্পর সঙ্গে ঘনিষ্ট হবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বিশু কয়েকদিন অফিস কামাই করে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াল! আশাটা সে বড় বেশী ক'রে ফেলেছিল বলেই আঘাতটা তার অমন করে লেগেছিল। একজন শিক্ষিতা মহিলার সুমুখে বুদ্ধিহীনতার অজুহাতে অপদস্থ হওয়া পুরুষের পক্ষে যে কতবড় লজ্জার ব্যাপার, সে কথা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিল। অথচ তাকে এইভাবে অপদস্থ করার মধ্যে রজতের যে কত বড় একটা কূটনৈতিক চাল প্রচ্ছন্ন রয়েছে সে কথাটা পুষ্পকে বুঝিয়ে দেবার মতো সাহসও আর তার নেই। রজতের আসল মনোবৃত্তি সম্বন্ধে পুষ্পকে সচেতন করতে গিয়ে, একবার সে ঠকেছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর সে ভুল করতে চায় না। অবশ্য পুষ্প সম্বন্ধে আশা করবার তার আর কিছুই নেই! তবু, তার বিরক্তি-মাখান মুখখানা কল্পনা করতেও সে পারেনা। কষ্ট হয় বলেই সে পারে না।

কিন্তু রজতটার কী স্পর্দ্ধা! সে নিজেকে বিশুর চাইতেও বুদ্ধিমান বলে মনে করে! পুষ্পকে টেলিফোনে সাবধান করে দেওয়ার ফলাফল সম্বন্ধে শুধু যে রজতের মনেই সন্দেহ জেগেছিল, তা তো নয়, তার

নিজের মনেও অস্বস্তির সীমা ছিল না। কিন্তু সে কথা পুষ্পর সামনে আলোচনা করে রজত তাকে অপদস্থ করল কেন ?

কারণ আবিষ্কৃত হ'তেও বিলম্ব হলো না। বিশুর যুক্তি-প্রবণ মন সায় দিয়ে বলল : নিছক ঈর্ষা!—পুষ্পর জীবনে একাধিপত্য করবার যে সব সুযোগ সুবিধা এতদিন রজতের ছিল, বিশুর আবির্ভাবে সেগুলো ব্যাহত হয়েছে। প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুষ্পর জীবনে এখন রজতই একমাত্র পুরুষ নয়। পুষ্প এখন তুলনা করবার সুযোগ পেয়েছে! বর্ত্তমানে এইটেই হয়েছে রজতের হিংস্র মনোবৃত্তির মুখ্য কারণ।

আচ্ছা!—হঠাৎ বিশুও অত্যন্ত উদার হয়ে পড়ে। রজতকে সে আর বিড়ম্বিত করবে না। ভবিষ্যতে আর সে কখনও দেখা দেবে না পুষ্পর জীবনে। সঙ্ঘের কথা নিঃশেষে বিস্মৃত হয়ে সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে নির্ব্বাসন দণ্ড।—তাতে, আর কেউ না জানুক, পুষ্প অন্ততঃ বুঝবে, কেন, কাকে সুখী করবার জন্যে তার এই আত্মত্যাগ!

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত, সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে নির্জ্জনে বাস করা তার ঘটে উঠল না। সে সঙ্ঘ ত্যাগ করলেও সঙ্ঘ তাকে ত্যাগ করে নি। একদিন হোটেল থেকে বেরুবার মুখে একটি বাচ্চা ছেলের মারফৎ সে একখানা চিরকূট পেল। আপাতদৃষ্টিতে পত্রখানা একটা পারিবারিক সমাচার—পিতা যেন পুত্রের কুশল প্রার্থনা করছেন। কিন্তু মুক্তি-সঙ্ঘের সভ্য হিসেবে বিশু জানত, কোন কথার পর কতগুলি কথা বাদ দিয়ে এ পত্র পড়তে হবে। সে সঙ্ঘগুরুর নির্দ্দেশ পাঠ করল : প্রস্তুত হও, যে কোন মুহূর্ত্তেই গোবিন্দপুর যাত্রা করতে হবে !

এর পর বিশু আর কী করতে পারে! অনেক ভেবেও সে

আত্মরক্ষার কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারল না। রজতের আদেশ অমান্য করবার একমাত্র পরিণাম মৃত্যু! অপরপক্ষে—

নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার এখনও সুযোগ আছে তার। হয়তো এই তার শেষ সুযোগ! রজতের প্রতিভা সম্বন্ধে পুষ্পকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করতে হলে, শেষবারের মতো আর একবার তাকে দলপতির নির্দ্দেশে কার্য্যক্ষেত্রে নামতেই হবে।

মনোস্থির করে, বিশু আনুসঙ্গিক বন্দোবস্তে মনোযোগ দিল। প্রথমেই তার মনে পড়ল অফিসের কথা। মিথ্যা কথা বলে সে সুকুমারের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছিল মাত্র দুদিনের। অথচ, ইতিমধ্যে কামাই করে ফেলেছে সে সাতদিনেরও ওপর। এ ছাড়া, গোবিন্দপুরের কাজের জন্যে তাকে আরও অন্ততঃ দশ-পনের দিনের জন্যে ছুটি নিতে হবে। চাকরীটা তার শেষ পর্য্যন্ত টিকলে হয়! বিশুর অনুশোচনা হলো। রজতের মতো তার বড়লোক্ বাপও নেই, পুষ্পর মতো জমীদারীও নেই তার! বেঁচে থাকতে হলে তাকে উপার্জ্জন করেই খেতে হবে। সুতরাং নিছক ভাল না লাগার অজুহাতে অফিস কামাই করা, অন্ততঃ তার মতো লোকের শোভা পায় না! বিশেষতঃ, চাকরীটা যখন সত্যই আরামের!

পরদিন যথা সময়ের কিছু পূর্ব্বেই বিশু অফিসে গিয়ে হাজির হলো। তার পর সহকর্ম্মীরা এলে, একজন টাইপিষ্টকে গিয়ে অনুরোধ করল: একটা দরখাস্ত টাইপ করে দেবেন?

—অত বিনীতভাবে বলছেন কেন? হুকুম করলেই তো হয়! টাইপিষ্ট যুবকটি তার কাজ করে দিল বটে কিন্তু একটু খোঁচাও দিল!

বিশু কিন্তু ক্ষুণ্ণ হলো না। অফিসে ঢোকবার পর থেকে সহকর্ম্মীদের এ ধরণের ব্যঙ্গোক্তি শোনা তার সহ্য হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সহকর্ম্মীরাও বিশুকে অকারণ আঘাত করতো না। ব্যাপারটার মূলে একটা নিগূঢ় কারণও ছিল:

অফিসের মালিক সুকুমার ছিল মনে-প্রাণে একজন সাহেবী মেজাজের লোক। কথায়-বার্ত্তায় কাজে-কর্ম্মে সে সর্ব্বদাই ইংরেজদের অনুকরণ করে চলবার চেষ্টা করতো! বাড়ীতে ছোট বোনকে সম্বোধন করতো সে: Oh, my darling বলে! অফিসে কর্ম্মচারীদের হুকুম করতো: Well, you Babus বলে! কিন্তু সাহেব সাজলেই কিছু সুখী হওয়া যায় না! টাকার জোরে সে হয়তো শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছিল সমাজের তরুণীদের। তাদের অভিভাবকেরাও তাকে আশাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন ভবিষ্যতের আশায়। কিন্তু নিজের অফিসের কর্ম্মচারীদের নিকট থেকে, বিশেষতঃ বয়স্কদের কাছ থেকে, সে শুধু ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই অর্জ্জন করতে পারেনি!

অফিসের যেসব কর্ম্মচারী তার স্বর্গীয় পিতার সহকর্ম্মী ছিলেন তাঁরা তার উগ্র সাহেবীয়ানাকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাঁরা দেখেছিলেন, কেমন করে তার পিতা দেবকুমার বাবু আট হাত বহরের মলিন ধুতি পরে, শত-ছিন্ন একটা বাঁশের বাঁটের ছাতা বগলে নিয়ে হার্ডওয়্যারের বাজারে দালালী করে বেড়াতেন। কত কষ্ট সহ্য করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন বর্ত্তমান সেন কোম্পানীর মতো একটা বিরাট কারবার। খাঁটি বাঙ্গালী সেজেও কেমন করে তিনি শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছিলেন বিদেশী ইংরেজদের! কিন্তু পিতার মৃত্যুর

পর সুকুমার যখন অফিসের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা হয়ে বসল; তখন অতি অকস্মাৎ তাকে উগ্র সাহেবীয়ানায় দীক্ষিত হতে দেখে তাঁরা যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অমন বাপের এমন ছেলেও হয়!

ব্যাপার দেখে কেউ কেউ তাকে অযাচিতভাবে উপদেশও দিলেন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে। কিন্তু তাতে তাঁদের প্রতি সুকুমারের বিতৃষ্ণা বাড়ল ছাড়া কমল না!

প্রথম জীবনে দেবকুমার বাবু দারিদ্র্যের জন্য লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পান নি। তাই, সুকুমারকে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'রে শিক্ষিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন অনেক কিছুই। কিন্তু পুত্র তাঁর কোন আশাই পূর্ণ করল না। আই-এ পাশ করেই সুকুমার আবদার ধরল বিলেতে গিয়ে পড়াশুনা করবার জন্য; দেশের University-তে সে আর কিছুতেই পড়বে না। শুনে, দেবকুমার বাবু উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকে নিজের কারবারেই ঢুকিয়ে নিলেন চোখে চোখে রাখবার জন্ত। তারপর পুত্রকে ব্যবসা সম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দেবার পূর্ব্বেই একদিন হঠাৎ মারা গেলেন।

পিতার মৃত্যুর পরেই সুকুমার একবার অকারণ বিলেত থেকে ঘুরে এল। একখানার জায়গায় তিনখানা মোটর কিনল। যুগপৎ অফিসে ও বাড়ীতে আর্দালি চাপরাশীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিল এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'রে বিলেত-ফেরৎ সমাজের মধ্যে একজন কেষ্ট-বিষ্টু লোকরূপে পরিগণিত হ'লো।

ব্যাপার দেখে বৃদ্ধ কর্ম্মচারীরা শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন। কেউ কেউ এমন ভয়ও দেখালেন: এ ভাবে বেশী দিন চললে অফিস উঠে যাবে।

কিন্তু প্রগতিপন্থী সুকুমার অতীত-বিলাসী বৃদ্ধগুলোর কথায় কান দিত না।

সুকুমারের অসুবিধার কথা ভেবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর দলও উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠত। তারা আশ্চর্য্য হ'য়ে প্রশ্ন করতো : ও গুলোকে বিদায় করে দাও না কেন?

বিজ্ঞজনোচিত উদারতার হাসি হেসে সুকুমার উত্তর দিত : তাড়িয়ে দিলে বুড়ো বয়সে খাবে কী?

কিন্তু তার পরের পরামর্শটা সে এড়িয়ে যেত। স্বেচ্ছাচারী হ'লেও সুকুমার একেবারে মূর্খ ছিল না। সে জানত, তার অফিসের অর্থাগম ও সম্মান আজও বজায় আছে, শুধু ওই উপদেশ-প্রবণ বৃদ্ধগুলোর জন্যই।

কিন্তু অফিসের কর্ম্মচারীরা কেবল ওই একটি মাত্র কারণের জন্যই যে সুকুমারকে ঘৃণা করতো, তা নয়। তার আরও একটা মারাত্মক দোষ ছিল। সে বিদেশী কোম্পানীগুলোর অনুকরণে নিজের অফিসেও অনেকগুলি ফিরিঙ্গী টাইপিষ্ট মেয়ে রেখেছিল। তাদের চাকরীর প্রধান যোগ্যতা ছিল, বয়স, স্বাস্থ্য এবং রূপ। সুতরাং তাদের সঙ্গে সুকুমারের সত্যকার সম্পর্কের কথাটাও কারুর অজানা ছিল না। দরজার গোড়ায় খাড়া প্রহরী রেখে সুকুমার তার খাশ কামরায় অবস্থান করতো।

মধ্যবিত্ত কেরাণীর বেদনা কেউ বোঝে না এ দেশে। কোন নেতাও তাদের কপালে জোটে না। কারণ, নিরীহ ভদ্রলোকদের ক্ষেপিয়ে তোলাও যায় না; উজীরিও মেলেনা। সুতরাং যুগপৎ ধনীক

ও মজদুর শ্রেণীর শত্রুতা মাথায় করে, দিনের পর দিন গুম্‌রে কেঁদে মরা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকে না!

কিন্তু এদের চরিত্রের আর একটা দিক্‌ও আছে। স্বেচ্ছাচারিতার জন্য সুকুমারের প্রতি যত ঘৃণাই থাকুক না কেন, তার বিলাস-সঙ্গিনী ফিরিঙ্গী মেয়েগুলোকে তারা বেশ খাতির করেই চলত। অথচ সুকুমার যখন বিশুকে এনে অফিসে ঢোকাল, তখন মনিবের প্রতি তাদের ঘৃণাটা পরিণত হলো জাতক্রোধে। তখন তারা গুল্‌তুনি আরম্ভ করল: আফিসে এমন অনেক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী রয়েছেন যাঁদের বেতন বৃদ্ধির আশু প্রয়োজন। কিন্তু সুকুমার তাঁদের বৈধ দাবী উপেক্ষা করে, তাদেরই রক্ত জল করা উপার্জ্জনের একটা মোটা অংশ নিছক নিজের বন্ধু প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ বিশুকে দান করছে। ফলে—

সুকুমারকে কিছু বলতে না পেরে, তার বন্ধু বিশুকেই তারা বাক্য-বাণের দ্বারা জর্জ্জরিত করবার চেষ্টা করতো।

বিশু কিন্তু তার জন্য ক্ষুণ্ণ হ'তো না। বরং সহকর্ম্মীদের জন্য তার মনের মধ্যে একটা অনুকম্পার ভাবই জাগত। অনেকটা, এরা জানে না এরা কি করছে,—এই ধরণের একটা ভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে সে তাদের বাক্যবাণগুলোকে হাসিমুখেই হজম করে যেত। তার ধারণা ছিল, এ সব কথা যদি সুকুমার ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ সকলকে বরখাস্ত করবে।

বেলা দেড়টার সময় সুকুমার টিফিন খায়। সেই সময়েই তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার সুবিধা, এই ভেবে বিশু যথা সময়ে তার খাশ কামরার দিকে অগ্রসর হলো। নিজের দরখাস্তখানার দিকে চেয়ে মনে মনে সে

একবার হাসল। সুকুমারের সঙ্গে তার যে রকম ঘনিষ্ঠতা তাতে সামান্য কয়েক দিনের ছুটির জন্য তার মুখের কথাই যথেষ্ট। কিন্তু তার বদলে দরখাস্ত দেখলে সুকুমার কী করবে! হয় তো হাসবে, রসিকতা করবে, কিংবা অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

—হুকুম নেহি। সুকুমারের দ্বাররক্ষী বলল: এখন যাবেন না, সাহেব টিফিন করছেন···

—তা জানি। এই বলে বিশু ঘরে ঢুকতে উদ্যত হলো।

—এখন যাবেন না। অর্ডালি এবার দৃঢ়স্বরে বলল: সাহেব রাগ করবেন।

বিশু ভ্রূকুটী করল। আপাতদৃষ্টিতে সে এ অফিসের কর্ম্মচারী হ'লেও আসলে যে সে সাহেবেরই বন্ধু,—এই কথাটা অর্ডালিকে বুঝিয়ে দিয়েই সে সজোরে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই সে যে দৃশ্য দেখল তাতে কিছুক্ষণের জন্য চোখের সামনে থেকে তার জগৎ সংসার বিলুপ্ত হয়ে গেল। জুতো সমেত পা দু'খানি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে সুকুমার একটা ঘূর্ণায়মান চেয়ারের ওপর বসে ছিল এবং তার কোলের ওপর বসে—এক হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে, তাকে একটা প্রকাণ্ড মর্তমান কলা খাইয়ে দিচ্ছিল বন্দনা চৌধুরী।

অভিভূত ভাবটা প্রথম কাটল বন্দনার। সে চট করে কক্ষ-সংলগ্ন বাথরুমটার ভেতর ঢুকে গেল। তারপর সুকুমার মুখ কালী করে উঠে গিয়ে একটা জানালার ধারে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

দিশাহারার মতো বিশু যে কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল জানে না।

হঠাৎ স্বকুমার জানলার কাছ থেকে সরে এসে একেবারে তার মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াল। তারপর কঠোরস্বরে প্রশ্ন করল: কী চান আপনি এখানে?

বিশু কোন কথা কইতে পারলো না! পূর্ব্বের মতোই বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইল।

—অর্ডালি! স্বকুমারের সক্রোধ গর্জ্জনে দ্বাররক্ষীটি কাঁপতে কাঁপতে এসে ঘরে ঢুকল।

—তুম্‌কো কিস্‌ বাস্তে হাম্‌ তলব দেতা? বেত্‌মীজ···নিমকহারাম··হারামজাদ্‌···

অর্ডালি কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল: হাম ক্যা করি মালিক! হাম তো বাবুকো বহুত দপে মানা কিয়া থা; লেকীন্‌, বাবু বোলা কী, সাহাব মেরা দোস্ত···

—দোস্ত? স্বকুমার চীৎকার করে উঠল: দোস্ত যে, সে আমার অফিসে চাকরী করেনা, ড্রইংরূমে বসে আড্ডা দেয়...

তারপর আরক্ত চোখে বিশুর দিকে চেয়ে সে আবার বলল: বলুন কী দরকার আপনার? বলুন,···Hurry up...

বিশুর অবস্থা তখন শোচনীয়। সে কোন রকমে দরখাস্তখানা স্বকুমারের হাতে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসতেই সহকর্ম্মীরা বিশুকে ঘিরে ধরল: ব্যাপার কী?

বিশু তাদের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারল না।। কেমন যেন ফ্যাল ফ্যাল করে তাদের দিকে তাকাতে লাগল।

মিনিট পনের পরে একজন চাপরাশী এসে তার হাতে একখণ্ড কাগজ দিল : অতিরিক্ত অফিস কামাই করার অপরাধে বিশুকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পড়ে, বিশু যেন একেবারে মরমে মরে গেল!

কিছুক্ষণ পরে আবার একজন বেহারা এসে তাকে বলল : সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

বেহারার বক্তব্য শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশুর শরীরের মধ্য দিয়ে যেন একটা তড়িৎ খেলে গেল। প্রথমে সে একটু হাসল। তারপর একটা কাগজ টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা Resignation Letter লিখে বেহারাটার হাতে দিল।

বেহারাটা উল্টো বুঝে আবার বলল : সাহেবের মেজাজ ভাল হয়ে গেছে, চলুন না, ভয় কী!

বিশু গম্ভীরভাবে বলল : তাকে গিয়ে বল, দরকার থাকে যদি, সে নিজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করুক।

—আরে মশাই করছেন কী? কয়েকজন কর্ম্মচারী পূর্ব্বের বিসম্বাদ বিস্মৃত হ'য়ে পরামর্শ দিল : শুনছেন, সাহেবের মেজাজ ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। গিয়ে, একটু খোষামোদ-টোদ করুন...

—সে জন্যে তো আপনারাই রয়েছেন! বিশু এবার জোরে হেসে উঠল। বলল : এখন আমার কাছে আপনাদের ওই মহামান্য সাহেবটি আর পথের একটা রাম-ছাগল, উভয়েই সমান শ্রদ্ধার পাত্র। বলে মুখ ফেরাতেই দেখল, দরজার চৌকাঠের ওপর দাঁতে পাইপ চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বয়ং স্নুকুমার সেন। নিদারুণ অপমানে মুখখানা তার

কালো হয়ে গিয়েছিল। সে বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়েছিল বিশুর দিকে।

বিশু ভ্রুক্ষেপও করল না। সুকুমারের প্রেরিত কাগজটা কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে, সে সটান তারই পাশ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সতেরো

অফিস্ থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিশু সজোরে লিফ্ট্-বেল্-এর বোতাম টিপল। তার কান দুটো তখনও ঝাঁ ঝাঁ করছিল। কিন্তু চিন্তাশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয়নি! নিজের অবিমৃষ্যকারীতার জন্য ইতিমধ্যেই তার অনুশোচনা আরম্ভ হয়েছিল। বর্ত্তমান অবস্থায় তার মতো লোকের পক্ষে, কাজটা বোধ হয় ভাল হলো না। তুচ্ছ একটা আত্মসম্মানের মোহে এক কথায় দেড়শো টাকা মাইনের চাকুরী ত্যাগ করে আসাটা উচিৎ হলো কী?

যাক্ গে! বিশু নিজেই নিজেকে আশ্বস্ত করল। তাকে সুখে-স্বাচ্ছন্দে রাখবার দায়িত্ব রজতের। তার প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির ওপর রজতের শ্রদ্ধা আছে। তাকে এ সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা বলতে শুনেছে সে। সুতরাং নিজের প্রয়োজনেই রজত বিশুকে আবার অন্য চাকড়ী জোগাড় করে দেবে। তার ভাবনা কী!

এক তলায় নেমে লিফ্ট্ থেকে বেরুতে গিয়েই বিশু থম্‌কে দাঁড়াল। মিঃ ঘোষ তাঁর লাঠিটার ওপর ভর দিয়ে হেলে দাঁড়িয়ে, সম্ভবতঃ লিফ্টের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন; তাকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন: এই যে বিশু! তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম যে—

—আমার কাছে?

—অবশ্য সুকুমারের সঙ্গেও দেখা করতাম, কিন্তু দরকার আমার তোমাকেই। একটা জরুরী পরামর্শ আছে।

বিশু আশ্চর্য্য হয়ে বলল: কী ব্যাপার বলুন তো?

—বলছি! কিন্তু, তুমি যাচ্ছিলে কোথায়? কোন দরকারী কাজে না কি?

—না না, আমি এখন হোষ্টেলেই ফিরছিলাম! বিশু ইতিমধ্যেই স্থির করে ফেলেছিল, তার চাকরী যাওয়ার কথাটা সে, অন্ততঃ, নিজে থেকে কাউকেই বলবে না।

মিঃ ঘোষ নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন: ওঃ, তাহলে চল, গাড়ীতেই তোমাকে সব কথা বলছি!

—সুকুমারের সঙ্গে দেখা করবেন না?

—করবো! কিন্তু, আগে তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নি। বিশুকে নিয়ে তিনি গাড়ীতে গিয়ে বসলেন। গাড়ী ছেড়ে দিল।

—অনেক দিন তো সুকুমারের কাছে চাকরী করছো,—সুকুমার ছেলেটি কেমন বল দেখি?

বিশু সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে মিঃ ঘোষের দিকে চাইল।

—ছেলেটির চরিত্র কেমন বলে মনে হয়? —মিঃ ঘোষ আবার বললেন: আমার লিলির সঙ্গে বিয়ে দেওয়া চলে?

প্রশ্নটা অদ্ভুত। বিশু অবাক হয়ে মিঃ ঘোষের দিকে তাকিয়ে রইল।

মিঃ ঘোষ কিন্তু বিশুর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই পূর্ব্ব কথার

জের টানলেন: আমার তো মনে হয়, পাত্র হিসাবে সুকুমার খুব desirable, খুব অর্থবান। বিশেষ, পার্টি-টার্টিতে লক্ষ্য করেছি ছোকরা লিলির সুখ-সুবিধার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তা হলেও, বিয়ের পূর্ব্বে তো একটু খোঁজ খবর নেওয়া দরকার!

বিশু এবার নিঃসংশয় হলো, মিঃ ঘোষ সুকুমারকে জামাই করতে চান্। কিন্তু এতদিন যে ভাবে তিনি তাঁর মেয়েদের স্বাধীনতা দিয়ে এসেছেন, তাতে, কোনদিন যে তিনি আবার সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরের কন্যাদায়গ্রস্থদের মতো কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'বেন, এ কথা সে কোনদিন ভাবতেও পারেনি। ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত রহস্যময় বলে মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকদিন পূর্ব্বেকার ঘটনাটাও তার মনে পড়ে গেল। পুষ্পদের বাড়ী সার্চ্চ হবার পরের দিন তিনি লিলির সম্বন্ধে কিছু একটা বলতে গিয়েই, পুষ্পর কাছে ধমক খেয়ে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী? লিলিকে ঘিরে তার চতুর্দ্দিকে যে রহস্য-জালটা বিরাজ করছে, তার রহস্য ভেদ করা কি এতই কঠিন!

—কী হে, কথা কইছনা যে? বিশুকে নীরব দেখে মিঃ ঘোষ একটু যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠ্‌লেন।

—আজ্ঞে, কী বলছেন?

—কী বলছি? ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে মিঃ ঘোষ বললেন: এতক্ষণ, তুমি তাহলে আমার কোন কথাই শোন নি?

বিশুর মনে পড়ল। ব্যস্ত হয়ে বলল: না না, শুনিছি বৈকি! কিন্তু মাফ্ করবেন! সুকুমারের সম্বন্ধে আমি কোন আলোচনাই করবো না। তবে, আপনি যা জান্‌তে চান, তার অফিসের যে কোন

একজন কর্ম্মচারীকে, একটু গোপনে জিজ্ঞাসা করলেই, জানতে পারবেন।

—কিন্তু তোমার বলতে আপত্তি কী? মিঃ ঘোষ একটু ক্ষুন্ন হ'য়ে বললেন: আমার এতবড় একটা বিপদে তোমরা কেউ আমাকে সাহায্য করবে না?

—বিপদ?

—বিপদ নয়? মিঃ ঘোষ এবার একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন: আমাকে এই মাসের মধ্যে মেয়ে দুটোর বিয়ে দিতেই হবে, at any cost, কিন্তু, তোমাদের কাছে পরামর্শ নিতে গেলেই, কেউ মুচকে হেসে কথাটাকে উড়িয়ে দিচ্ছ; কেউ বা বলছো: কোন কথা বলব না। ঘোষালটা তো আমার মুখের ওপরেই বলে বসল, রাঁচি যাও! তোমরা কেউ আমার মুখের দিকে চাইবে না।

বিশু এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল বলে রাস্তার দিকে লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ দেখল, তাদের মোটর ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট্ অতিক্রম ক'রে পার্ক সার্কাসের দিকে এগিয়ে চলেছে। একটু বিস্মিত হয়ে বলল: গাড়ী এদিকে কোথায় যাচ্ছে?

—ঘোষালের বাড়ীতে। তাকে একটা দরকারি কথা বলে, তারপর বাড়ী যাব।

শুনে, বিশু অত্যন্ত বিরক্ত হলো। অভাবনীয়রূপে পুষ্পর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার যদিও বা একটা সম্ভাবনা দেখা দিল, পাগলের পাল্লায় পড়ে শেষ পর্য্যন্ত সেটা বুঝি ফস্‌কে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী এসে মিনতিদের, গাড়ী-বারান্দার তলায়

থামল। বিশুকেও নামতে হলো। মিঃ ঘোষের সঙ্গে অত্যন্ত বিরসমুখে অগ্রসর হলো সে।

কিন্তু ড্রইংরুমে ঢুকেই, মিঃ ঘোষ এমন অদ্ভুতভাবে থম্‌কে দাঁড়ালেন যে বিশুর বিরক্তির ভাবটা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হ'লো। সে সবিস্ময়ে দেখল, ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে একটি আরাম কেদারার ওপর আদুড় গায়ে মুদ্রিত চক্ষে শুয়ে রয়েছেন, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ একজন বিরাট পুরুষ। ভদ্রলোকটির রেখা-কলঙ্কিত ললাটের দিকে চাইলেই বোঝা যায়, বয়সে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ। কিন্তু তাঁর পেশীবহুল অপূর্ব্ব স্বাস্থ্যপূর্ণ বিরাট দেহটির দিকে তাকালেই আবার মোহ উপস্থিত হয়। তাঁর বয়সের প্রশ্নটা তখন গৌণ হয়ে যায়, মুগ্ধ বিস্ময়ে তখন শুধু তারিফ করতে ইচ্ছে হয় তাঁর বিরাট পুরুষত্বের।

বৃদ্ধের পিছনে দাঁড়িয়ে মিনতি তাঁর পাকা চুল তুলে দিচ্ছিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে মিঃ ঘোষ ও বিশুকে প্রবেশ করতে দেখে সে কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করল : একি, আসুন-আসুন·········

মিনতির কণ্ঠস্বর শুনেই সেই বিরাট পুরুষ চোখ চাইলেন। তারপর মিঃ ঘোষের উদ্দেশে বললেন : একি ঘোষ সাহেব যে। সঙ্গের উটি আবার কে ?

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শুনে বিশুর যেন হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হলো। ও রকম গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মোটা কণ্ঠস্বর সে পূর্ব্বে কখনও শোনেনি!

মিঃ ঘোষ ঘরে ঢুকেই সঙ্কুচিতভাবে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। এখন আবার প্রশ্ন শুনে তাঁর মাথাটি বুকের ওপর আরও কয়েক ইঞ্চি ঝুলে পড়ল। ব্যাপার দেখে বিশু ভড়কে গেল।

কক্ষ কাঁপিয়ে ভদ্রলোক আবার বললেন: কাটা সৈন্যের মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন,—বোস।

মি: ঘোষ তৎক্ষণাৎ একটা সোফার ওপর বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গেই আবার প্রশ্ন হলো: তোমার সঙ্গের উটি কে হে? তোমার সেই স্বর্গের দেবদূত-টুত্ কেউ নাকি?

শুনে, বিশুর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু মিনতি হেসে ফেললো। বলল: দাদু যেন কী! উনিই তো সেই বিশুবাবু। সেই যে, ওয়ার্ডেনকে ঠেঙ্গিয়ে জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন।

দাদু! ইনিই তবে মিনতির সেই পিতামহ, গোকুলনগরের জমীদার জনার্দ্দন ঘোষাল। বিশু বিমূঢ় বিস্ময়ে মিনতির দিকে তাকাল।

জনার্দ্দনবাবু বললেন: ওহে বিশুবাবু, এদিকে এস দেখি!

হুকুম শুনে বিশু আস্তে আস্তে তাঁর সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল। জনার্দ্দনবাবু তখন তাঁর আকর্ণ বিস্তৃত আরক্ত চক্ষু দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। সে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বিশু সহ্য করতে পারল না, তাড়াতাড়ি মুখ নীচু ক'রে অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

—কই, চেহারা দেখে তো সে সব কিছু মনে হয় না বাপু!—নিরীক্ষণ কার্য্য শেষ করে জনার্দ্দন বাবু বললেন: তোমার সম্বন্ধে অনেক কথাই মিনুর কাছে শুনেছি। গোটাকতক কথা যদি জিজ্ঞাসা করি, রাগ করবে না তো?

বিশু সলজ্জভাবে সজোরে মাথা নাড়ল।

—তুমি কেন, কিসের জন্যে দেশোদ্ধার করতে চাও?

অদ্ভুত প্রশ্ন। বিশু বিমূঢ়ভাবে একটা ঢোক গিলল।

—ওটা তোমার নেশা না পেশা?

বিশু এবার কথা কইবার চেষ্টা করল; কিন্তু তার কণ্ঠ দিয়ে অস্পষ্টভাবে একটা আজ্ঞে ছাড়া আর কিছুই বেরুল না।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো। জনার্দ্দনবাবু নিজের পাশের একটা কুশন কেদারা চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন। বিশু বসল।

—তুমি লীডার হ'তে চাও?

এ ধরণের প্রশ্ন বিশুকে পূর্ব্বে কেউ কখনও করেনি। সে অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

—হুটকোমী করা আর দেশোদ্ধার করার মধ্যে তফাৎ বোঝ?

বিশু এবারও কোন উত্তর দিতে পারল না।

—তুমি সত্যিই দেশকে ভালবাস? দেশের মঙ্গল বলতে কী বোঝ তুমি?

হঠাৎ মিনতি খুক্ ক'রে একটু কাশল। শব্দ শুনে বিশু বিমূঢ় ভাবে চোখ তুলল তার দিকে। মিনতি তখন তাড়াতাড়ি ইসারা ক'রে বলল প্রণাম করতে।

বিশু তখন অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতই উঠে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

জনার্দ্দনবাবু প্রণাম গ্রহণ করলেন। তারপর একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন: কী হলো? হঠাৎ প্রণাম ঠুকলে যে?

—হঠাৎ আবার কী! উত্তর দিল মিনতি: তোমার জেরার চোটে উনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন যে!

—তুমি ঘাবড়ে গিয়েছিলে নাকি হে? বিশুর দিকে তাকিয়ে জনার্দ্দন বাবু একটা ঘর-ফাটান হাসি হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে একটা মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

পরমুহূর্ত্তেই ঘরে ঢুকলেন মিঃ ঘোষাল। পিতাকে দেখে মিঃ ঘোষের মতো তিনিও একবার থম্‌কে দাঁড়ালেন। তারপর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন।

পুত্রকে পায়ের ওপর অবনত হ'তে দেখেই জনার্দ্দনবাবু বলে উঠ্‌লেন: এ হে হে, করলে কী হে মিষ্টার ঘোষাল! কাজটা একেবারে সাষ্টাঙ্গে করে ফেললে? তাও আবার মিষ্টার ঘোষের মতো একজন সাহেবের সুম্‌খে? কথাটা প্রকাশ পেলে সমাজে মুখ দেখাবে কেমন করে?

মিঃ ঘোষাল মুখ নীচু ক'রে একটু হেসে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কখন এলেন? আমরা তো কোন খবর পাইনি!

—খবর দেবার আর সময় পেলাম কই? কাল রাত্তিরে টেলিগ্রাম পেলাম স্বামীজীর অবস্থা খারাপ, তাই সকালেই বেরিয়ে পড়তে হ'লো। যাক্, এক্ষুনি আমাকে বেলুড় যেতে হ'বে। তোমার গাড়ীখানা একটু ধার দিতে পারবে? পেট্রলের দামটা অবশ্য নগদই পাবে!

মিঃ ঘোষাল পিতার কথার আর কোন উত্তর না দিয়ে সস্মিতমুখে মিঃ ঘোষের কাছে এগিয়ে গেলেন। বললেন: তুমি কত্‌ক্ষণ?

ওদিকে জনার্দ্দনবাবু মিনতির দিকে ফিরে চাপা গলায় ধমক দিলেন: এই শালী! ওকে গিলে খাবি নাকি? অমন হাঁ ক'রে চেয়ে আছিস্ কেন? যা, আমার চাদরটা নিয়ে আয়!

মিনতি সত্যই এতক্ষণ বিশুর দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ পিতামহের মন্তব্য শুনে, অস্ফুটস্বরে একটা যাঃ বলেই দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিশু পূর্ব্বের মতো অবনতমুখেই বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরেই মিনতি একটা সিল্কের চাদর ও রূপো-বাঁধন এক গাছা লাঠি এনে জনার্দ্দনবাবুর হাতে দিল। তিনি তখন চাদরটা কাঁধে ফেলে, লাঠির ওপর ভর দিয়ে, তাঁর সেই বিরাট সাড়ে ছ' ফুট দেহ নিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন! তারপর পুত্রের উদ্দেশে বজ্রগর্জ্জনে বললেন: ওহে মিষ্টার ঘোষাল, তোমাদের এই বিশু ছেলেটি কিন্তু মন্দ নয়! তোমার এখানে আর যে সব ছোকরা-রা আসে, ও ঠিক্ তাদের মতো মেনীমুখোও নয়—সবজান্তাও নয়। ছেলেটি বেশ বিনয়ী। অবশ্য, মিনুদিদি আর একটু বাড়িয়ে বলেছিল,—এই বলে, তিনি মিনতির দিকে চেয়ে অট্টহাসি হাসলেন।

তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য সকলেও,—অবশ্য বিশু ছাড়া, ভদ্রভাবে একটু হাসলেন। কিন্তু মিনতির মুখ লাল হ'য়ে উঠল। সে পিতামহের দিকে চেয়ে ভীষণ ভাবে একটা ভ্রূকুটি করল। ফলে, জনার্দ্দনবাবু আর একবার ছাদ্-ফাটান হাসি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিশু সবিস্ময়ে দেখল, গোকুল নগরের লক্ষপতি জমীদার আদুড় গায়ে, সামান্য একটা চাদর মাত্র কাঁধে ফেলে অকুণ্ঠিতচিত্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন্।

জনার্দ্দনবাবু বেরিয়ে যেতেই মিনতি অলক্ষ্যে একবার বিশুর দিকে

তাকাল। বোঝবার চেষ্টা করল, পিতামহের রসিকতার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটা সে ধরতে পেরেছে কিনা।

বিশু তখনও মুগ্ধ-বিস্ময়ে জনার্দ্দনবাবুর গমন পথের দিকে তাকিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে মিনতির দিকে ফিরে বলল: আশ্চর্য্য! পাঁচ সিকে দামের একটা তালতলার চটি পরেই বেরিয়ে গেলেন।

শুনে, মিনতি নিশ্চিন্ত হ'লো। কিন্তু একটু যেন ক্ষুণ্ণও হ'লো। অপ্রতিভ হ'য়ে বলল: দাদুর কাছ থেকে আপনি আজ যে complement পেলেন, একমাত্র রজতদা' ছাড়া ওরকম প্রশংসা কিন্তু আর কেউ পায়নি।

রজতের নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বিশুর মুখের হাসি কাষ্ঠ-হাসিতে রূপান্তরিত হ'লো। কথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বলল: আশ্চর্য্য! এত বয়স হ'য়েছে, তবুও কী মাসল্......

—শুধু তাই নয়! মিনতি বলল: ওরকম strong principle-এর লোকও সাধারণত দেখা যায় না। আমাকে ছেড়ে থাকতে ওঁর সত্যিই খুব কষ্ট হয়, তবুও আমাদের আচার-ব্যবহার ভাল লাগে না বলে, উনি পারতপক্ষে কলকাতায় আসেন না। তা ছাড়া দেশকেও যে উনি কতখানি ভালবাসেন, কল্পনা করা যায় না।

—কী রকম? বিশু একটু উৎসাহিত হ'য়ে উঠল।

—কিন্তু, আপনাদের সঙ্গে ওঁর আদর্শের অনেক তফাৎ। দেশ বলতে উনি শুধু খানিকটা মাটি আর গোটাকতক বিলেত-ফেরৎ politicianকেই বোঝেন না। ওঁর আদর্শ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ...

বাধা পড়ল। মিঃ ঘোষাল এতক্ষণ অদূরে বসে মিঃ ঘোষের সঙ্গে

নিম্নস্বরে কথা কইছিলেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: মিনু, বিশু, তোমরা এখানে বসে গল্প ক'রো,—আমরা একটু অফিস ঘরে যাচ্ছি।

মিঃ ঘোষও বিশুর উদ্দেশে বললেন: আর একটুখানি, বেশী দেরি হবে না আমার!

তাঁরা ঘর থেকে চলে যেতেই বিশুর নতুন ক'রে মনে পড়ল মিঃ ঘোষের কথা। তাড়াতাড়ি মিনতিকে জিজ্ঞাসা করল: মিষ্টার ঘোষের আজকাল কী হ'য়েছে বলুন তো?

মিনতি ফিক্ ক'রে একটু হাসল। বলল: উনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, এই মাসের মধ্যে, যেমন করেই হোক, লিলি-পুষির বিয়ে দেবেনই!

বিশু আগ্রহভরে বলল: কিন্তু কেন? এতদিনকার আধুনিকতা ছেড়ে হঠাৎ এমন সনাতনপন্থী হ'য়ে উঠলেন কেন?

মিনতি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারল না। মুখ নীচু ক'রে কিছুক্ষণ সে নিজের শাড়ীর জৌলুষ পরীক্ষা করল। তারপর একটু বিব্রতভাবে বলল: আপনাকে বলতে পারি, যদি কাউকে না বলেন!

বিশু আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: আপনি বারণ করছেন, বলবো কেন!

মিনতি আরও কিছুক্ষণ নিজের শাড়ীটি নিয়ে নাড়াচাড়া করল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল: একটু বসুন, আমি এক্ষুনি আসছি। বরং সেট্‌টা খুলে দি', একটু গান-টান শুনুন! এই বলে রেডিয়ো সেট্‌টা খুলে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আঠার

রেডিয়োতে স্বদেশী গান হচ্ছিল। বিশু তন্ময় হ'য়ে শুনছিল। হঠাৎ একটা মৃদু সুগন্ধে চঞ্চল হ'য়ে সে ফিরে দেখল মিনতি সহাস্য মুখে তার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—এই বুঝি আপনার এক্ষুনি আসা! একটু হেসে বিশু আবার রেডিয়োর দিকে মনোনিবেশ করল।

মিনতি ঘুরে এসে বিশুর সামনে বসল—কিন্তু যেন অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে। ইতিমধ্যে সে নতুন ক'রে সেজে এসেছিল। কাপড় বদলে, রং মিলিয়ে জামা পরে, এবং সাধারণত যা করেনা,—স্নো-পাউডার ঘষে ঘষে মুখখানাকে টকটকে লাল ক'রে তুলেছিল। কিন্তু বিশুর তখন ও সব লক্ষ্য করবার মতো মনের অবস্থা ছিল না; সে তখন তন্ময় হ'য়ে স্বদেশী গান শুনছিল।

কিছুক্ষণ পরে রেডিয়ো-নকীব হেঁকে বলল: Calcutta Station Calling, মিস্ আইভিলতার গান এইখানেই শেষ হ'লো। এইবার বেতার নাটুকে-দল শ্রীযুত মন্মথ রায় বিরচিত 'কারাগার' অভিনয় করবেন। নাটকখানি পরিচালনা করেছেন......

এই সময় বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকল রূপোর ট্রেতে ক'রে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে।

—একি, এতক্ষণ পরে যে?

মিনতি মৃদু হেসে উত্তর দিল: দাদুর জন্যে। তিনি কারুর চা খাওয়া পছন্দ করেন না! আমরা কেউ তাঁর সুমুখে এ সব খাই না!

বিশুও তাড়াতাড়ি বলল: আমিও তো পছন্দ করি না।

বিশুর দিকে এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিয়ে মুচ্‌কে হেসে মিনতি বলল: তা হোক, কেউ তো আর দেখ্‌তে আসছে না!

পেয়ালাটা হাতে নিয়ে বিশু বলল: তার মানে? আমি কি লোক দেখাবার জন্যে চা খাই না নাকি?

—ভয় নেই!—মুখ নীচু ক'রে মৃদু স্বরে মিনতি বলল: পুষি জান্‌তে পারবে না!

ঠক্ ক'রে পেয়ালাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বিশু উত্তেজিতভাবে বলে উঠল: এ সব অত্যন্ত অন্যায় কথা! আমার চা খাওয়ার সঙ্গে তাঁর কী সম্বন্ধ?

—সম্বন্ধ নেই নাকি? ওঃ—

মিনতির রকম দেখে বিশু আরও উত্তেজিত হ'য়ে কী বলতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় রেডিয়োর বসুদেব বলে উঠল: তোমাদের এই নব জীবনে আশীর্ব্বাদ করি......

শুনে, দু'জনেই চম্‌কে উঠল।

রেডিয়োর বসুদেব বলে চলল:

"গম্যতামর্থলাভায় ক্ষেমায় বিজয়ায় চ
শত্রুপক্ষ নিরাশায় পুনরাগমনায় চ॥"

বিশু সংস্কৃত ভাল বোঝে না। কিন্তু, তবুও তার গায় কাঁটা দিয়ে উঠল।

মিনতি বলল: কই, চা যে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে! সত্যিই, খাবেন না নাকি?

অগত্যা বিশু পেয়ালাটা আবার টেনে নিল। তারপর চা পান শেষ ক'রে গম্ভীরভাবে বলল: জোর ক'রে কাউকে আদর্শ চ্যুতি করা উচিৎ নয়।

মিনতিও গম্ভীরভাবে বলল: আমিও তাই ভাবছি! পুষির কাছে মুখ দেখাব কেমন করে।

—আঃ! অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে বিশু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপরই আবার বসে পড়ে বলল: এ সব ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর কী সম্বন্ধ? তিনি আমার কে?—বিশু সক্রোধে ঘুরে বসে রেডিয়ো সেটের দিকে তাকাল।

মিনতি কিন্তু মুখ নীচু ক'রে হাসতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বলল: কই, ও:দের বিয়ের সম্বন্ধে আর কিছু জানতে চাইলেন না যে?

—কাদের বিয়ে?

—লিলি পুষির!

—ওঃ হ্যাঁ, কী ব্যাপার বলুন তো?

—বলতে সাহস হচ্ছে না যে!—ঘাড় বেঁকিয়ে, চোখ মট্‌কে

মিনতি বলল : পুষির অন্য জায়গায় বিয়ে হ'বে,—এ শুনতে আপনার ভাল লাগবে কী !

বিশু এবার আর বিরক্ত হ'তে পারল না ! অসহায়ের মতো বলল : নাঃ, you are hopeless···

—আচ্ছা আচ্ছা, বলছি, আর রাগ করতে হ'বে না······

—এ সব কিন্তু সত্যিই অত্যন্ত অন্যায়। বিশু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল : আপনি কেন আমাকে নিয়ে ও রকম করছেন ! পুষ্প দেবী যে রজত বাবুর সঙ্গে Engaged এ তো সকলেই জানে। কিন্তু আপনি··· যাক্ গে, কী ব্যাপার বলুন !

মিনতি কিছুক্ষণ মুখ নীচু ক'রে ভাবল ! তারপর আস্তে আস্তে বলল : কিন্তু, কাউকে বলবেন না যেন ! মিষ্টার ঘোষের ধারণা, লিলি পুষি তাঁর দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার ক'রে বেড়াচ্ছে !

বিশু আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল : হঠাৎ এ রকম ধারণা হওয়ার কারণ ?

—সব কথা আমরা জানতে না পারলেও, দু' একটা কথা যা শুনেছি, সে সব কথাও কিন্তু ভাল নয় ! পুষিদের বাড়ীতে যেদিন সকালে সার্চ্চ হয়, তার আগের দিন রাত্তির দুটোর সময় কে নাকি তাকে ফোন করেছিল ! ফোন ধরেছিল ওদের ম্যানেজার। নাম জিজ্ঞাসা করাতে লোকটা নাকি আমার বাবার নাম করেছিল। কিন্তু পরে জানা গেল আমার বাবা ফোন করেন নি ! মিঃ ঘোষ তখন ভাবলেন, বুঝি রজতদাই লুকিয়ে ফোন করেছিল। কিন্তু সন্ধান নিয়ে জানা গেল রজতদা সেদিন কলকাতাতেই ছিল না।

—মিঃ ঘোষ পুষ্প দেবীকে জিজ্ঞাসা করেন নি?

—নিজে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা করেন নি,—আমাকে দিয়ে করিয়েছিলেন।

—কী বললেন তিনি? বিশু উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠল!

—পুষি বলছে, লোকটা একটা বদমাইস্,—সে চেনে না। হ'তে পারে! এক class লোক আছে যারা টেলিফোনের নম্বর দেখে দেখে ওই রকম বদমাইসী ক'রে মেয়েদের সঙ্গে।

শুনে, বিশু নিশ্চিন্ত হলো। বলল: যাক্ গে, এবার লিলির ব্যাপার বলুন!

মিনতি হাসল। বলল: লিলির কাহিনী আরও মজার! সেদিন ওদের বাড়ী সার্চ্চ করতে গিয়ে পুলিশ আর কিছু না পেয়ে শেষে লিলির বাক্স থেকে একশ' সতের খানা চিঠি আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে!

—কিসের চিঠি?

উত্তর দিতে গিয়ে মিনতির মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠল। শেষে বলল: চিঠিগুলো Love letters, লিলিকেই লেখা হয়েছে!

বিশু সবিস্ময়ে বলল: লিলি Engaged তা তো জানতাম না!

—Engaged নয় বলেই জানতে পারেন নি।

—তবে কে লিখলে চিঠি?

—বলছি! কিন্তু তার আগে বলুন তো, মেয়েদের মধ্যে লিলির সকলের চেয়ে বড় বন্ধু কে?

বিশু ভ্রূকুঞ্চিত করে চিন্তিত হ'লো। বলল: মনে হয় সুকুমারের বোন, প্রণতি......

মিনতি ঘাড় নেড়ে বলল : ঠিক্। চিঠিগুলো তারই লেখা।

—সেকি ?

মিনতি হেসে বলল : এ কথা তো আমরা সকলেই জানি। ওরা অনেকদিন থেকে ওই রকম ছেলে মানুষী করে আসছে। প্রণতির বাক্স খুঁজলেও লিলির লেখা অমন হাজারখানা চিঠি পাবেন। সত্যি, এমন বিশ্রীভাবে চিঠি লেখে ওরা……কিন্তু মিঃ ঘোষ কথাটাকে বিশ্বাস করতে চাইছেন না !

এই সময় রেডিয়োর বসুদেব বলে উঠল……যখন জগতে ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন দুষ্কৃতদের দমনের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য যুগে যুগে ভগবান জন্মগ্রহণ করেন ! আজ জগতের সেই দুর্দ্দিন !

বিশুকে গম্ভীরভাবে বসে থাকতে দেখে মিনতি বলল : চুপ ক'রে রইলেন যে ? কথাটা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না নাকি ?

—চুপ করুন, শুনতে দিন।

রেডিয়োর অত্যাচারিত যাদব নরনারীগণ এই সময় কোরাসে গান ধরল :—

অচেতন নারায়ণ ? কভু নয়, কভু নয় !
এস আজ মানবক্ ! গেয়ে চল জয় জয় ॥
প্রলয়-পয়োধি জলে অনাগত দেবতা গো—
কোথা যাবে ভেসে তুমি, ধরার মাটিতে জাগো—
শঙ্খের নাদে দাও পৃথিবীকে বরাভয়।

নৃত্যতি কাল নিশা, রাহুভীত সূর্য্য যে—
ধর্ম্মের হিয়া কাঁপে, বাজে পাপ তূর্য্য যে—
যাত্রীরা পথহারা, বল আর কত সয় ?
মৃত্যুর ইঙ্গিতে, হত্যার সঙ্গীতে,
পাতকীর কোলাহলে সাধু গেছে কোন ভিতে !
মানবের নাট্শালে, দানবের অভিনয় !
যুগে যুগে তাই মোরা গাই তব আগমনী—
যুগে যুগে ধরা শোনে তোমারি চরণধ্বনি—
যুগে যুগে আসিয়াছ, এস ওহে জ্যোতির্ম্ময় ॥

(—হেমেন্দ্র কুমার রায়)

বিশুর উৎকট নীরবতা সহ্য করতে না পেরে মিনতি আবার বলল : কী হ'লো আপনার ? ভাবছেন কী...বলেই থেমে গেল। হঠাৎ তার নজর পড়ল ঘরের দরজার দিকে। আধ্-খোলা দরজাটার বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন জনার্দ্দনবাবু। চোখের পাতা দুটি তাঁর অর্দ্ধ মুদ্রিত। দৃষ্টিতেও কেমন যেন একটা ঘোলাটে.ভাব্। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো স্তিমিত দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছিলেন বিশুর দিকে।

বিশু কিন্তু জনার্দ্দনবাবুর অস্তিত্বের কথা জানতে পারলনা। সে বিস্ফারিত চক্ষে রেডিয়ো সেট্টির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর সেইদিকে চেয়েই বিচলিতস্বরে বলে উঠল : ভাবছি ওই গানটার কথা ! এ দেশের ভাগ্য-বিধাতা কি সত্যই অচেতন নন্। সেই নিদ্রিত নারায়ণের মোহনিদ্রা সত্যই কি একদিন ভাঙ্গবে ? সত্যই কি একদিন সেই অনাগত দেবতার শঙ্খধ্বনি শুনে এ দেশের

পথহারা লোকগুলো পথের সন্ধান পাবে? যুগে যুগে তিনি এসেছেন,—এ যুগেও কি তিনি আসবেন? এ দেশের অভিশপ্ত সূর্য্য কি কখনও রাহুমুক্ত হবে?

বিশুর ব্যাপার দেখে মিনতি উৎকণ্ঠিত হ'য়ে একবার পিতামহের দিকে তাকাল। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলনা। তিনি পূর্ব্বের মতোই তন্দ্রাতুর দৃষ্টিতে বিশুর দিকে চেয়ে ছিলেন।

বিশু হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর হাতদুটি পিছন দিকে মুষ্টিবদ্ধ ক'রে, অবনত মুখে, অত্যন্ত অস্থির ভাবে পায়চারী আরম্ভ করল। মিনতি অভিভূতের মতো তার দিকে চেয়ে রইল, আর কোন কথা কইতে ভরসা করল না।—

রেডিয়োর কণ্ঠ এই সময় বলে উঠল:······এই নরক থেকে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমার ভগবতী মাতা, মুমূর্ষু দুধের শিশু ঐ রঞ্জনকে তার স্তন্য হ'তে বঞ্চিত করে, সেই স্তন্যের শেষ বিন্দুটুকু পর্য্যন্ত আমায় পান করিয়ে, ঐ শিশু দধীচি রঞ্জনকে নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। আজ আমি শুধু বেঁচে নেই, আজ আমি পাহাড় চূর্ণ করতে পারি। মাতৃস্তন্যের অমোঘ শক্তি আমার বাহুতে। এই বাহুতেই বহন করি জাগ্রত ভগবান......

—ওঃ! যন্ত্রনাসূচক একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে বিশু আবার চেয়ারে বসে পড়ল। তার সুমুখে বসে মিনতি যে আকুল আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে, সে কথা তার একবারও মনে পড়ল না। কী যেন একটা অদ্ভুত আকর্ষণে সে তখন বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া একটা রহস্যময় জগতে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছিল। দূর থেকে ভেসে

আসা অস্ফুট শঙ্খধ্বনির মতো অদ্ভুত উত্তেজনাপূর্ণ সঙ্গীত ঝঙ্কারে তার সমস্ত শরীর-মন যেন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছিল মুহুর্মুহুঃ। বর্ত্তমানকে নিঃশেষে বিস্মৃত হ'য়ে সে অবাক বিস্ময়ে চেয়েছিল অতীতের দিকে।

রেডিয়োর ধরিত্রী গান ধরল :

তিমির বিদারি, অলক বিহারী
কৃষ্ণ মুরারী আগত ঐ!

* *

বিশ্ব ভরি ওঠে, স্তব নমো নমঃ
অরির পুরী মাঝে এল অরিন্দম।
ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরীজন
অন্ধ-কারায় এল, বন্ধ বিমোচন।
ধরি অজানা পথ, আসিল অনাগত
জাগিয়া ব্যথাহত, ডাকে মাভৈঃ॥

(কাজী নজরুল ইস্‌লাম)

ভৈরবী রাগের বিষাদময় আবহাওয়ার মধ্যে বিশুর প্রাণটা হঠাৎ যেন বাণবিদ্ধ পশুর মতো আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠল। সে আবার পায়চারী আরম্ভ করল অস্থির ভাবে। তারপর উন্মত্তের মতো দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়েই, বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চোখোচোখি হ'তেই জনার্দ্দনবাবু সস্নেহে বললেন : তুমি বাড়ী যাবেনা বিশু?

পিতার সাড়া পেয়ে মিঃ ঘোষালও এ ঘরে এলেন। বিশুকে

দেখে তিনিও বলে উঠ্লেন : ইস্, আমার একেবারেই খেয়াল ছিলনা। ঘোষ যে অনেকক্ষণ চলে গেছে হে! যাও যাও বাড়ী যাও, অনেক রাত হ'য়ে গেছে।

বিশু নিজের ঠোঁটের ওপর একবার জিভ্ বুলিয়ে নিল। তারপর সভয়ে রেডিয়ো সেট্‌টার দিকে তাকিয়ে অস্পষ্টস্বরে বলল : যাচ্ছি, যাচ্ছি, আর একটু...

সঙ্গে সঙ্গে রেডিয়োর দেবকী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল : কারাগারে আজ দেশের যত ধর্ম্মাত্মা, যত পুণ্যাত্মা, যত মহাত্মা! কারাগারে ভগবান আজ স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেছেন। কারাগার আজ পুণ্য তীর্থ!... ঐ লৌহদ্বার আর আমার পথরোধ করতে পারবে না। আমি আজ তাঁর জননী যিনি দুষ্কৃতদের দমনের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে থাকেন......

– এই পর্য্যন্ত শুনেই বিশু সন্ত্রস্তভাবে একবার জনার্দ্দনবাবুর দিকে তাকাল। তারপর কারুকে কোনরূপ সম্ভাষণ না করে,—সামান্য একটা নমস্কার পর্য্যন্ত না ক'রেই সে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উনিশ

বিশুর মানসিক বৈকল্যের আসল কারণটা যে ভয়, সেটা সে বুঝতে পারল পরদিন সকালে। একটানা একটা লম্বা ঘুম দেবার ফলে—মেজাজ তার কথঞ্চিৎ শান্ত হ'য়ে এসেছিল। সে ভাবতে আরম্ভ করল: রজতের নির্দ্দেশে [illegible]স যে মহাপাপ করতে উদ্যত হয়েছে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কী! জনার্দ্দনবাবুকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ তার হয়নি, সত্য! কিন্তু তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের যতটুকু পরিচয় সে পেয়েছে, তাতেই তো সে মুগ্ধ হয়ে গেছে। এই লোকের সর্ব্বনাশ করবে সে রজতের স্বার্থের জন্যে। কাজটা গোপনে সম্পন্ন করে রাজার আইনকে হয়তো সে ফাঁকি দিতে পারবে। কিন্তু নিজের বিবেক! তার কাছে কী জবাবদিহি করবে সে!

নিজের জীবনের একটা ঘটনাও মনে পড়ে গেল তার। বয়স তখন তার সম্ভবতঃ আঠার-উনিশ। গ্রাম ছেড়ে সদ্য সে এসে আশ্রয় নিয়েছে কলকাতার হোষ্টেলে, কলেজে পড়বার জন্যে। সেই সময় একদিন সে, নিছক কৌতূহল-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যেই একটা খারাপ জায়গায় গিয়েছিল। কাজটা অবশ্য সে করেছিল সহপাঠিদের দেখাদেখি। কিন্তু নিজে সে সঙ্গী-সাথী অর্থাৎ সাক্ষী-সাবুদ

কাউকেই সঙ্গে নেয় নি! অথচ কয়েকদিন পরে গুড-ফ্রাইডের ছুটিতে যখন সে বাড়ী গেল, তখন তার মা কথা-প্রসঙ্গে হঠাৎ একদিন বলে বসলেন: সর্ব্বদা সৎপথে থাকবার চেষ্টা করিস বাবা! জেনে রাখিস, পাপ আর পারা কখনও চাপা থাকে না!

শুনে, সে চমকে উঠেছিল। ঘটনাটা, মাত্র কয়েক মিনিটের একটা গোপন ইতিহাস! সেখানে সে গিয়েছিল যেমন ভয়ে ভয়ে পালিয়েও এসেছিল ঠিক তেমনি ভয়ে ভয়ে। তার সহপাঠিরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে ও সব জায়গায় যেত, ইচ্ছা থাকলেও, সে উদ্দেশ্য তার সফল হয়নি সাহসের অভাবে। তবে, পাপ ও পারার কথা ওঠে কেন! এ ব্যাপার তো কাক-পক্ষীরও জানবার কথা নয়। সভয়ে সে জিজ্ঞাসা করেছিল: এ কথা কেন বলছো মা?

মা একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন: এবার তোর রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছে, তুই নিশ্চয়ই কিছু একটা অন্যায় করে এসেছিস্।

অদ্ভুত! সে এত সাবধান অথচ তার নিজেরই ব্যবহারের বৈচিত্র্যে ধরা পড়ল সে।

জীবনের চলার পথের প্রথম দিকেই বিশুর এ শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল।

—আপনাকে টেলিফোনে ডাকছে! হোষ্টেলের দারোয়ান এসে খবর দিল।

—কে?

—একজন স্ত্রীলোক

পুষ্প নয় তো! বিশু তাড়াতাড়ি অফিস ঘরে গিয়ে ফোন ধরল: হ্যাল্লো?

—কে বিশুবাবু? আমি মিনতি! আপনাকে এক্ষুনি একবার আসতে হবে আমাদের এখানে! আজ এইখানেই খাবেন আপনি!

—কিন্তু আমার তো……

—কোন কিন্তু চলবে না! শুধু আমি নই! দাদু আপনাকে নেমন্তন্ন করছেন! আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই তিনি আজ দেশে যাওয়া বন্ধ রাখলেন!

স্বয়ং জানার্দ্দনবাবু তাকে নেমন্তন্ন করছেন! ব্যাপার কী! বিশু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

মিনতি বাইরেই ছিল। বিশু পৌছতেই বলল: কাল আপনার কী হয়েছিল বলুন তো? একটা অতি-সাধারণ বাংলা নাটক,—তারই বক্তৃতা শুনে বেসামাল হ'য়ে পড়লেন?

বিশু উত্তর দিল না। গতকাল 'কারাগার' অভিনয় শুনে সে যে কী করেছিল তা সঠিকভাবে মনে না পড়লেও, নিজের ভাবপ্রবণতার কথাটাও তার অজানা ছিল না। তাই নিজের দৌর্ব্বল্যের কথা স্মরণ করে মনে মনে যেমন সে সঙ্কোচ অনুভব করল তেমনি আবার মিনতির মন্তব্য শুনে, ক্ষুণ্ণ হওয়ার পরিবর্ত্তে হ'য়ে উঠল ক্রুদ্ধ!

মিনতি আবার বলল: আপনার পাগলামী কিন্তু দাদুকে একেবারে যাদু করে ফেলেছে! আজ সকাল বেলাতেই আমাকে ডেকে বললেন: কাল সারা রাত্তির আমি ঘুমোতে পারিনি,—কেবল ওই ছেলেটির কথা ভেবেছি! ওর বিদ্যের দম্ভ আছে কি না জানিনা, কিন্তু অনুভূতি আছে। এ বস্তু যার আছে, ইচ্ছে করলে সে ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত মুঠোর

মধ্যে পুরতে পারে! আমার আশা বোধহয় এতদিনে পূর্ণ হলো! ওকে একবার ডাক্ তো দিদি......

—কোথায় তিনি ?

—ড্রইং-রুমে! আসুন না—

জনার্দ্দনবাবু পূর্ব্বের মতোই আরাম-কেদারায় শুয়ে ছিলেন। বিশুকে দেখেই বললেন : বসো। মিনু বলছিল, স্বদেশী ভূতটা নাকি তোমার কাঁধ থেকে নেমে গেছে। কথাটা সত্যি নাকি ?

বিশু বুঝতে পারল না হঠাৎ এ ধরণের প্রশ্ন করবার তাৎপর্য্য কী। একটু ইতস্তত করে সে বলল : আমি কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছি!

—হেতু ? কংগ্রেস ছেড়ে কামিনিষ্ট হয়েছ, নাকি ?

—কামিনিষ্ট ?

মিনতি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠল। বলল : বুঝতে পারছেন না ? কম্যুনিষ্টদেরকে দাদু কামিনিষ্ট বলেন।

বিশু কিন্তু হাসল না। সোজা জনার্দ্দনবাবুর দিকে তাকিয়ে সে বলল : না, সে দুর্ভাগ্য এখনও আমার হয়নি।

—দুর্ভাগ্য কেন বলছ বাপু? কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখদুটি বড় বড় করে জনার্দ্দনবাবু বললেন : আজকালকার শিক্ষিত লোক মাত্রেই তো মার্কস্‌কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফিলসফার বলে থাকেন!

—তা হবে।

—দেখলি! জনার্দ্দনবাবু মিনতির দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বললেন : আমি বলেছিলাম কি না?

পৌত্রী-পিতামহের মধ্যে কী বলাবলি হয়েছিল জানতে না পারলেও

বিশু অনুমান করল, তার আদর্শবাদের সততা সম্বন্ধে জনার্দ্দনবাবু পূর্ব্বাবধিই সহানুভূতিসম্পন্ন। সে তখন মুখখানাকে আরও গম্ভীর করে বসে রইল।

জনার্দ্দনবাবু অতঃপর বিশুর উদ্দেশে বললেন: তুমি তো শুধু তা হ'বে বলেই থেমে গেলে। কিন্তু ও কথা যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করতো, তাহলে, আমি কী জবাব দিতাম জান?

—জানি! উত্তর দিল মিনতি: তুমি বলতে, যে জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা বেদ উপনিষদ রচনা করেছিলেন, যাঁরা একদিন সারা বিশ্বের লোককে ডেকে বলেছিলেন: মা গৃধ! অর্থাৎ লোভ করোনা, অর্থই অনর্থের মূল! সেই জাতের পক্ষে আজ মার্কস্‌বাদ নিয়ে মেতে ওঠাটা শুধু কলঙ্কের কথাই নয়, এর দ্বারা এ জাতের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর ইঙ্গিতটাই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে!

—কথাটা মিথ্যে নাকি? মিনতির কথার ভঙ্গি দেখে জনার্দ্দনবাবু যেন একটু বিরক্ত হ'লেন।

মিনতি বলল: সত্য মিথ্যের কথা জানিনা। কিন্তু, সেবার তোমার এই রকম কথার উত্তরে রজতদা যে যুক্তি দেখিয়েছিল, তাও তো তুমি উড়িয়ে দিতে পারনি!

বিশু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল: সে আবার কী যুক্তি দেখিয়েছিল?

মিনতি বলল: রজতদা বলেন, কোন দুর্ব্বল জাতি যদি পরের আদর্শ নিয়েও বড় হ'য়ে উঠতে পারে তাতে তো লজ্জার কিছু নেই! উদাহরণ দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন: মার্কস্ ছিলেন একজন জার্মান

ইহুদি। কিন্তু তাঁর আদর্শ ধার করে রাশিয়া কি আজ ঠকেছে? তিনি বলেন, জাতিভেদ্ দেশভেদের দোহাই পেড়ে যারা সত্যকে এড়িয়ে চলতে চায়, তারা শুধু দেশেরই কলঙ্ক নয়, তারা সমগ্র মানব-সমাজের শত্রু!

—এ ধরণের কথা শুধু আপনার রজতদার মতো লোকই বলতে পারে। বিশু রূঢ়স্বরে বলে উঠল: সে যদি সত্যিই দেশকে ভালবাসত, তাহলে বুঝতো, ধার করা Poliltics আউড়ে শুধু নিজেরই স্বার্থসিদ্ধি করা যায়,—দেশের মঙ্গল করা যায় না। ভারতবর্ষ যদি কখনও স্বাধীন হয়, সে তার নিজের পথেই হ'বে! বুঝলেন?

—কী সে পথ?

—রক্তপাতের পথও নয়, গোপনে দল পাকিয়ে গুপ্ত হত্যার পথও নয়! ভারতবর্ষ মুনি-ঋষিদের দেশ। ভগবান যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন এ দেশে। তাই, এদেশের কল্যাণ সম্ভব শুধু সেই পথেই, যার কল্পনা,—আপনার রজতদা তো ছার, একমাত্র মহাত্মা গান্ধী ছাড়া এ যুগের কোন জাত, কোন Politician-ই করতে পারেনি!

—কিন্তু, সেটা কী?

—তাও বলে দিতে হ'বে? বিশু যেন গর্জ্জন ক'রে উঠল: Non-violence, Non-co-operation কথাগুলো শোনেন নি কখনও? রজতদার মতো statesman-এর গুণমুগ্ধ আপনি,—আর Constructive tolerant statesmanship কথাটার মানে বোঝেন না?

বিশুর উষ্মা দেখে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হয়েছিল মিনতি। অন্য ক্ষেত্র হ'লে সে নিশ্চয়ই পরের ঝগড়ায় কান দিয়ে অকারণ অশান্তির সৃষ্টি করতে দিত না। কিন্তু বিশু যে অলক্ষ্যে বসে রজতের প্রতি কটাক্ষ করবে এও যেন তার সহ্য হচ্ছিল না। তাই, পূর্ব্বের মতো সংযতস্বরেই সে আবার প্রশ্ন করল: এতই যদি আপনি গান্ধীজীর ভক্ত, তাহলে কংগ্রেস ছাড়লেন কেন?

—কারণ আমি বাঙ্গালী!—বিশু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল: কংগ্রেস High Command যদি বাঙ্গলাদেশের সঙ্গে সৎ-মার মতো ব্যবহার না করতো, তাহলে আমি নিশ্চয়ই কংগ্রেস ছাড়তাম না।

—সৎ-মার মতো ব্যবহার!

—নিশ্চয়ই।

—যা বলেছ ভায়া! জনার্দ্দনবাবু এতক্ষণ ব্যাপারটা উপভোগ করছিলেন। বললেন: Bihar for Biharies, Gujrat for Gujraties but Bengal for all. এ সব কথা আমাদের কংগ্রেসেরই একজন চাঁই বলেছিলেন না?

—হ্যাঁ! বিশু বলল: আর মজা হচ্ছে এই যে, ভদ্রলোকটি মানুষ হয়েছিলেন এই বাঙ্গলা দেশেই! উঃ! আমাদের অবস্থাটা একবার ভাবুন তো? ১৯৩৫ সালের যে দিন থেকে এ দেশে Provincial Autonomy-র সৃষ্টি হয়েছে সেইদিন থেকে দুর্দ্দশা আরম্ভ হ'য়েছে বাঙ্গলা দেশের! আমাদের অপরাধ, আমরা এ দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং কংগ্রেসের ভক্ত! কিন্তু আমরা কি শুধু মার খেতেই জন্মেছি? বাঙ্গলা দেশে One-Party Government-এর কৃপায়

আমরা তো এমনিতেই আধমরা হ'য়ে আছি! এই সময় কংগ্রেস কোথায় আমাদের জন্যে লড়বে, সহানুভূতি দেখাবে, তা নয়, Bihar for Biharies·· ···

—কিন্তু, আমাদেরও অনেক দোষ আছে ভায়া!—জনার্দ্দনবাবু বললেন: বাঙ্গলা দেশের One-Party Government আজ যা খুশী তাই করতে ভরসা পাচ্ছে কেন, সেটাও তো ভেবে দেখতে হবে!

—নিশ্চয়ই! চোখ মুখ লাল করে বিশু বলল: যে অত্যাচার ক'রে সে অবশ্যই অপরাধী! কিন্তু তার চাইতেও বড় অপরাধী সে যে সেই অত্যাচার সহ্য ক'রে। মহাত্মাজী আমাদের অহিংসার বাণী শোনাচ্ছেন। কিন্তু তিনি এটুকু বোঝেন না যে, মহাত্মার ফিলসফি বোঝা সম্ভব শুধু মহাত্মাদের পক্ষেই! অহিংসা আর কাপুরুষতা যে এক জিনিষ নয় এ কথাটা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে আজ পর্য্যন্ত কটা কংগ্রেসী এগিয়ে এসেছে?

—বেড়ে বলেছ ভায়া! জনার্দ্দনবাবু উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন।

বিশু আবার বলল: একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞা ক'রে দেবব্রত একদিন ভীষ্ম হয়েছিলেন। মহাপুরুষ হিসেবে আমরা আজও তাঁর নাম স্মরণ করি। কিন্তু তাঁর মাহাত্ম্যের দ্বারা কুরুক্ষেত্রের কতটুকু উপকার হ'য়েছিল শুনি? কংগ্রেস আজ পর্য্যন্ত করেছে কী! এদের আছে শুধু বড় বড় বক্তৃতাবাজীর জৌলুস, দীর্ঘসূত্রতা আর লাট্-বেলাটের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করা! সঙ্গে সঙ্গে চেয়ে দেখুন মুসলীম্ লীগের দিকে! মাত্র সেদিন গড়ে উঠল দলটা। কিন্তু কী অদ্ভুত প্রতিভা ওদের! কত প্রচণ্ড ওদের

কর্ম্মতৎপরতা! ওরা কথা কয় কম, কাজ করে বেশী! ওদের একতা, এই Ism-অধ্যুসিত দেশের একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়!

মিনতি হঠাৎ ফিক্ ক'রে একটু হেসে ফেলল!

—হাসলেন যে?

—ও কিছু নয়। দেখি, রান্নার কতদুর কী হ'লো—বলেই, মিনতি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনতি প্রস্থান করতেই জনার্দ্দনবাবু আবার গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করলেন। বললেন: তুমি কংগ্রেস ছেড়েছ, বেশ করেছ! কিন্তু নিজেদের শুভাশুভের চিন্তা! ও সব বালাই এখনও আছে না গেছে?

—ও সব চিন্তা কি কখনও কারুর যায়?—বিশু একটু ক্ষুণ্ন হলো। জনার্দ্দনবাবু কী ভাবেন তাকে?

জনার্দ্দনবাবু বললেন: যায়! তুমি যাদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রো তাদের দিকে একটু ভাল ক'রে লক্ষ্য করলেই জানতে পারবে, দেশের ভাল-মন্দর সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই!

—সেকি! ওঁদের মধ্যে অনেকেই তো কংগ্রেসের মেম্বার!

—আমার ছেলেও তো কংগ্রেসের মেম্বার। তুমি কি বলতে চাও সে তার দেশকে শ্রদ্ধা ক'রে—

—করেন না?

—নিশ্চয়ই না। শ্রদ্ধা ক'রে তাদেরকে, যাদের জন্যে আমাদের দেশের এই দুরবস্থা! তোমাদের মিষ্টার ঘোষালটি যদি সত্যই ইংরেজকে শত্রু ভাবতো, তাহলে অমন নির্লজ্জের মতো সাহেবীয়ানা

ক'রে বেড়াতে পারত না! সে যে শুধু টাকা রোজগারের জন্যেই হাঁস্‌কল্‌ পরে বেড়ায় তা নয়! তার চলা-ফেরা, শোয়া-বসা সব কিছুই ইংরেজের অনুকরণ! সে কংগ্রেসের মেম্বার হ'য়েছে, ওটা আজকালকার একটা ফ্যাসান বলে!

এ ধরণের ব্যক্তিগত আলোচনার উত্তরে আর কী বলা যেতে পারে! বিশু নীরবে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে জনার্দ্দনবাবু আবার বললেন: দেখ, আমাদের দেশের শুভাশুভ সম্বন্ধে আমারও একটা অভিমত আছে। নিজের মতানুযায়ী কাজ করবারও চেষ্টা করি আমি! কিন্তু মুস্কিল হ'য়েছে এই যে, আমার কপালে কর্ম্মী টেঁকে না!

বিশু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জনার্দ্দনবাবুর মুখের দিকে তাকাল।

—আমার কাজ পাড়াগাঁয়ে। কিন্তু কেউই মশার কামড় সহ্য করে, জল-কাদা ভেঙ্গে চাষা-ভূষোদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াতে রাজি হয় না। তাছাড়া, আর একটা অসুবিধাও আছে। এ কাজে খাটুনী আছে কিন্তু খবরের কাগজে নাম জাহির করবার কোন ব্যবস্থা নেই। বুঝলে?

বিশু হেসে মাথা নাড়ল।

—আজকালকার ছেলেরা যে কী চায়, বুঝিনা বাপু।—ক্ষুব্ধ স্বরে জনার্দ্দনবাবু বললেন: Politics ক'রে ক'রে এদের স্বভাব এমনি বিগড়ে গেছে যে, বৌ-বৌয়ের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েও তার ভেতর Politics খাটায়...

বিশু এবার জোরে হেসে উঠল।

মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে জনার্দ্দনবাবু আবার বললেন: দেখ, আমার বয়স হয়েছে। তোমাদের রবিঠাকুরের চাইতেও আমি বোধ হয় বছর দশেকের বড়। এ বয়সে অনেক দেখেছি আমি। মানুষের ভণ্ডামী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও আমার অনেকের চাইতে বেশী। সেই জন্যেই আজ তোমাকে ডেকেছি……

বিশু চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

গলা ঝেড়ে জনার্দ্দনবাবু বললেন: আমি তোমার মধ্যে একটা জিনিষ আবিষ্কার করেছি বিশু।...ইয়ে…তুমি যাবে আমার সঙ্গে গোকুলনগরে? আমার প্রজাগুলো যেমনি বোকা তেমনি পাজী। তুমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখনা, যদি তাদের মানুষ করে তুলতে পারো।

—আমায় কী করতে হবে বলুন!

—বলছি! কিন্তু তার আগে তোমার মতামতটা একটু ভাল ক'রে জানা দরকার। আমরা যে জাতি হিসেবে আত্মবিস্মৃত এ কথা তো তুমি স্বীকার করো?

—নিশ্চয়ই!

—ধার করা Politics নিয়ে আমরা যে কখনও স্বাধীন হ'তে পারব না, এ কথা তুমি সত্যিই বিশ্বাস করো?

—সত্যিই করি।

—আজ ইংরেজকে চোখ রাঙ্গাবার অজুহাতে অনেক রকমের Ism এসে এ-দেশে শেকড় গেড়েছে। এই Ism-এর প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্যে ইতিমধ্যেই যে নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু হ'য়ে গেছে সে খবর রাখ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এর আসল কারণ কী, জান ?

—নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থ। আমরা ছুঁচ্ হ'য়ে ঢুকি রাজনীতির ক্ষেত্রে। কিন্তু দু' একবার জেল খাটবার পরই,—নামটা দু'চারবার কাগজে ছাপা হ'বার পরই আমরা দেখা দি' ফাল হ'য়ে। তখন অশিক্ষিত জনসাধারণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দল তৈরী করি আমরা নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী······

—কিন্তু, কেন বল দেখি ?

—নাম কেনবার লোভে,—মন্ত্রীত্বের আশায়। কংগ্রেসের মধ্যে যে সব পুরোণ চাঁইরা রয়েছেন, তাঁদের ডিঙ্গিয়ে নতুন লোকের পক্ষে তো আর বড় চাকুরী পাওয়া সম্ভব নয়। তাই দরকার হয় নতুন দল তৈরী করে আলাদা Election-এর—

মিনতি এসে ঘরে ঢুকল। বলল : চলুন, খাবার দেওয়া হ'য়েছে।

—যাও, আগে খেয়ে নাও, তারপর কথা হবে।—বলে, জনার্দ্দনবাবু আরাম কেদারার ওপর ঢলে পড়লেন।

—আপনি ? বিশু ইতস্তত করল।

উত্তর দিল মিনতি : দাদু একাহারী, স্বপাক খান। আপনি আসুন—

মিনতি বেশ যত্ন করেই খাওয়াল বিশুকে। কিন্তু বিশুর তরফ থেকে যথোচিত ভদ্র ব্যবহার পাওয়া গেলনা। মিনতির সেই হাসিটা তখনও তার মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করছিল।

বিশুর গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য ক'রে মিনতি কিন্তু কুণ্ঠিত হলো। হাজার হলেও বিশু আজ তার নিমন্ত্রিত। বলল: আপনি কি রাগ করেছেন আমার ওপর?

—নাঃ, রাগ কিসের?

—তবে, কথা কইছেন না যে?

—ভাবছি!—মনের ভাব আর চাপতে না পেরে বিশু একটু খোঁচা দিল মিনতিকে। বলল: আমরা মুখ্যু মানুষ, আপনাদের মতো লেখাপড়া তো আর শিখিনি, তাই, আপনার সেই হাসিটার কথা এখনও ভাবছি।

—ওমা, আপনি কী! মিনতি ব্যস্ত হয়ে বলল: আমি তখন হেসেছিলুম রজতদার একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল বলে……

—কী কথা?

মিনতি বিপদে পড়ল। ইতস্তত: ক'রে বলল: আপনি তখন কংগ্রেস আর মহাত্মাজীর সুখ্যাতি করলেন,—আবার মিনিট খানেকের মধ্যেই আপনার মত বদলে গেল দেখেই হেসে ফেলেছিলুম!

বিশু দমে গেল! আলোচনার সময় উত্তেজনাবশে সে কী কী বলেছিল কিছুই তার মনে ছিল না। তাই, মিনিট খানেক চুপ করে থেকে সে অন্য রাস্তা ধরল। বলল: তার সঙ্গে রজতবাবুর কী সম্বন্ধ! হঠাৎ তার কথা আপনার মনে পড়ল কেন?

মিনতির আর উপায় রইল না। অনভ্যাসের জন্যে চট্ ক'রে কোন মিথ্যে কথাও জোগালো না তার মুখে। অগত্যা সে

বলল : পুষি একদিন রজতদাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বিশু বাবুর মতো একটা Political Dyspeptic-কে তুমি অত মাথায় তুলছ কেন ?

—কী ? বিশু যেন লাফিয়ে উঠল। সগর্জ্জনে বলল : আমি Politically Dyspeptic ?

—না। মিনতি সন্ত্রস্তভাবে বলল : রজতদা পুষিকে বলেছিল, না, ও একটা আগ্নেয়গিরি—

—তখন, পুষি কী বললে ?

—বললে, তাই বুঝি তুমি ধোঁয়া দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেছ ?

—তারপর ?

—রজতদা বললে : ধোঁয়াটা হচ্ছে আগ্নেয়গিরির বাইরের পরিচয় ! কিন্তু তার ভেতরে যে কাঁচা মালগুলো টগবগ ক'রে ফুটছে, তুমি সেগুলোর কথা ভাবছ না কেন ! আমাদের কাজে লাগাতে হ'বে সেই মালগুলোকেই।

—বটে ! বিশু যেন কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হলো। কিন্তু আহারের রুচি একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেল তার। কোন রকমে কাজ শেষ করে সে ড্রইং-রুমের দিকে অগ্রসর হ'লো।

কিন্তু দরজার বাইরেই তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো একটা চীৎকার শুনে ! ঘরের মধ্যে জনার্দ্দনবাবু হঠাৎ যেন আর্ত্তনাদ করে উঠলেন : ওটা একটা কায়েতের ছেলে ? তুমি বলছ কী ?

—হ্যাঁ। মিঃ ঘোষাল সংযতস্বরে বললেন : শুধু কায়েত বলেই নয়, ওর কিছু নেই !

—তবে, ওদেরকে তুমি অত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে দিলে কেন?

—ঘনিষ্ঠতা আবার কোথায় দেখলেন? মিনু ভদ্র মহিলা। আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে সে যেমন ভদ্র ব্যবহার ক'রে, বিশুর সঙ্গে ঠিক তেমনিভাবেই মেশে। আমার মেয়ে নিশ্চয়ই এত বোকা নয় যে, ওর মতো একটা হতভাগা লক্ষ্মীছাড়াকে বিয়ে করতে চাইবে···

বিশু আর শুনতে পারল না, ছুটে বেরিয়ে গেল।

বিশ

রাস্তায় বেরিয়ে বিশু ভাবল, তার একবার হাসা উচিৎ! সে হাসি সাফল্যেরও নয়, ব্যর্থতারও নয়, নিতান্তই ঔদাসীন্যের হাসি! কিন্তু হাসতে গিয়ে চোখে জল এল তার! সে লক্ষ্মীছাড়া! কারণ তার পূর্বপুরুষেরা ছলে-বলে-কৌশলে দুস্থকে ধ্বংস করে নিজেদের আভিজাত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে পারেন নি। যেহেতু সে বামুনের ব্যাটা বামুন নয়, তাই সে হতভাগা।

কিন্তু মিনতিকে হঠাৎ তার ঘাড়ে চাপাবার মৎলব জনার্দ্দনবাবুর মাথায় এল কেন? কী সঙ্কল্প করেছিলেন তিনি? তাকে ঘর-জামাই করে নিজের পল্লী-সংস্কারের খেয়াল চরিতার্থ করবেন? কিন্তু বিশু কি এতই বোকা যে মিনতির মতো একটা গায়ে-পড়া মেয়েকে বিয়ে ক'রে নিজের জীবন বিষময় ক'রে তুলবে? কী আছে মেয়েটার? ওর মতো সুবেশা সুন্দরী তো আজকাল পথে ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে! কিন্তু আসলে তো ওরা এক তাল কাদা ছাড়া আর কিছুই নয়! নালা যেমন গ্রাম বিশেষে গিয়ে নদীর নাম গ্রহণ করে, পাড়াগাঁয়ের পোদ্ যেমন কায়স্থ সাজে সহরে এসে, তেমনি এদেরও ঐতিহ্য—আভিজাত্যের মাপকাঠি স্থিরীকৃত হয় তথাকথিত কাঞ্চন কৌলিন্যের

ভিত্তিতে! এক শ্রেণীর জীব এদের সঙ্গে সাময়িকভাবে খেলা ক'রে তৃপ্তি পেতে পারে! কিন্তু এদেরকে গলায় বেঁধে চিরদিনের মতো নীলকণ্ঠ হ'বে এমন অর্ব্বাচীন ক'জন আছে এ দেশে!

অথচ এই মৎলবই করেছিলেন জনার্দ্দনবাবু, যাঁর অভিজ্ঞতার দম্ভ আজ পর্য্যন্ত পরের ছিদ্র ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি! স্পর্দ্ধা এই বৃদ্ধের! একদিকে নিজেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত বলে প্রচার করতে চান, অপরদিকে, আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠেন বিশু বামুন নয় শুনে! তাঁর কাছে মানুষের আত্মত্যাগের কোন মর্য্যাদা নেই! কৃচ্ছ্রসাধনার কোন মূল্য নেই! মূল্য আছে শুধু তার, যার ওপর মানুষের কোন হাত নেই, নিতান্তই যা দৈবাধীন!

ব্রাহ্মণ! কবে সে কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষ তার উপনিষদের ঋষিদেরকে মাথার মণি করেছিল, সেই দম্ভে এরা আজও আত্মবিস্মৃত! ধর্ম্মধ্বজী এই সব এরণ্ডের দল যুগে যুগে কলঙ্কিত করেছে ভারতের 'জাতীয় ইতিহাস! এ দেশের প্রথম ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে এদেরই অবিমৃষ্যকারিতার ফলাফল: বেদ ও ব্রাহ্মণের শত্রু বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব অকারণ হয়নি এদেশে। আবার বর্ত্তমানের ঐতিহাসিকেরাও তাঁদের গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে লিখেছেন: আজ যারা বাঙ্গলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, কেউই তারা বাইরের লোক নয়।

এ দেশের আত্মহন্ত্রী অকর্ম্মণ্যদের ভেদ্ প্রথার সুযোগ নিয়ে কতবার কত শক্ হুন্ কলঙ্কিত করেছে হিন্দুস্থানের এই পুণ্যভূমি! বিজিত ভারতীয়েরা কত শতবার ধর্ম্ম বলি দিয়েছে বিধর্ম্মী বিজেতাদের

অত্যাচার উৎপীড়নে। কিন্তু অতীত-বিলাসী আত্মবিস্মৃতদের কাছে কোন মূল্য নেই এই সব ঐতিহাসিক অপ্রিয় সত্যের। কারণ, সত্যযুগের ঋষিবংশীয়দের কাছে পৌরাণিক ইতিকথা ছাড়া অন্য কোন ইতিহাসের সংবাদ রাখা মহাপাপ।

অথচ, সেদিনকার সেই বিধর্ম্মী বিজেতারা কেউ ফিরে যায়নি নিজের দেশে। আজকের ভারতেও অস্তিত্ব নেই তাদের। কিন্তু আসলে তারা গেল কোথায় সে প্রশ্নও করবার উপায় নেই এই সব বশিষ্ট-কাশ্যপবংশীয়দেরকে।

আশ্চর্য্য! এতক্ষণ পরে বিশু একটু হাসতে পারল। জনার্দ্দন ঘোষাল° যখন উপনিষদ আউড়ে বলেছিলেন: মা গৃধ। তখন বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন ঐতরেয় উপনিষদের ঋষি একজন ইতর লোক ছিলেন। (ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন তিনি কর্ম্মগুণেই।)

অথচ, মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে এই লোকটাকেই সে তার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল। বৃদ্ধের কাটা কাটা বুলি শুনে সত্যই সে বাস্তব বিস্মৃত হয়েছিল। কল্পনায় ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছিল একটা আদর্শবাদের মোহময় শূন্যোদ্যানে। রজতের প্রতি কটাক্ষ করে সে অর্ব্বাচীনের মতো যুক্তি দেখিয়েছিল Constructive tolerant statesmanship-এর স্বপক্ষে। বিশুর আত্মগ্লানির যেন আর অন্ত রইল না।

শেষে, চাঞ্চল্য ত্যাগ করে সে শেষবারের মতো প্রতিজ্ঞা করল: পল্লী-সংস্কারের আদর্শের মতো সাময়িক উচ্ছ্বাসের প্রশ্রয় আর সে কিছুতেই দেবে না। ধৈর্য্যশীল ও গঠনমূলক রাজনীতির দ্বারা বর্ত্তমান

ভারতের আর কোন উপকার হবারই সম্ভাবনা নেই। ওটা অতীত-বিলাসী, উপদেশ-প্রবণ নির্বীর্য্যদেরই একটা উদ্ভট কল্পনা মাত্র। প্রগতি-পন্থীদের কাছে ও মতবাদ শুধু অচল নয়, অশ্রদ্ধেয়। বর্ত্তমান ভারত আজ অতীতকে বিস্মৃত হয়ে এগিয়ে চলেছে নূতনের দিকে। এই নতুন রাজপথ এত বিস্তৃত যে, তার বিরাটত্ব কল্পনা করে আতঙ্কে শিউরে উঠেছে অকাল-বৃদ্ধের দল। তাই, এই সব সঙ্কীর্ণচেতার দল, নিজেদের অস্তিত্বলোপের আশঙ্কায় নিজেদের গোঁড়ামীগুলোকে আঁকড়ে ধরে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে নবীনদের অগ্রগতির পথে। সেও নবীন। সেও এই নতুন রাজপথেরই পথিক। এই রাজপথই রজত-নির্দ্দিষ্ট পথ। সুতরাং সে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়েই গোবিন্দপুর যাত্রা করল!

গোবিন্দপুর জায়গাটা বাঙ্গলাদেশের একটা সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত ক্ষুদ্র একটি সহরতলী। এখানকার বাসিন্দারা সম্ভবত ট্রাম এবং টেলিফোন ছাড়া কলকাতার আর সকল রকম সুবিধাই ভোগ করতে পায়। রজতের নির্দ্দেশে বিশু এখানে এসে অতিথি হ'লো, স্থানীয় আড্ডার পরিচালক বিভূতি বাঁড়ুজ্জে।

রজতের মতে বিভূতি একটি অমূল্য রত্ন। সে স্থানীয় ফৌজদারী আদালতের একমাত্র উকীল—বাকী সকলেই মোক্তার। অর্থাৎ বয়স অল্প হ'লেও সে অল্প দিনের মধ্যেই আশাতীতভাবে অর্থ ও যশ লাভ

করেছিল। এ ছাড়া, সে এখানকার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অবৈতনিক সেক্রেটারী; মিউনিসিপ্যালিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য; এবং ক্ষুদ্র একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা যথেষ্ট সম্মান করে চলেন তাকে; S. D. O. তাকে বাড়ীতে ডাকিয়ে এনে চা খাওয়ান এবং পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টরটি তো তার এক ক্লাশের (গ্লাশের নয়) ইয়ার অর্থাৎ সহপাঠি।

বিভূতির বাড়ীটিও বিরাট, সংসারও জলজলাট। এরই মধ্যে বাস ক'রে সে এতাবৎকাল মুক্তি-সঙ্ঘের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন ক'রে এসেছে।

রজতের নির্দ্দেশমত বিভূতিও আগে থাকৃতে প্রস্তুত ছিল এবং বিশু এসে তার সঙ্গে মিলিত হবার পর যথা নির্দ্দিষ্ট সময় তারা নির্ব্বিঘ্নে না হ'লেও নিখুঁতভাবে কাজ শেষ ক'রে ফেলল। গভীর নিশীথে তাদের লোকজনও সব ঠিক্ উপস্থিত ছিল নদীপথে। সুতরাং বামাল কলকাতায় গিয়ে পৌছল নিরাপদেই। শুধু বিভূতির আগ্রহাতিশয্যে, বিশু সেখানে রয়ে গেল, action-এর পরবর্ত্তী রিপোর্ট গ্রহণের জন্য।

পরদিন সকাল থেকেই সহরতলীর সর্ব্বত্র একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। স্থানীয় পুলিশ অফিসারদের মধ্যে তৎপরতার আর সীমা রইল না। ক্রমে, সকলের মুখে মুখে আলোচিত হ'য়ে সংবাদটা আশপাশের গ্রামগুলির মধ্যেও প্রচারিত হ'য়ে গেল।

জনার্দ্দনবাবু দুঃখী প্রজাদের অত্যন্ত প্রিয় জমিদার ছিলেন। দেখতে দেখতে চাষা-ভূষো, ইতর-ভদ্র, যে যেখানে ছিল সকলেই এসে উপস্থিত হ'লো গোকুলনগর জমিদার বাড়ীতে। বিভূতির সঙ্গে বিশুও

এসেছিল এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষদের মতো তারাও খুব উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে লাগল রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে। দেখা গেল, জমিদার বাড়ী থেকে শুধু ৮০ হাজার টাকাই উধাও হয়ে যায়নি, দু'টো খুনও হয়ে গেছে। স্বয়ং জমিদার জনার্দ্দনবাবু এবং তাঁর দেওয়ান বৃদ্ধ বটব্যাল মহাশয়কেও তারা হত্যা ক'রে গিয়েছে। এ পক্ষের একজন বরকন্দাজের গুলীতে একটা ডাকাতও জখম হয়েছিল বটে কিন্তু তার দ্বারা উপকারের আর কোন আশা ছিল না। শত্রুপক্ষ প্রস্থান করবার পূর্ব্বে তাকে নিহত ক'রে, বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মুখখানাকে তার এমনই অদ্ভুতভাবে বিকৃত ক'রে দিয়ে গিয়েছিল যে, লোকটাকে চেনবার একেবারেই কোন উপায় ছিল না। এমন কি তার পোষাক তল্লাসী করেও যাতে কোন সূত্র পাওয়া না যায়, সে ব্যবস্থা ক'রে যেতেও তারা ভোলে নি। কোমরে একটা পকেট-বিহীন কালো রঙের হাফপ্যাণ্ট ছাড়া লোকটার পোষাকেরও আর কোন বালাই ছিল না।

সর্ব্বত্র যা ঘটে থাকে এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'লো না। যথাযথভাবে অনুসন্ধান করা হ'বে এই ভরসা দিয়ে পুলিশ অফিসারেরা প্রস্থান করবার উপক্রম করলেন। কিন্তু ময়না তদন্তের জন্য লাশ তিনটে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা উঠতেই জমিদার বাড়ীর আত্মীয়স্থানীয় একটি প্রবীণ ভদ্রলোক একেবারে কেঁদে ফেললেন। করজোড়ে বললেন: এতই যদি করলেন হুজুর, তাহলে আর মিনিট পনের অপেক্ষা করুন। কলকাতা থেকে ওঁর ছেলে-মেয়েরা এসে পড়লেন বলে......

—আমি কি তোমাদের মাইনের চাকর নাকি? দারোগাবাবু গর্জ্জন ক'রে উঠলেন।

—দোহাই আপনার হুজুর......

শেষে প্রচুর পরিমাণে তৈল নিষিক্ত হ'য়ে দারোগাবাবু অগত্যা মুখ ভারি ক'রে বললেন: নাঃ, আপনাদের জ্বালায়......যান, আর একবার চা দিতে বলুন।

বৃদ্ধ হন্তদন্ত হ'য়ে বাড়ীর মধ্যে প্রস্থান করলেন।

বিভূতি এতক্ষণ দারোগাবাবুর বন্ধু হিসেবে খুব চিন্তিতভাবে ঘুরে ঘুরে তদারক ক'রে বেড়াচ্ছিল। বিশুও গম্ভীরভাবে একটা চেয়ারে বসেছিল। বৃদ্ধ প্রস্থান করতেই সে বিভূতিকে ইসারা করল। তারপর সবিনয়ে দারোগাবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় এসে বিভূতি বলল: উঃ, খুব বেঁচে গেছেন! ঘোষালদের সঙ্গে যে আপনার আলাপ আছে সেটা স্রেফ ভুলে গিয়েছিলাম।

বিশু গম্ভীরভাবে একটা হুঁ দিল মাত্র। কথা কইল না।

বিশুকে নীরব দেখে বিভূতি বলল: কী হ'লো আপনার? ভাবছেন কী?

একটা নিঃশ্বাস্ চেপে বিশু বলল: ভাবছি মিনতির কথা। বুড়ো মেয়েটাকে বড্ড ভালবাসতো। এখানে এসে সে যে কী করবে তাই ভাবছি। হয়তো বুড়োর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চীৎকার করে উঠবে। কিংবা, দৃশ্যটা সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হ'য়ে যাবে....

—আপনার কি কাব্যি-রোগ আছে নাকি বিশুবাবু? বিভূতি সশব্দে হেসে উঠল।

বিশুও মুখ নীচু করল। কিন্তু বিভূতির ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠল সে। বাড়ীতে এসে বলল: কাজ তো একরকম শেষ হ'লো,

আর আমার থাকবার দরকার কী? আমি বরং বিকেলের ট্রেণেই চলে যাই।

বিভূতি মাথা নাড়ল। বলল: আরও অন্ততঃ দু'দিন আপনার এখানে থাকা দরকার। কে জানে মশাই, ব্যাটারা কোথা থেকে কী ক্লু টেনে বার করে।

ঠিক এই সময় সদর দরজায় একটা মোটর থামবার শব্দ হ'লো। পরক্ষণেই চাকর এসে খবর দিল: বাইরে একটি লোক বিশুকে ডাক্‌ছে।

বিশুর বুক কেঁপে উঠল। প্রথমে সে দরজার আড়াল থেকে আগন্তুককে একবার দেখে নিল। তারপর সন্ত্রস্তভাবে বাইরে এল।

আগন্তুক কলকাতার ট্যাক্সী ড্রাইভারদের মতো খাকীর পোষাক-পরা একটি শিখ যুবক। অত্যন্ত পুরোণ একটা ফোর্ড গাড়ীর মধ্যে বসেছিল সে। গাড়ীর মেশিনও সে বন্ধ করেনি, এঞ্জিনের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেয়ারীং সমেত হাত দুটি তার থর থর করে কাঁপছিল। বিশুকে দেখেই বাজ্‌খাঁই আওয়াজে প্রশ্ন করল: আপ তো বিভূতিবাবু?

—নেই তো। হাম্‌ বিশুবাবু।

যুবকটি তখন পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বার করে বিশুর হাতে দিল। বিশু পড়ল: Please see me at once—P.

ব্যাপার কী! পুষ্প নাকি? বিশু আশ্চর্য্য হ'য়ে ড্রাইভারটির দিকে তাকাল। সেও তৎক্ষণাৎ গাড়ীর দরজা খুলে দিয়ে বলল: চলিয়ে—

—কী ধার?

—ডাক্‌-বাঙ্গলো মে।

বিশু আবার কাগজটা পড়ল। হাতের লেখাটা সত্যই যেন পুষ্পর মতো। কিন্তু সে এখানে এল কী ক'রে? আর, তার সঙ্গে এরূপ অদ্ভুতভাবে দেখা করবারই বা অর্থ কী? সত্যই যদি তার বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে তো সে সোজা এই বাড়ীতেই চলে আসতে পারত। সঙ্ঘের সভ্য হিসেবে বিভূতি তো তার অপরিচিত নয়—

—চলিয়ে! ড্রাইভার আবার তাগাদা দিল।

অগত্যা আর কিছু ভাববার অবসর না পেয়ে বিশু ভয়ে ভয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ী ডাক্-বাঙ্গলোয় এসে পৌঁছল। গেটের মধ্যে প্রবেশ করতেই বিশু দেখতে পেল, ঘরের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে পুষ্প বাংলোর চাতালের ওপর দাঁড়াল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে চলে গেল।—কিছু বুঝতে না পেরে বিশু তাড়াতাড়ি বাংলোর মধ্যে প্রবেশ করল।

চাতাল পেরিয়েই সুমুখে একটা হল; তার দু' পাশে দু' খানি ঘর। হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে বিশুর দিকে তাকিয়ে ছিল বাংলোর খিদ্‌মদ্‌গারটা। বিশু তাকেই জিজ্ঞাসা করল: মেম্ সাহাব কী ধার গিয়া রে?

খিদ্‌মদ্‌গার আঙুল দিয়ে পাশের একটা ঘর দেখিয়ে দিল। বিশু তাড়াতাড়ি সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘরের এক্ কোণে একটা ভাঙ্গা ড্রেসিং-টেবল্ ও একটা বার্ণিস্-চটা খাট পড়েছিল। খাটের গদীটারও সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, ভেতর থেকে

নারকেল ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছিল। পুষ্প সেই ধুলি-ধূসরিত গদীটির ওপরই বসেছিল অবনতমুখে।

—কী ব্যাপার বলুন তো? বিশু উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করল।

পুষ্প কোন সাড়া দিলনা। ঠিক পূর্ব্বের মতোই বসে রইল মুখ নীচু করে।

বিশু আবার ডাকল।

ফল পূর্ব্ববৎ।

শেষে, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে, অনেক ইতস্তত ক'রে সে পুষ্পর একটা হাত ধরে নাড়া দিল। বলল: কী হ'লো, এ্যাঁ?

পুষ্প এবারও কথা কইল না। শুধু হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের রগ্ টিপে ধরল।

ব্যাপার দেখে বিশুর বুদ্ধি-বিবেচনা একেবারে লোপ পেয়ে গেল। সে তখন আস্তে আস্তে মেঝের ওপরই বসে পড়বার উপক্রম করল।

—আহা, ধুলো ধুলো, কী করলেন?

বিশু মুখ তুলল। দেখল, পুষ্পর মুখে মৃদু হাসির আভাষ।

একুশ

পুষ্পর হাসিটা কিন্তু বিশুর ভাল লাগল না। এ হাসির মধ্যে যেন প্রাণ নেই! স্নেহাস্পদকে স্তোক দেবার উদ্দেশ্যে মৃত্যুপথযাত্রী যেমন করে হাসে, এ হাসি অনেকটা যেন সেই রকম। পুষ্প তার কাছে চির-রহস্যময়ী। তার আকস্মিক আবির্ভাবের মতো তার এই প্রাণহীন হাসির রহস্যও সে কিছু উপলব্ধি করতে পারলো না।

—আপনি বড় ছেলেমানুষ! মৃদুস্বরে পুষ্প অনুযোগ করল: ছিঃ, উঠে বসুন!

বিশু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

পুষ্প আবার বলল: অগ্নিমন্ত্রের উপাসক আপনি! এত অল্পে অভিভূত হ'য়ে পড়া আপনার উচিত নয়।

ঠিক কথা। বিশু ইতস্ততঃ তাকিয়ে ঘরের কোন থেকে একটা বেত্-ছেঁড়া চেয়ার টেনে আনল। তারপর তার ওপর চেপে বসে গম্ভীরভাবে বলল: হুম, কিন্তু আপনি তখন কথা কইছিলেন না কেন, শুনি?

পুষ্প পূর্ব্বের মতোই ম্লানভাবে একটু হাসল।

—কই উত্তর দিন?

—আপনার মতো লোকের সঙ্গে কি চট্ ক'রে কথা কওয়া যায়!

—আমার মতো লোক! বিশু সহাস্যমুখে বলল: আমি তাহলে একজন কেউ-কেটা নই বলুন!

পুষ্পর মুখের নিস্তেজ ভাবটাও ক্রমশঃ কমে আসছিল। সেও স্মিতমুখে বলল: নিশ্চয়ই নন্!

—যথা?

—নিজের সুখ্যাতি নিজের কানে আর নাই বা শুনলেন! পুষ্প আবার হাসল।

কিন্তু বিশু সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠল। পুষ্প যেন আজ বড় বেশী কথা কইছে। নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সে তার সঙ্গে অভিনয় করছে না তো। তবুও, সে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। পুষ্পর মতো মেয়ে যদি মাত্র একঘণ্টার জন্যেও তার সঙ্গে এমনি সহজ সরল ব্যবহার ক'রে তাতেই সে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবে। কিন্তু নিজেকে সুলভ ক'রে এবার আর সে ভুল করবে না। পুষ্প নিজেই বলেছে: অগ্নিমন্ত্রের উপাসক সে। অত চাঞ্চল্য প্রকাশ করা সত্যই তার শোভা পায় না। কণ্ঠনালীটা ভিজিয়ে নিয়ে, সংযতস্বরে সে বলল: এখন আসল কথাটা কী বলুন দেখি।

পুষ্পর মুখ আবার বিবর্ণ হ'য়ে গেল। একটু ইতস্তত করে সঙ্কুচিত ভাবে সে বলল: আমার একটি প্রার্থনা আপনাকে রাখতেই হবে······

—প্রার্থনা! আপনি প্রার্থনা চাইছেন?—আমার কাছে?

বিশুর অভিভূত ভাব দেখে পুষ্পর মুখে আবার হাসি ফুটল। বলল: যান, ও রকম করলে আমি কিছুই বলতে পারব না।

—কী আবার করলাম আমি? আপনি বলুন না?

—একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করুন।

পুষ্পর অনুরোধ শুনে বিশুও হাসতে যাচ্ছিল কিন্তু সামলে নিয়ে বলল: বেশ, গম্ভীর হলাম।

—আমার প্রার্থনা,—পুষ্প অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ল। বলল: যে কাজের জন্যে আপনি এখানে এসেছেন, সে কাজ করবার চেষ্টা না ক'রে, এক্ষুনি আপনাকে আমার সঙ্গে ফিরে যেতে হ'বে।

প্রার্থনা শুনে বিশুর কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য অকৃত্রিমতায় পরিণত হ'লো। কিন্তু বিস্মিত সে একটুও হ'লো না। সে যেন পুষ্পর কাছ থেকে এই রকম কিছু একটাই প্রত্যাশা করছিল।

বিশুকে নীরব দেখে পুষ্প আবার বলল: আমার কথার উত্তরে আপনি যে কী বলবেন তা আমি জানি। কিন্তু এ কাজ আপনাকে আমি কিছুতেই করতে দোব না। মিনু শুধু আমারই বন্ধু নয়, সে আপনারও বন্ধু! বন্ধু হ'য়ে তার এতবড় সর্ব্বনাশ করবেন আপনি?

বিশু এবার উত্তর দিল: এই যদি আপনার অন্তরের কথা, তাহলে সেদিন অমন ক'রে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কেন? রজত লোকটা যে কত নিষ্ঠুর সেদিন সেই কথাটাই আপনাকে আমি জানাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি......

—জানি জানি,—বাধা দিয়ে পুষ্প বলল: সে নিষ্ঠুর, পাথরের চেয়েও কঠিন,—সব জানি আমি! আপনি চুপ করুন......

—আপনি জানেন! বিশু চঞ্চল হ'য়ে উঠল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পুষ্পর দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন করল: রজত সম্বন্ধে এ ধারণা আপনার সত্যি?

—সত্যি সত্যি,—পুষ্প যেন ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। বলল: পাথর ফেটেও জল বেরোয়! কিন্তু সে তার সঙ্ঘের জন্যে দরকার হ'লে আমাকেও বলি দিতে পারে। তার কথা আমি সব জানি, আপনি চুপ করুন!

কথাগুলো বিশুর একেবারেই ভাল লাগল না। রজতের কথা পুষ্প জানে! অর্থাৎ রজত হচ্ছে এমনই একজন অসাধারণ ব্যক্তি যে তার সঙ্ঘের জন্য সব রকম নিষ্ঠুরতাকেই প্রশ্রয় দিতে পারে। এমনই তার দেশপ্রেম যে, সে দরকার হ'লে তার প্রিয়তমাকে পর্য্যন্ত হত্যা করতে কুণ্ঠিত হবে না। বিশুর উত্তেজনা ক্রোধে পরিণত হবার উপক্রম করল।

বিশুর কুঞ্চিত ভ্রূযুগল পুষ্পকে উৎকণ্ঠিত ক'রে তুলল। সে অধীর হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল: কী ভাবছেন?

বিশু উত্তর দিল না।

—বিশুবাবু! পুষ্প সাগ্রহে বলল: আপনি কি আমার কথায় রাগ করলেন? সত্যি বলছি আজ আমার মাথার ঠিক নেই......

—না না; রাগ করিনি তো!

—তবে কী ভাবছেন বলুন!

—ভাবছি,—অনন্যোপায় হ'য়ে বিশু বলল: ভাবছি, বিভূতিবাবুকে গিয়ে কী কৈফিয়ৎ দোব। আপনি এখানে এসেছিলেন এবং দলপতির আদেশের বিরুদ্ধে আমাকে উত্তেজিত করেছিলেন, এ কথা প্রকাশ হওয়ার পরিণাম কী তা জানেন?

পুষ্প স্খলিত কণ্ঠে বলল: জানি। কিন্তু যাতে এ কথা প্রকাশ না

পায় সে ব্যবস্থা তো আমি করেছি। ড্রাইভারটাকে দশ টাকা দিয়ে, তাকে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছি !

—লোকটিকে জোগাড় করলেন কোথা থেকে ?

—এইখান থেকেই ! লোকটা প্রাইভেট ট্যাক্সি চালায়. সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল !

—আপনার ড্রাইভার কোথায় ?

—বাজারের কাছে ষ্টুয়ার্ট কোম্পানীর একটা কারখানা আছে। তাকে সেইখানেই পাঠিয়েছি গাড়ীটাকে পরিষ্কার করাতে। সে চলে যাওয়ার পরই আমি এ লোকটাকে জোগাড় ক'রে নিলাম।—এই কটা কথা বলতে গিয়ে পুষ্প যেন হাঁকিয়ে উঠল।

বিশু আবার জিজ্ঞাসা করল : বাড়ী থেকে বেরুলেন কী বলে ?

—খুলনায়, আমার পিসিমার কাছে যাচ্ছি বলে। লিলি এখন সেই-খানেই রয়েছে কিনা—

পুষ্পর ব্যবস্থা শুনে বিশু এবার একটু হাসল। বলল : নিজের পথটি তো বেশ সাফ্ ক'রে রেখেছেন। কিন্তু অধীনকে এ রকম ফ্যাসাদে ফেলছেন কেন? বিভূতি যখন জিগ্গেস করবে তখন কী জবাব দোব ? এখানে তো আমার পরিচিত কেউ নেই।

পুষ্প সম্ভবতঃ এতটা ভেবে দেখেনি। একটু ইতস্তত ক'রে বলল : যা হোক কিছু একটা……

—যা হোক কিছু একটা মিথ্যে কথা বলতে বলছেন তো ? বিশু সহাস্য মুখে বলল : কিন্তু আমি যদি বলি রক্ত-ভাইয়ের কাছে আমি কোন রকম মিথ্যে কথা বলতে রাজি নই, তাহলে ?

বিশুর হাসি দেখে পুষ্প নিশ্চিন্ত হ'লো। সে তখন চকিতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল : ইস্, কী আমার সত্যবাদী যুধিষ্টির এলেন গো!

শুনে, বিশুর মাথা একেবারে ঘুরে গেল।

ভ্রূভঙ্গি ক'রে পুষ্প আবার বলল : বেশী চালাকী করবেন না, বুঝেলন মশাই! আপনাকে দিয়ে আমি কত অন্যায় কাজ করিয়ে নিতে পারি জানেন?

নিজের মনের সঙ্গে বিশু আর যেন যুদ্ধ করতে পারছিলনা; সংযম তার স্খলিত হ'য়ে পড়ল। পুষ্পর রাজেন্দ্রানী মূর্ত্তির কথা নিঃশেষে বিস্মৃত হ'লো সে; শুধু সত্য হ'য়ে উঠল তার বর্ত্তমান ব্যবহারের বৈচিত্র্যটুকু। বৈশিষ্ট্য হারিয়ে পুষ্প যেন হঠাৎ মিনতি বন্দনা প্রমুখ আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে একাকার হ'য়ে গেল! বিশুরও মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে চোখের দৃষ্টি হ'য়ে উঠল ঘোলাটে। সে এক অদ্ভুত সর্ব্বগ্রাসী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পুষ্পর দিকে।

বিশুর মুখের দিকে চেয়ে পুষ্পর মুখও সাদা হ'য়ে গেল। কী যেন একটা অজানা আশঙ্কায় বুকটা একবার কেঁপে উঠল তার। তারপর সন্ত্রস্তভাবে বুকের বসন সংযত ক'রে ধীরে ধীরে বলল : আমার জন্যে সামান্য একটা মিথ্যে কথা বলতে পারবেন না?

বিশু আর নিজেকে সংযত ক'রে রাখতে পারল না। হঠাৎ উঠে গিয়ে সে একেবারে খাটের ওপর পুষ্পর পাশে গিয়ে বসল; তারপর জড়িতস্বরে প্রশ্ন করল : আপনি কেন আজ আমাকে এত প্রশ্রয় দিচ্ছেন?

পুষ্প আর বিশুর দিকে চেয়ে থাকতে ভরসা করল না, সভয়ে মুখ নীচু করল।

—আপনি আমাকে পরীক্ষা করতে চান?

সভয়ে অস্ফুটস্বরে পুষ্প বলল: না তো!

—আলবৎ! খাটের ওপর থেকে চট্ করে নেমে দাঁড়িয়ে বিশু উত্তেজিতভাবে বলল: আপনি দেখতে চান আমি কতখানি সহ্য করতে পারি, কেমন?

—এ সব আপনি কী বলছেন?

—ঠিকই বলছি! চেষ্টাকৃত সংযতস্বরে বিশু বলল: আমি জানি, আপনার মনে রঞ্জতবাবুর জন্যে যে আসন একবার পাতা হ'য়ে গিয়েছে, বিধাতার সব বিধান উল্টে গেলেও সেখানে আর কারুর স্থান হ'বে না। কিন্তু আমিও তো দেবতা নই! আপনার সম্বন্ধে আমার যদি একটু দুর্ব্বলতা থাকেই, তাতে আপনার কী? what's that to you? আমি নিজে থেকে কখনও আপনাকে কিছু বলতে গিয়েছি? তবে, কেন আজ আপনি আমার দুর্ব্বলতা নিয়ে ইয়ে করছেন?

বিশুর কল্পনার অভিনবত্ব এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের অদ্ভুত যুক্তি শুনে পুষ্প ভেবেই পেল না সে কী করবে! প্রথমে সে অবাক হ'য়ে বিশুর মুখের দিকে তাকাল। তারপর নিতান্ত অসহায়ের মতোই ক্ষীণভাবে একটু হাসল।

হাসিটা বিশুর দৃষ্টি এড়াল না। সে আরও উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। বলল: ওই হাসিই হ'য়েছে আমার কাল! কিন্তু কেন?

কেন আপনি আমার সর্ব্বনাশ করতে চান? মানুষকে সামান্য একটু আশা নিয়েও বেঁচে থাকতে দেবেন না আপনি?

শেষের দিকে বিশুর কণ্ঠস্বরটা যেন রুদ্ধ হ'য়ে এল। পুষ্প মুখ তুলে দেখল, চোখ দুটোও যেন তার চক্‌চক্‌ করছে। সে তখন বলল: ছিঃ, পাগলামী করবেন না······

—পাগলামী! বিশু চীৎকার ক'রে উঠল: আমার কথাগুলো আপনার কাছে পাগলামী হ'লো? তার মানে, আমি একটা কিস্যু নই! আমার আশা-আকাঙ্খার কোন মূল্য নেই! আমার সব কিছুই মিথ্যে?

—ছিঃ, মিথ্যে কেন হ'বে! সান্ত্বনা দিয়ে পুষ্প বলল: আশা ফলবতীও তো হয়! আপনি কেন ভাবছেন······

—এ্যাঁ! উত্তেজনার শেষ সীমায় এসে বিশু যেন আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল: আপনি, আপনি এই কথা বলছেন? আশা ফলবতীও হয়?—বলেই উন্মাদের মতো সে পুষ্পর একটা হাত ধরল।

সে আকর্ষণের বেগ পুষ্প সহ্য করতে পারল না; সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল একেবারে বিশুর বুকের ওপর। তারপর একটা পশু শক্তির নিষ্পেষণে নিপীড়িত হ'তে হ'তে সে মূহূর্ত্তের জন্য চৈতন্য হারাল!

মূহূর্ত্তের অন্যমনস্কতার জন্য পুষ্পর জীবনে নেমে এল এই অভিশাপ! নিতান্তই সে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিল বিশুকে। তার আশা আকাঙ্খা বলতে সে সরল বুদ্ধিতে বুঝেছিল দেশের স্বাধীনতা! কিন্তু তার দুর্ভাগ্য,—বিশুর জীবনে দেশের মঙ্গলের চাইতেও পুষ্পকে পাওয়ার আকাঙ্খাটা যে আরও বড়,—সেটা সে ধরতে পারে নি!

বিশুর দুর্জ্জয় আলিঙ্গনের মধ্যে নিষ্পেষিত হ'য়ে সে থর থর ক'রে কাঁপছিল। সে যেন তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করছিল, প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে প্রতি অঙ্গটি তার কুঁকড়ে যাচ্ছে। এমন কি ডাক্ ছেড়ে কাঁদবার ক্ষমতাও আর তার ছিল না। ঘৃণা, অনুশোচনা ও ক্রোধের প্রাবল্যে কণ্ঠনালীটা যেন তার একেবারে অসাড় হ'য়ে গিয়েছিল। পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর মতো বিশুর বুকের মধ্যে মাথা রাখতে বাধ্য হ'য়ে সে শেষে চোখ বুজল।

তবুও আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হ'লে চলবে না তার। যে ভূল সে একবার করে ফেলেছে তার মাশুল তাকে জোগাতেই হবে! প্রায়শ্চিত্তের জন্যে হয়তো সমস্ত ভবিষ্যৎটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে তার। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের ভবিষৎ ফলাফল কল্পনা ক'রে বর্ত্তমানকে ভুললে তার চলবে না। তার প্রতি মুহূর্ত্তটি মূল্যবান! কার্য্যসিদ্ধি তাকে করতেই হবে! অগ্নিমন্ত্রের উপাসিকা সে! তুচ্ছ একটা বিশুর লালসার আগুনে পুড়ে ছাই হবার জন্যে নিশ্চয়ই তার জন্ম হয়নি! তাছাড়া বিশুকেও সে জানে। তার অস্থির-মতিত্বের পরিচয় সে বহুবার বহু ক্ষেত্রেই পেয়েছে। তার দেশভক্তির ভিত্তিটা কত দৃঢ় তাও সে জানে; হঠাৎ অহিংসার পথ ছেড়ে কিসের মোহে সে সন্ত্রাসবাদীর দলে ভিড়েছে তাও সে ভাল করেই জানে। বিশু সত্যিকার একটা তুচ্ছ লোক বলেই তো সে আজ তাকে সম্মোহিত ক'রে কার্য্যোদ্ধার করতে এসেছে!

তার আজকেকার এই অভিযানের কাহিনী শুনে আত্মীয়-পরিজনেরা হয়তো তাকে 'দুঃসাহসী বলবে। কলঙ্কও রটাবে হয়তো কেউ কেউ;

কিন্তু যার জন্যে আজ তার এই কর্ম্মভোগ, সে তো বুঝবে, কাকে রক্ষা করবার জন্যে পুষ্পর মতো মেয়েও আজ অভিনেত্রীর জীবন বরণ করতে বাধ্য হ'য়েছে! সামান্য একটু হাসি ; তুচ্ছ দুটো মিষ্টি কথার বিনিময়ে শুধু রজতের জীবনই নিরাপদ হ'বে না,—তার সঙ্ঘের আয়ুও অক্ষয় হ'বে!

মুদ্রিত চক্ষে পুষ্প কান পেতে শুনছিল বিশুর হৃদপিণ্ডের স্পন্দন। কিন্তু সে তো স্পন্দন নয়। যেন একটা আজন্ম অনাহারী পশু অকস্মাৎ অমৃত-ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে উন্মাদ হয়ে উঠেছে! আহারকে উদরস্থ করবারও যেন ধৈর্য্য নেই তার! সে চায় এক নিমেষে সর্ব্বস্ব গ্রাস করতে। সারা জীবন প্রতীক্ষা করার প্রতিক্রিয়া যেন উন্মত্ত ঝড়ের রূপ ধরে প্রকটিত হচ্ছে তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে।

সে ঝড় গিয়ে প্রতিহত হচ্ছিল পুষ্পর অন্তরে। নিদারুণ অভিমানে বুক তার ভরে উঠছিল! তার আবাল্যের সাথী আজ এত লুকোচুরি করছে তার সঙ্গে,—কারণ, পুষ্প ভাব-প্রবণ! মহত্তর স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্ষুদ্রতম স্বার্থ বলি দেবার গুরুত্ব সে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই প্রয়োজন হ'লো পুষ্পর অগোচরে বিশুকে নির্দ্দেশ দেবার, কার্য্যোদ্ধার করতে। সঙ্ঘের তহবিল বাড়াবার প্রয়োজনীয়তা পুষ্প বোঝে না, সে জানে কেবল বন্ধু-প্রীতি! কিন্তু মূর্খ রজত রায়কে এ কথা কে বোঝাবে যে, নেতৃত্বের দম্ভে আজ সে আত্মবিস্মৃত হয়েছে। না হলে তার মনে পড়ত, মিনতিকে পুষ্প স্নেহ করে না,—করে ভয়।

কিন্তু সেও তো কখন রজতকে স্মরণ করিয়ে দেয় নি,—মিনতিকে তাদের ভয় করবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেন করেনি? অভিমানে, না সঙ্ঘ আইনের বাহ্যিক বিধি-নিষেধের ভয়ে?

—পুষু! হঠাৎ শুনল জড়িতস্বরে বিশু বলছে:—আজ আমার কত বড় শুভদিন!

পুষ্প একবার কেঁপে উঠেই নিজেকে সামলে নিল!

—একটা কথা কও পুষ্প!

পুষ্প আবার একবার কেঁপে উঠল। তারপর অস্ফুটস্বরে বলল: শুভদিন না দুর্দ্দিন!

বিশু হাসল। তারপর একহাতে পুষ্পর মুখটি তুলে ধরে ব্যথিতস্বরে বলল: পুষ্প যার জীবনে এসেছে, তার জীবনে কখনও দুর্দ্দিন আসতে পারে! কিন্তু এ কথা কেন বলছ পুষুরাণী!

—আমার জন্যে আজ আপনি কতবড় বিপদে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন!

—পুষু, পুষি, পুষুমনি, তোমায় নিয়ে আমি কী করবো! তোমার জন্যে আমি যে কিছুই করতে পারলাম না পুষুরাণী! এ দাবী নিয়ে তুমি কাল এলে না কেন!

—তার মানে? ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে পুষ্প সন্ত্রস্তভাবে বিশুর দিকে তাকাল।

—তুমি যে দাবী নিয়ে এসেছ, সে কাজ যে কাল রাত্রিতেই শেষ হয়ে গেছে পুষু!

পুষ্প আস্তে আস্তে খাটের দিকে সরে যেতে লাগল।

—কী হলো?—পুষ্পর কাছে এগিয়ে গিয়ে বিশু আবার তার হাত ধরতে গেল, কিন্তু মুখের দিকে নজর পড়তেই নিরস্ত হ'লো।

পুষ্পর চোখ দুটো তখন যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল! নিঃশ্বাস পড়ছিল ঘন ঘন! শাড়ীর আঁচলটা কুণ্ডলী পাকিয়ে

নিজের মুখের মধ্যে পুরে দিতে দিতে সে আতঙ্কগ্রস্তের মতো বিস্ফারিত চক্ষে বিশুর দিকে তাকিয়ে রইল !

—কী হ'লো ? চঞ্চল হয়ে বিশু আবার পুষ্পর হাত ধরবার চেষ্টা করল !

সঙ্গে সঙ্গে পুষ্প যেন ছিটকে ঘরের অপর প্রান্তে চলে গেল। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বলল : আপনি, আপনি আগে বলেন নি কেন ? উঃ মাগো……

—সেই কথাই তো বলছি পুষ্প। অত্যন্ত করুণ ভাবে বিশু বলল : তুমি যদি কাল আসতে……

বাধা দিয়ে পুষ্প বলল : আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি যান……

একটা ঢোক গিলে বিশু অভিভূতের মতো তাকিয়ে রইল।

—আঃ শুনতে পাচ্ছেন না ? পুষ্প এবার ধমক দিল : চলে যান না ! তবুও যাবেন না ? আঃ…

পুষ্প শেষে নিজেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল !

বাইশ

বিশুর অনুমান মিথ্যে নয়। বিভূতি তার জন্যে যেন ওঁৎ পেতেই বসেছিল। সে বাড়ী ফিরতেই বলে উঠল: আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই! আমাকে না বলে চট্ ক'রে বেরিয়ে গেলেন?

বিশু উত্তর দিল না। পুষ্পর ব্যবহারটা বড় মর্ম্মান্তিক হয়ে বেজেছিল তার মনে। নিজের স্খলিত পৌরুষের কথা স্মরণ করে নিজের কাছেই নিজেকে তার অত্যন্ত হীন মনে হচ্ছিল। এত ছোট সে—এতই দুর্ব্বল। এর পরে সমাজে সে মুখ দেখাবে কেমন করে। সে বিভূতির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অভিভূতের মতো একটা জান্‌লার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

—কথার উত্তর দিচ্ছেন না যে? কোথায় গিয়েছিলেন আপনি? কে সে লোকটা?

বিশু এবার চমকে উঠল। বিভূতির রূঢ়তায় সচেতন হ'য়ে তৎক্ষণাৎ সে ঘুরে দাঁড়াল। মুখে তার রক্তের চিহ্নমাত্রও ছিল না। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছিল।

বিশুর মুখের দিকে চেয়ে বিভূতিও নিজের ভুল বুঝতে পারল। সে তখন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তার একটা হাত চেপে ধরল।

তারপর উৎকণ্ঠিত ভাবে বলল : কী হয়েছে বিশুবাবু? কোথায় গিয়েছিলেন?

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিশু একটা চেয়ারের ওপর বসল। তারপর বলল : গিয়েছিলাম ডাক্-বাংলোয়। পুষ্প এসেছে...

—পুষ্প? বিভূতি যেন লাফিয়ে উঠল। বলল : সে কি, কেন এসেছিল?

কোন কিছু ভেবে-চিন্তে বলবার মতো অবস্থা বিশুর তখন ছিল না। তবুও সত্য কথা বলতে ভয় পেল সে। একটু ইতস্ততঃ করে বলল : এসেছিল আমার মতামত নিতে।

—কিসের মতামত?

—মিনতির বিপদে ও ওদের বাড়ীতে গিয়ে সমবেদনা জানাতে চায়।

—কিন্তু কাল রাত্তিরের ঘটনা ও জানল কেমন করে!—দুশ্চিন্তায় বিভূতির মুখ কালো হয়ে উঠল। বলল : রজত যা মৎলব করেছিল, তাতে এর বিন্দু-বিসর্গও তো তার জানবার কথা নয়।

বিশু বিবর্ণমুখে বলল : আমারও তো তাই ধারণা ছিল। হয়তো রজতবাবু নিজেই বলেছেন...

—No, never! বাধা দিয়ে উত্তেজিতভাবে বিভূতি বলল : রজত কখনও দু'রকম কথা কয় না। আপনি তাকে আজও চেনেন নি!

অতিশয় ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বিশু বলল : আমিও তো সেই কথাই ভাবছি। রজতবাবু কখ্খোন বলেন নি। কিন্তু কে তাহলে বললে? অথচ মুস্কিল হচ্ছে এই যে জিজ্ঞাসা করবারও উপায় নেই। সন্ধের সভ্য

হিসেবে পুষ্পর কাছে কোন কথা গোপন করবার অধিকারও তো দলপতির নেই।

বিভূতি চিন্তিত মুখে বলল: আচ্ছা, সে সব পরে সন্ধান নেওয়া যাবে। কিন্তু ঘোষালদের বাড়ীতে যাওয়া সম্বন্ধে আপনি তাকে কী বললেন?

—আমি কোন কথাই বলিনি! যেতে হয়, নিজের risk-এ যাবে।

—বারণ করলেন না কেন? অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বিভূতি বলল: কী মুস্কিল! চলুন আবার গোকুলনগরে, দেখি সেখানে কী ব্যাপার হচ্ছে।

বিশু বলল: সে কি মশাই! ঘোষালদের সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথাটা যে তাহলে এবার প্রকাশ হয়ে পড়বে।

—তাও তো বটে! তাহলে কী করি?—বিভূতি হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠল। বলল: নাঃ এই মেয়েগুলোই দেখছি সব ডোবাবে! রজতটাকে তখনই বারণ করেছিলাম, মেয়েদেরকে এসবের মধ্যে ঢোকাস নি। এখন হ'লো তো?

বিভূতির ক্রোধ দেখে বিশু হাসল। বলল: ও সব গোলমাল নিয়ে আপনারা পুরোণ মেম্বররা মাথা ঘামান মশাই, আমাকে উপস্থিত বিদায় দিন।

—আপনি আবার কোথায় যাবেন?

—ভাবছি এই সন্ধ্যের ট্রেণে দেশে চলে যাই! ছ' বছর যাইনি…

বাধা পড়ল। চাকর এসে বিভূতিকে বলল: আপনার টেলিগেরাপ এসেছেন!

বিভূতি ব্যস্তভাবে নীচে গিয়ে টেলিগ্রাম গ্রহণ করল। খবর সংক্ষিপ্ত! রজত জানাচ্ছে: অপেক্ষা করো, চিঠি যাচ্ছে।

যাক, দলপতির হুকুম আসছে। বিভূতি নিশ্চিন্ত হয়ে বলল: আর নিজের দায়িত্বে কাজ করতে হবেনা।

দায়িত্বের কথায় বিশু মনে মনে হাসল। রজতের দায়িত্বজ্ঞান যে কত প্রচণ্ড সে কথা তার আর জানতে বাকি নেই। গোকুলনগর অভিযানের পূর্ব্বদিনেও রজত তাকে ভরসা দিয়েছিল: action-এর সময় সে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু আসল কাজের সময় তার টিকি দেখা যায়নি। মুক্তি-সঙ্ঘের সভ্য হিসাবে নবাগত হলেও তার দলপতিটিকে ইতিমধ্যে সে হাড়ে হাড়ে চিনেছে। সত্যকার বিপদের সম্মুখীন হবার সাহস তার এতটুকুও নেই অথচ পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে অদ্বিতীয়। লোকটার বুদ্ধি আছে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আসলে সে যে একটা বাক্-সর্ব্বস্ব, সুযোগবাদী কাপুরুষ সে কথা বিভূতির মতো ভক্তদের বোঝাতে যাওয়াও মুস্কিল। অতি-ভক্তির আতিশয্যে রজত সম্বন্ধে মস্তিষ্ক এদের অচেতন, চিন্তাশক্তি নিঃশেষে বিলুপ্ত। এদের কাছে যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করার সরল অর্থ নিজেকে বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন করা।

—যাক্ বাবা বাঁচা গেল! একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বিভূতি আবার বলল: রজতের চিঠি বোধ হয় কাল সকালেই এসে পৌঁছবে, কী বলেন?

—বোধ হয়। কিন্তু আমাকে মশাই দয়া করে বিদায় দিন....

—আপনি তো অদ্ভুত লোক মশাই! কাল রাত্তিরে তো দেখলাম

আপনার দুঃসাহসের অন্ত নেই ! আর আজ এতখানি ইয়ে হ'য়ে গেলেন ?

—ইয়ে মানে ? আপনার কি ধারণা আমি ভয় পেয়েছি ?

—না ঠিক ভয়ের কথা নয় ! কিন্তু —বিভূতির মুখে যথোচিত ভাষা জোগাল না। সে শেষে বলল : কিন্তু আপনি সত্যিই অদ্ভুত ! রজত বলেছিল ঠিক—

—তিনি আবার কী বলেছিলেন ? বিশু উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠল।

বিভূতি বলল : সে ঠিকই বলেছিল। আপনি সত্যই একটি অদ্ভুত লোক। সঙ্ঘে যোগ দেবার আগে পর্য্যন্ত আপনি নাকি কখনও রিভল্‌ভার হাতে করেননি। কিন্তু চাঁদ-মারি করতে গিয়ে মাত্র তিন দিনের মধ্যেই আপনি সব পুরোণ মেম্বরদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। মোটর চালাতে, ঘোড়া হাঁকাতে,—সব কিছু শিখতে গিয়েই আপনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। অথচ, মাঝে মাঝে আপনি এমন ভজ মেরে যান্—

—ভজ মেরে যাই ?

—মানে বোকার মত এমন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন যে, মনে হয়...

এই সময় রাস্তা কাঁপিয়ে প্রকাণ্ড একটা মোটর চলে গেল। এ রাস্তা দিয়ে এ ধরণের মোটর সাধারণত চলে না। তাই কৌতূহলী হ'য়ে কার মোটর দেখতে গিয়েই বিভূতি চমকে উঠল। বলল : ও মশাই, S. P. গেল যে ! ব্যাপার বড় সুবিধের হবে বলে মনে হচ্ছে না।

—হুঁ, কিন্তু আমি সরে পড়ি। বিশু চঞ্চল হয়ে একেবারে উঠে দাঁড়াল।

বিভূতি এবার চটে গেল। বলল: আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই! শুনছেন দলপতির চিঠি আসছে, তবুও পালাতে চাইছেন? দায়িত্ব কি আমার একলার নাকি?

এরপর বিশু আর কোন কথা বলতে ভরসা করল না।

দলপতির নির্দ্দেশ এল পরদিন মধ্যাহ্নে। চিঠি পড়ে বিভূতি বলল: যাক বাবা বাঁচা গেল। নিন পড়ুন।

চিঠিখানা প্রকাণ্ড। কিন্তু সমাচার সংক্ষিপ্ত। সঙ্কেত অনুযায়ী মর্ম্মোদ্ধার করে বিশু দেখল: রজত উপদেশ দিয়েছে, পূর্ব্বাহ্নে চাঞ্চল্য প্রকাশ করে যেন কাউকে সন্দিগ্ধ করে তোলা না হয়। উপস্থিত স্বাধীন মানুষের মত নির্ব্বিকারভাবে ঘুরে ফিরে বেড়ানই বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর বিপদে অতিরিক্ত সহানুভূতি দেখাতে যাওয়ার সরল অর্থ নিজেকে বিপদাপন্ন করা—ইত্যাদি ইত্যাদি, আরও অনেক উপদেশ দিয়েছে সে। কিন্তু সব কিছুই লিখেছে সে বিভূতিকে। চিঠির মধ্যে বিশু সম্বন্ধে একটা কথাও কোথাও নেই!

বিশু মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তারপর বিভূতিকে চিঠিটা ফেরৎ দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল: এখন আমাকে ছেড়ে দিতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি হবে না।

—আপনি তো আশ্চর্য্য লোক মশাই। সত্যি যাবেন নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিশু আর কথা না বাড়িয়ে যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করে দিল।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই বিশু ষ্টেশনে এসে পৌছল। সঙ্গে সঙ্গেই দূরে একটা আপ ট্রেণের গর্জ্জন শোনা গেল। বিশুর গন্তব্যস্থল আরও আপ-এ। সে তাড়াতাড়ি টিকিট কাটতে ছুটল। আর কয়েক মিনিটের অপেক্ষা মাত্র। তারপরেই সে নিরাপদ হতে পারবে। বিভূতির প্ররোচনায় এ দুদিন এখানে অপেক্ষা করে সে অত্যন্ত অন্যায় করে ফেলেছে। এ অন্যায়ের সীমা নেই। হয়ত শুধু এইটুকুর জন্যেই একদিন তাকে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হবে। হে ভগবান! আর মিনিট দুয়েকের জন্যও তুমি তার সহায় হও। তারপর একবার ট্রেণে চেপে বসতে পারলে...

আপ-ট্রেণখানা হুড়মুড় করে ষ্টেশনের মধ্যে ঢুকল। বিভিন্ন কণ্ঠের বিচিত্র কলরবে স্থানটা যেন নিমেষে সচকিত হয়ে উঠল। বিশুও ছুটতে আরম্ভ করল একটা থার্ড ক্লাশ কামরা লক্ষ্য করে। কিন্তু বাধা পড়ল।

হঠাৎ একটা সেকেণ্ড ক্লাশ কামরা থেকে রজতকে নামতে দেখে সে অসহিষ্ণুভাবে একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু পরক্ষণেই সচেতন হয়ে দৌড়বার উপক্রম করতেই পেছনে ডাক্ শোনা গেল:

—একি বিশুবাবু যে—

রজতের পিছনে শুভেন্দুকে দেখে বিশুর অবস্থা একেবারে বজ্রাহতের মতো হ'য়ে গিয়েছিল।

শুভেন্দু মুচকে হেসে আবার বলল: আপনি এদিকে হঠাৎ?

বিশুর মুখের অবস্থা লক্ষ্য করে রজত তাড়াতাড়ি বলল: আপনিও খবরের কাগজ পড়ে বেরিয়ে পড়ছেন নাকি? বলেই, শুভেন্দুর পেছনে এক পা সরে গিয়ে বিশুকে ইসারা করল।

রজতের উপস্থিতিতে ভরসা পেলেও বিশুর আড়ষ্ট ভাবটা কিন্তু একেবারে গেল না। সে বলল: সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম মিঃ ঘোষালের দেশের বাড়ীতে একটা mishap হয়ে গেছে তাই…

রজত বলল: আমরাও খবরটা শুনে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আপনিও এই ট্রেণে আসছেন বুঝতে পারিনি তো—

কিন্তু শুভেন্দু কোন কথা কইল না। শুধু ভদ্রভাবে একটু হেসে অগ্রসর হলো।

শুভেন্দুর হাসিটা বিশুকে আরও দমিয়ে দিল। সে সভয়ে কটাক্ষ করল রজতের দিকে।

রজত সে কটাক্ষের ওপর কোন রকম গুরুত্ব না দিয়ে, সহজ গলায় শুভেন্দুকে বলল: এই, এখানে গাড়ী-টাড়ী পাওয়া যাবে তো? ওদের বাড়ী তো শুনলুম ষ্টেশন থেকে ছ' মাইল দূরে।

—দেখা যাক! শুভেন্দু অন্যমনস্কের মতো জবাব দিল।

তারপর রজত তার টিকিট দিয়ে ষ্টেশন-গেটের বাইরে এল। বিশুও তার সদ্য-কেনা টিকিটটা কলেক্টারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে রজতের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। শুভেন্দু এসে ওদের সঙ্গে মিলিত হলো সকলের শেষে।

ষ্টেশনের বাইরে যাত্রীর অপেক্ষায় অনেকগুলো ঘোড়ার গাড়ী ও মোটর দাঁড়িয়েছিল। তার মধ্যে সেই পুরোণ মডেলের ফোর্ডখানাও ছিল। গাড়ীর শিখ ড্রাইভার বিশুকে চিনতে পেরেই তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল।

বিশুর অবস্থা তখন কল্পনাতীত, সে হঠাৎ রজতের একটা হাত মুঠো করে ধরল।

শিখ যুবকটির ব্যবহারে রজতও সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। সে বিশুর হাতে একটু চাপ দিয়ে তাকে ভরসা দিল। তারপর শুভেন্দুর উদ্দেশে বলল: এই এইটেতেই ওঠ, সস্তা হবে।

শুভেন্দুর মনের ভাব বোঝা গেল না। সে গম্ভীরভাবে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল। রজত ও বিশু বসল পেছনের আসনে।

গাড়ী ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই রজত পকেট থেকে একটা ছোট নোট বই বার করল। তারপর তার খাপ থেকে পেন্সিলটা খুলে নিয়ে শুভেন্দুর সঙ্গে গল্প করার ফাঁকে ফাঁকে লিখে যেতে লাগল: action-এর পর এখানে থাকবার বুদ্ধি আপনাকে কে দিল?

গাড়ীর ঝাঁকানিতে লেখা এঁকে বেঁকে গেলেও বিশুর পক্ষে তা বোঝা কষ্টকর হলো না। সেও রজতের হাত থেকে খাতা পেন্সিল নিয়ে লিখল: বিভূতি। আরও একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। action-এর পরদিন সকালে আমরা spot-এও গিয়েছিলাম।

—এও কি বিভূতির পরামর্শ?

—সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু আমার কি আবার সেখানে যাওয়া উচিত হবে?

—শুভেন্দুর উপস্থিতিতে এ ছাড়া আর উপায় কী! কিন্তু সাবধান। আপনার মনের ভাব অত স্পষ্ট হয়ে চোখে মুখে ফুটে উঠছে কেন?

এই সময় গাড়ীটা হঠাৎ থেমে গেল। বিশু চমকে উঠে দেখল ড্রাইভার গাড়ী থামিয়েছে বিভূতির বাড়ীর সুমুখে।

—রোকা কাহে? রজত প্রশ্ন করল।

ড্রাইভার উত্তর দিল বিশুর দিকে চেয়ে: কোঠি তো আ গ্যাইল।

বিশু এবার সন্ত্রস্তভাবে তাকাল শুভেন্দুর দিকে। দেখল, সেও তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

আবার গোলযোগ। রজত আর কত সামলায়! বিরক্তি চেপে সে প্রশ্ন করল, এ কোঠি কিস্‌কা?

—ওকীল সাহাব কা।

—ওঃ, তাই তুমি গাড়ী থামিয়েছ। রজত সহাস্যমুখে বলল: না হে না, আমরা ওকীল সাহেবের চাইতেও ঢের বড় লোকের অতিথি। গোকুলনগর জমিদার-বাড়ী চল।

ড্রাইভার ইতিমধ্যেই গাড়ীর এঞ্জিন বন্ধ ক'রে ফেলেছিল। রজতের কথায় একটু বিস্মিত হয়ে আবার সে গাড়ীতে ষ্টার্ট্‌ দিল।

মিনিট খানেক পরে হঠাৎ শুভেন্দু বিশুকে প্রশ্ন করল: রমেশ আপনার কী সম্পর্কে দাদা হয় বিশুবাবু?

বিশুর বুক আবার কেঁপে উঠল। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? বলল: গ্রাম সম্পর্কে। কিন্তু রক্তের সম্বন্ধ না থাকলেও, আমি জানি ওঁর চেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী আমার আর কেউ নেই।

—হুম্‌।

রমেশ চৌধুরীর পরিচয় রজতের অজানা নয়। তবুও সে প্রশ্ন করল: রমেশ কে?

শুভেন্দু কোন উত্তর দিল না। তখন বিশু বলল: রমেশ, মানে S. B.-র রমেশ চৌধুরী, শুভেন্দুবাবুর ভগ্নীপতি ...

—ওহো, বন্দনা সেদিন যাকে বিয়ে করলে? তা তাকে সঙ্গে আনলি না কেন। এ কেস্‌টায় তোকে সাহায্য করতে পারত।

বিশু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। বলল : শুভেন্দুবাবু কি এ কেশটা হাতে নিয়েছেন নাকি ?

রজত তখনও শুভেন্দুর দিকে চেয়েছিল। সেই ভাবেই সে বিশুর কথার উত্তর দিল : হ্যাঁ। ওর প্রতিজ্ঞা, Officially যদি নাও পারে Unofficially এ কাজ ও করবেই। ঘোষালদের সঙ্গে পরিচয় তো ওর আজকের নয়। তুই তোর ভগ্নীপতিকেও সঙ্গে নে, বুঝলি ?

শুভেন্দু অন্যমনস্কের মতো বলল : দেখা যাক্—

তেইশ

বিশুরা যখন মিনতিদের বাড়ীতে এসে পৌছল, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মিঃ ঘোষাল তখন বাড়ী ছিলেন না; পুলিশের কাছ থেকে লাস্ উদ্ধার ক'রে তিনি শ্মশানে গিয়েছিলেন পিতার শেষ কৃত্য সমাপন করতে। মিনতি বাড়ীর মধ্যে ছিল; খবর পেয়ে বাইরে এল।

মিনতির চেহারার পরিবর্ত্তন দেখে বিশু অত্যন্ত ব্যথিত হলো। অবিশ্রাম ক্রন্দনে মুখ-চোখ তার ফুলে উঠেছিল, তার ওপর অকস্মাৎ অনভ্যস্ত ও অনিয়মিত জীবন যাপনের ফলে শরীরও তার অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। পিঠের ওপর একরাশ রুক্ষ কোঁকড়ান চুল এলিয়ে শ্রান্তপদে সে যখন বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল তখন সত্যই যেন তাকে মূর্ত্তিমতী বিষাদ প্রতিমার মতো মনে হচ্ছিল।

সকলেই যথাযথভাবে শোক প্রকাশ করল। বাড়ীর ভেতর থেকে কয়েকজন আত্মীয়স্থানীয় প্রবীণ ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে রজতদের সঙ্গে আর এক দফা শোক প্রকাশ করলেন। ফলে মিনতির অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল। শেষে আর সামলাতে না পেরে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

খবর নিয়ে জানা গেল, শ্মশান বেশী দূরে নয়,—মাইল দুয়েকের

মধ্যেই। শুনে রজত প্রস্তাব করল সেখানে যাবার। শুভেন্দু এবং বিশুও সম্মত হলো। তারপর ঘোষাল-বাড়ীর একজন কর্ম্মচারীকে পথপ্রদর্শক ক'রে সকলে রওনা হয়ে পড়ল।

ওরা যখন শ্মশানে গিয়ে পৌঁছল তখন সেখানে সব শেষ হয়ে য়েছিল। মিঃ ঘোষাল তখন তাঁর শ্মশান-বন্ধুদের সঙ্গে নদী থেকে কলসীভরে জল এনে পিতার নির্ব্বাণোন্মুখ চিতার ওপর ঢালছিলেন। রজতদের দেখে তিনি অত্যন্ত সুখী হলেন। হেঁকে বললেন: তোমরা আর এগিও না,—ছুঁলে নাইতে হবে।

পল্লীগ্রামের এই শ্মশানগুলো সাধারণতই একটু নির্জ্জন। কিন্তু গোকুলনগরের মৃত জমিদারকে উপলক্ষ্য করে সেদিন সেখানে জনতার সৃষ্টি হয়েছিল। সকলেই চেষ্টা করছিল তাদের নতুন জমিদারকে সমবেদনা জানাতে। কেউ বা জল্পনা-কল্পনা করছিল এই অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে। রজত ও শুভেন্দু মনোযোগের সঙ্গে তাদের কথাবার্ত্তা শুনতে লাগল।

শুধু বিশু অবসন্নের মতো একটা নির্জ্জন জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল। তারও দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। মিনতিদের বাড়ীতে ঢোকবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তার ভয় ছিল,—যদি তাকে কেউ চিনতে পারে তাহলে কী হবে! শুভেন্দু যখন জানতে পারবে গতকাল পুলিশি-তদন্তের সময় সে এ বাড়ীতে উপস্থিত ছিল, তখন সে কী করবে! কিন্তু এখন আবার আর একটা সমস্যা তাকে ব্যাকুল ক'রে তুলল। পুষ্প-সংক্রান্ত ব্যাপারটাকে সে কী ভাবে রজতের গোচর করবে। অবশ্য ঘটনাটা একেবারে চেপে যেতে পারলে তার ও পুষ্প উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল হতো।

কিন্তু সে উপায় নেই! মূর্খের মতো কথাটা যখন সে একবার বিভূতিকে বলে ফেলেছে, তখন রজত জানতে পারবেই। সুতরাং নিজের বিপদ সে নিজে ডেকে আনবে না। বিভূতির সঙ্গে দেখা হ'বার পূর্ব্বে নিজেই সে রজতকে ব্যাপারটা জানাবে। কিন্তু এর পরিণাম কী!

শেষে নিজেরই ভালবাসার ধনকে বিপদে ফেলতে হ'বে তাকে! এমনি করেই বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে হ'বে তাকে নিছক নিজের নিরাপত্তার জন্যে। এমন ভাবে তাকে আর কতদিন বেঁচে থাকতে হ'বে!—নিদারুণ আত্মগ্লানিতে—সেই অন্ধকারের মধ্যেও বিশু [illegible] হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকোল।

দেশের লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবার জন্যে একদিন সে স্বেচ্ছায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কংগ্রেসের অহিংস-আন্দোলনে। কাজ কিছুই হলো না; শুধু দীর্ঘকাল জেল্ খাটাই সার হলো তার। তাই, সেদিন সে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল কংগ্রেসের ওপরে। কংগ্রেসের অহিংসা-পন্থী আপোষ-প্রয়াসী নেতাদের ওপর সেদিন আস্থা বলতে তার আর কিছুই ছিল না। সেইজন্যেই সে অত আগ্রহ নিয়ে যোগ দিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীর দলে—কাজ করবার প্রেরণায়।

সেদিন সে মনকে চোখ ঠারেনি। যুক্তি-প্রবণ মন তার সেদিন সত্যই উপলব্ধি করেছিল: অহিংসার পথ শুধু দীর্ঘসূত্রই নয়, এ পথের শেষে আছে নিরঙ্কুশ ব্যর্থতা। এ পথ অভিনব হতে পারে, কিন্তু সত্যকার বিপ্লববাদের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। এ পথের পথিকেরা আসলে হচ্ছে আশা-বাদী! তথা-কথিত বৈষ্ণবদের মতো এঁরাও যেন হ্বয়া ঋষিকেশের দোহাই পেড়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে পথ চলতে চান্। শুধু

আশা—যদি ইংরেজ এঁদের কৃচ্ছ্র-সাধনা দেখে দয়াপরবশ হ'য়ে বরদান করেন।

অথচ বিবর্ত্তনের গতিটা একটু বাড়িয়ে দিলেই তো বিপ্লবের ফল পাওয়া যেতে পারে। সেদিন নিজেকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে বিশুর যুক্তির অভাব হয়নি। দীর্ঘকাল বন্দী থাকবার ফলে, যে-প্রাণশক্তি তার মুমূর্ষুর মতো ধুঁকছিল, সেদিন হঠাৎ যেন সেটা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। সেদিন সত্যই কে যেন তার অন্তরের মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। তাকে শুনিয়েছিল আশার বাণী: তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীন হিন্দুস্থান দান করবো! তাই সেদিন সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, শেষপর্য্যন্ত পিছল পথেই যদি তাকে চলতে হয় তাহলে অনুগ্রহ-প্রয়াসীদের লালা-সিক্ত পিছল পথে সে আর চলবে না। অতীত বিস্মৃত হয়ে আবার নতুন করে যাত্রা সুরু করবে সে। এ পথও পিচ্ছিল। কিন্তু রক্ত-পিচ্ছিল। ফলে—

সেদিনকার বিশু মরে গেল! দেশোদ্ধার করা চুলোয় গেল তার। আজ তার একমাত্র পরিচয়—সে নরহন্তা।

আজ তার শিক্ষা-দীক্ষার প্রশ্ন অবান্তর। বুদ্ধি হিংসাদুষ্ট, হত্যা-প্রয়াসী। বিবেকের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নেই। শাঁথের করাতের মতো একদিকে পুলিশ অপরদিকে সঙ্ঘ-দণ্ডভীতি প্রতিনিয়ত তার মনুষ্যত্বকে ক্ষত-বিক্ষত করে চলেছে। এমনি করেই তাকে তিলে তিলে আত্মদান করতে হ'বে।

কিন্তু অকারণ আত্মদান করাই যদি তার বিধিলিপি হয়, তাহ'লে আত্মহত্যায় ক্ষতি কী? ধারাবাহিক উৎপীড়নের কবল থেকে আত্মরক্ষা

করবার একমাত্র পন্থাই তো হচ্ছে আত্মহত্যা। তার এ অধিকারে বাধা দেবার তো কেউ নেই—

বিশু মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাল। অদূরেই নবগঙ্গা। রাতের অন্ধকারে আসল রূপ তার প্রত্যক্ষীভূত না হ'লেও তার উদ্দাম প্রাণ-স্পন্দন কানে ভেসে আসছিল। বিশু চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল। সঙ্কল্পে অটল থাকতে পারলে তার মতো সাঁতারুও এই মুহূর্ত্তে নিশ্চিন্ত হতে পারে। নবগঙ্গার কুম্ভীর-খ্যাতি বর্ত্তমানে ভৈরবের সমতুল্য। কিন্তু—

খবরটা শুনে পুষ্প কী করবে? সামান্য একটা দীর্ঘশ্বাস,—মাত্র দু' ফোঁটা চোখের জল।—এও কি বিশু আশা করতে পারে না?

না। বিশু তাকে ভাল করেই জানে। পুষ্পর সংস্কারে আত্মহত্যা বুদ্ধি-জীবির কাজ নয়। সুতরাং বিগত দিনের কথা স্মরণ করে সে আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে। একটা অপদার্থের সঙ্গে তার মুখেরও আলাপ ছিল,—এ স্মৃতি তাকে আরও কঠিন করে তুলবে।—বিশু আবার বসে পড়ল।

—সুখবর আছে মশাই। রজত এসে পাশে বসল। বলল: গতকাল সকালে ঘোষাল-বাড়ীতে যারা লাশ দেখতে এসেছিল তারা সকলেই স্থানীয় লোক, পরস্পর পরিচিত।

—ঠিক্ শুনেছেন? বিশু আশান্বিত হয়ে উঠল।

—একেবারে নীট্ খবর। আপনার পোষাক কী ছিল?

—খাকীর সর্ট-সার্ট।

—সেইজন্যেই ওরা আপনাকে পুলিশের লোকের সঙ্গে গোলমাল করে ফেলেছিল।

—সম্ভব। কিন্তু আমারও একটা দুঃসংবাদ দেবার আছে।—রজতের মেজাজ দেখে একটু ভরসা পেয়ে বিশু বলল: গতকাল পুষ্প দেবী এখানে এসেছিলেন—

—এখানে মানে?—রজত যেন লাফিয়ে উঠল।—মিনুদের বাড়ীতে?

—না, গোবিন্দপুর ডাক্-বাংলোয়।—পুষ্প সম্বন্ধে বিশু বিভূতিকে যে গল্পটা বলেছিল রজতকেও তাই বলল। শুনে রজত অভিভূতের মতো বসে রইল।

বিশু আবার বলল: কিন্তু কে বিশ্বাসঘাতকতা করে ওঁকে খবরটা দিলে সেটা তো জানা দরকার।

—সেটা যথা সময়েই জানা যাবে'খন।—রজত যেন একটু বিরক্ত হয়েই বলল: এখন চলুন, ওদিকে কী হচ্ছে দেখি—

মৃতের শেষ চিহ্নটুকু নবগঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে, স্নান সেরে, উত্তরীয় পরে মিঃ ঘোষাল যখন রজতদের সঙ্গে বাড়ী ফিরলেন, তখন ভোর হয়ে গিয়েছিল। সদরে লোহা ছুঁয়ে, আগুন পুইয়ে, নিম্ পাতা জিভে দিয়ে শ্মশানবন্ধুরা যখন হরিধ্বনি সহকারে গৃহ-প্রবেশ করলেন অন্দরে তখন আবার ক্রন্দনের রোল উঠল। ব্যাপার দেখে মিঃ ঘোষাল সকলের সঙ্গে বাইরেই রয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে শ্মশানবন্ধুরা মিছরীর সরবৎ খেয়ে বিদায় গ্রহণ

করলেন। তখন মিঃ ঘোষাল ভৃত্যকে ডেকে বললেন: ওরে, মিনুকে একবার এখানে পাঠিয়ে দে তো।

চাকর চলে গেল। মিঃ ঘোষাল তারপর রজতের উদ্দেশ্যে বললেন: মেয়েটা সেই কাল থেকে কাঁদছে,—কেউ দেখবার নেই।

একজন দাসীর সঙ্গে মিনতি এসে ঘরে ঢুকল। পিতার উত্তরীয় পরিহিত চেহারা দেখে আবার চঞ্চল হ'য়ে উঠল সে। মিঃ ঘোষাল তৎক্ষণাৎ তাকে নিজের পাশে বসিয়ে নিয়ে বললেন: ছিঃ মা! এ দুর্ব্বলতা তোমার সাজে না। বেশী কাঁদলে তোর দাদু কী আর ফিরে আসবে রে!

ফলে বিপরীত হ'লো। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মিনতি, পিতার কোলের মধ্যে মুখ লুকোল।

মিনতির অবস্থা দেখে সকলেরই চোখ অশ্রুসজল হ'য়ে উঠল। কিন্তু বিশু হঠাৎ যেন কেমন হ'য়ে গেল। গত-পূর্ব্ব রাত্রের হত্যা বিভীষিকার ছবিটা যেন আবার জ্বলজ্বল ক'রে উঠল তার চোখের সম্মুখে। চোখে তার অশ্রুর চিহ্নমাত্রও ছিলনা; তবুও সে রুমাল বার ক'রে অকারণ চোখদুটো রগড়াতে লাগল।

মিঃ ঘোষাল এতক্ষণ মিনতির মাথায় হাত বুলোচ্ছিলেন। হঠাৎ কঠোরস্বরে বলে উঠলেন: কাঁদিস্ নে মিনু, শোন! আমি তোকে কথা দিচ্ছি, যারা এ কাজ করেছে, তাদের আমি শাস্তি দোবই। আমার শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত ব্যয় ক'রে আমি তাদের খুঁজে বার করবো—

মিঃ ঘোষালের উগ্রস্বর শুনে সকলেই তাঁর দিকে তাকাল।

বিশুরও হাত থেকে রুমালটা পড়ে গিয়েছিল। সে সাতঙ্কে চেয়ে রইল শুভেন্দুর দিকে।

রজত তখন আস্তে আস্তে রুমালটা কুড়িয়ে নিয়ে বিশুর হাতে দিল!

রজতের স্পর্শে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বিশু শুনল মিঃ ঘোষাল বলছেন: মুস্কিল হয়েছে মেয়েটাকে নিয়ে। এখানকার কারুর সঙ্গেই এর শিক্ষা-দীক্ষার মিল নেই। এদের সঙ্গে মিশতেও পারে না বেচারা। অথচ এই সময় এমন লোকের দরকার যারা ওকে গল্প করে,—কথা ক'য়ে অন্যমনস্ক রাখতে পারবে। কিন্তু......তোমরা কেন দু' একদিন এখানে থেকে যাও না বাবা!—খুব বেশী অসুবিধে হ'বে কী?

রজত বলল: নাঃ, অসুবিধে আর কী! তবে বিশুবাবুর চাকরী রয়েছে......

বিশু তাড়াতাড়ি বলল: না না, আমার কোন অসুবিধে হবে না!

বিশুর ভাব-ভঙ্গি দেখে রজত ইতিমধ্যে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছিল। তাই তাকে এখান থেকে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে অজুহাত তুলল: কিন্তু, অফিসে একটা খবর দেওয়া তো দরকার! আপনি বরং......

—কোন দরকার নেই! বাধা দিয়ে তাচ্ছিল্যভরে বিশু বলল: সে চাকরী আমি ছেড়ে দিয়েছি!

খবরটা তখনও পর্য্যন্ত রজতের জানবার সুযোগ হয়নি। সে আশ্চর্য্য হয়ে বলল: সে কি?

—সে অনেক কথা।

কথাটা বিশু প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নয় দেখে আর কেউই কোনরূপ আগ্রহ দেখাল না। এ সমাজের এই নিয়ম!

শুভেন্দু এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, হঠাৎ বলল: আমাকে আজই একবার কলকাতায় যেতে হ'বে, জরুরী কাজ আছে।

—ফিরবে কবে? মিঃ ঘোষাল বেশ সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন।

—বোধ হয়, কাল।

এই সময় চা ও জল খাবারের সরঞ্জাম নিয়ে দু'জন ভৃত্য এসে ঘরে ঢুকল। সকলেই চায়ের পেয়ালা টেনে নিল। শুধু বিশু খাবারের প্লেটটা টেনে নিয়ে চায়ের পেয়ালা সরিয়ে রাখল।

রজত ভৃত্যটিকে বলল: ও বাবু চা খান্ না। ওটা তুমি নিয়ে যাও।

—কে চা খায় না?—মিঃ ঘোষাল আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: বিশু? সে কী হে? আজকালকার ছেলে চা খাও না?

উত্তর দিল শুভেন্দু: আগে শুনেছি খুবই খেতেন। চা না পাওয়ার জন্যে জেলের মধ্যে নাকি একবার অসুস্থও হ'য়ে পড়েছিলেন। তারপর নেশাটা যখন একবার ছেড়েই গেল, তখন নতুন ক'রে আর ধরলেন না।

নিজের পেয়ালা শেষ ক'রে মিঃ ঘোষাল বললেন: আশ্চর্য্য মনের জোর তো। আমি তো বাপু অশৌচ অবস্থাতেও না খেয়ে থাকতে পারলাম না। তা, নেশার বাধ্য যত না হওয়া যায় ততই তো ভাল—

—নিশ্চয়ই। শুভেন্দু বলল: আবার যদি কখনও জেলে যেতে হয়, তখন আর কষ্ট হ'বে না। কী বলেন বিশুবাবু?

মিঃ ঘোষাল হেসে উঠলেন। বললেন : কী হে, আবার জেলে টেলে যাবার ইচ্ছে আছে নাকি?

বিশু উত্তর দিল না। কিন্তু কথাটা শুভেন্দু রহস্য ক'রে বলল কি না ঠিক্ বুঝতে না পেরে তার মুখ শুখিয়ে গেল। সে সভয়ে রজতের দিকে তাকাল।

রজত ঠুক্ করে নিজের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে একটু হেসে বলল : আমি কিন্তু জানি, কিছুদিন পূর্ব্বে একজনের অনুরোধে বিশুবাবু চা খেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বিশুর মুখ আরও শুখিয়ে গেল। সে উৎকণ্ঠিতভাবে মিনতির দিকে তাকাল। মিনতিও চাইল।

—তাই নাকি? শুভেন্দু মুচকে হেসে বলল : বিশুবাবুর তাহলে আর একটা পরিচয়ও আছে। কিন্তু কে সেই একজন বলুন তো? আমাদের পুষ্প দেবী নিশ্চয়ই নন্?

শুভেন্দুর কথা বলবার ধরণটা কারুরই ভাল লাগল না। সকলের মুখই গম্ভীর হয়ে উঠল। হঠাৎ রজত বিশুর জানুর ওপর একটা সজোর চপেটাঘাত ক'রে বলল : বলুন না মশাই, সেদিন রাত্তিরে 'র‍্যাড্‌ভেঞ্চারের' কাহিনী শোনাতে গিয়ে কী ফ্যাঁসাদে পড়েছিলেন।

র‍্যাড্‌ভেঞ্চারের ইঙ্গিতে রজতের আসল উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে বিশুর বিলম্ব হ'লো না। বলল : আজ্ঞে না, পুষ্প দেবী ঠিক্ সে শ্রেণীর ভদ্র মহিলা নন্। আমি যাঁর জবরদস্তিতে চা খেতে বাধ্য হয়েছিলাম তিনি আপনারি ভগ্নী বন্দনা দেবী।

—হুম্। মুখ কালো ক'রে শুভেন্দু বলল : এক কাপ্ নয়,—

আপনি সেদিন এক কেট্‌লি চা খেয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমার বেশ মনে আছে, চা খাওয়ার জন্যে সেদিন আপনাকে কেউ অনুরোধ করেনি।

কথাটা সত্য। কিন্তু বিশু ঘাবড়াল না। উত্তেজিত হ'লে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তার আরও তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠত। সে এতটুকুও ইতস্ততঃ না ক'রে বলল: না, আপনি তখন উপস্থিত ছিলেন না। —তারপর আর সকলকে উদ্দেশ করে বলল: উঃ, সে কী জবরদস্তি। সমস্ত রাত ঘুমোতে তো দিলেনই না, তার ওপর রাত দেড়টার সময় ইলেকট্রিক্ ষ্টোভ্ জ্বেলে আব্দার ধরলেন, চা খেতেই হ'বে। উঃ, শেষে আমায় পালিয়ে গিয়ে ড্রইংরুমের খিল বন্ধ করতে হলো।

দু'জনের কথাবার্ত্তার ভঙ্গি দেখে মিঃ ঘোষাল পূর্ব্বেই গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করেছিলেন। এবার রজতও ভ্রূকুঞ্চিত করল। কিন্তু শুভেন্দু নিরস্ত হ'লো না। বিশুর মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে সে বলল: কিন্তু আপনি তো খিল্ বন্ধ করবার জন্যে ড্রইংরুমে ঢোকেন নি। ঢুকেছিলেন টেলিফোন করার জন্যে—

—স্রেফ্ ধাপ্পা।—নিজের সৃষ্টি মিথ্যের বেড়াজালে বিশু যতই জড়িয়ে পড়তে লাগল ততই তার জেদ্ বাড়তে লাগল মিথ্যেটাকে সত্য প্রতিপন্ন করবার জন্যে। শেষে মিথ্যার বেসাতীতে চরম সাফল্য লাভ করবার আশায় একটা উচ্চাঙ্গের রহস্যময় হাসি হাসবার চেষ্টা করে সে বলল: আপনার ভগ্নীটির কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যেই আমি ওই ধাপ্পাটা মেরেছিলাম। এই সামান্য কথাটাও বুঝতে পারলেন না?

—না! শুভেন্দু নির্বিকার মুখে বলল: বংশী আপনাকে সত্যিই টেলিফোন করতে দেখেছিল।

—আঃ!—অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে রজত এবার বলল: কী একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তোরা কথা কাটাকাটি আরম্ভ করলি বল্ তো? ছিঃ...

মুচ্‌কে হেসে শুভেন্দু এবার নিরস্ত হলো।

চব্বিশ

অত্যধিক উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াটা বিশুর যথাসময়েই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সেটা উৎকট হ'য়ে উঠল অপরাহ্ন বেলায়।

শুভেন্দুর সঙ্গে কথা কাটাকাটির ফলে সে নিঃসন্দেহ হয়েছিল,—ভরাডুবি আসন্ন। শুভেন্দু যখন তার টেলিফোন করার খবর পেয়েছে তখন ফোনটা সে কাকে কী উদ্দেশ্যে করেছিল, সে সংবাদ নিশ্চয়ই তার অজানা নেই! অর্থাৎ পুষ্পর বিপদ আসন্ন! অপর পক্ষে, পালের গোদা যে, তার সম্বন্ধে শুভেন্দু একেবারে নীরব। বুদ্ধিমান রজত সে সময় কলকাতাতেই ছিল না। সুতরাং তার সম্বন্ধে শুভেন্দুর আদৌ সন্দেহ জেগেছে কিনা সেটাও সন্দেহ-সাপেক্ষ।

কিন্তু, আসলে যে কোন দোষেই দোষী নয়, তাকে বিপদে ফেলবার কী অধিকার আছে বিশুর? দেশোদ্ধারের অজুহাতে, এই সব খুন-ডাকাতির ব্যাপারগুলোকে পুষ্প যে শুধু ঘৃণাই করে, তা নয়! নিজে স্ত্রীলোক হয়েও মেয়েদের মান-ইজ্জৎ বিপদ-আপদ প্রভৃতি অনেক কিছু আশঙ্কার কথা তুচ্ছ করেও সে ছুটে এসেছিল বিশুকে বাধা দিতে! তবুও বিশুর নিয়তির সঙ্গে তার ভাগ্যসূত্র জড়িত হ'য়ে যাবে!

নিয়তির কথায় রিশুর পুরুষাকারের কথাটাও মনে পড়ে গেল। পুষ্পকে রক্ষা করবার জন্যে সে কি কিছুই করতে পারে না? শুভেন্দুর উপস্থিতির জন্যে রজতের সঙ্গে নির্জ্জনে পরামর্শ করবার উপায় তার ছিল না। কিন্তু মস্তিষ্ক তার মুহূর্ত্তের জন্যেও নিষ্ক্রিয় রইল না! একটা উপায় তাকে উদ্ভাবন করতেই হবে।

শেষে অপরাহ্ন বেলায় শুভেন্দু যখন বিশেষ জরুরী কাজে কলকাতায় রওনা হয়ে গেল তখন হঠাৎ একটা পথের ইঙ্গিত সে পেল।

সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই সে রজতকে ডাকল। তারপর অট্টালিকা সংলগ্ন বাগানটা নির্জ্জন দেখে সেইদিকেই অগ্রসর হলো। কিন্তু বাধা পড়ল।

পুষ্পদের ছ' সিলিণ্ডারের অষ্টিন্‌খানা এই সময় সগর্জ্জনে এসে গেটের মধ্যে ঢুকল। শব্দ শুনে মিষ্টার ঘোষালও বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। গাড়ীর মধ্যে লিলি ও পুষ্পকে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন: তোমরা কি সোজা কলকাতা থেকেই আসছ?

লিলি বলল: না, খুলনা থেকে—

—খুলনায় তো শুধু তুমিই ছিলে জানতাম, পুষু আবার সেখানে কবে গেল?

—ও তো সবে কাল বিকেলে ওখানে গিয়ে পৌছল! তারপর আজ সকালে কাগজে......

বাকিটা বলবার দরকার ছিল না। অতঃপর সকলে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলো। ভদ্রতার খাতিরে রজতও পিছনে পিছনে চলল। কিন্তু রিশু সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

—ওমা, তোমরা কখন এলে রজতদা?—বিশুবাবুও এসেছেন? বা রে,—অতি ব্যস্ততার মধ্যেও লিলি একটু ভদ্রতা করে গেল।

বিশু কিছুক্ষণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বাগানে গিয়ে ঢুকল।

মধ্যাহ্নের প্রচণ্ডতা তখন স্তিমিত হয়ে এসেছিল। পশ্চিমের সূর্য্য ম্লানমুখে চেয়েছিল পূর্ব্বের দিকে! আসন্ন সন্ধ্যার স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে বিশুর মনের বিরক্তিটা ক্রমে যেন শান্ত হয়ে আসতে লাগল! অলস-মন্থর গতিতে আরও এগিয়ে চলল সে!

হঠাৎ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল দূরস্থ একটি বিরাট কৃষ্ণচূড়ার গাছ! অপরাহ্ণ-সূর্য্যের রক্তাভ-রশ্মি গাছটার সর্ব্বাঙ্গে প্রতিফলিত হয়ে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছিল। কে যেন মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে লোভনীয় করে তুলেছিল সেখানকার আকাশটাকে! দৃশ্যটা বড় ভাল লাগল বিশুর। সে সেই দিকেই এগিয়ে চলল!

জনার্দ্দনবাবুর বাগানের সখ ছিল প্রচুর। অট্টালিকা-সংলগ্ন প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বিঘে জমীর ওপর তিনি খাঁটি স্বদেশী প্রথায় বাগান তৈরী করেছিলেন। বর্ত্তমানের রুচি অনুযায়ী কোন রকম চোখ-ঝলসানো বিদেশী গাছ সেখানে ছিল না। এমন কি কোন রকম আধা-দেশী গাছও আমল পায়নি সেখানে। তিনি শুধু অর্থব্যয় করে গিয়েছিলেন নিছক স্বদেশী গোত্রের পেছনেই। ফলে বিরাটের বৈচিত্র্যে জায়গাটা রূপান্তরিত হয়েছিল একটা ছোটখাট জঙ্গলে। ঘোষাল কর্ত্তা ছিলেন বিরাটের পূজারী। তাই তাঁর বাগানের মধ্যে শিশু-দর্শন সুগন্ধী ফুলের গাছ যত না ছিল তার চাইতে বেশী ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার

গাছ। এই সব বনস্পতিদের লম্বা লম্বা ডালে ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড় এসে বাসা বেঁধেছিল। ফলে স্থানটা দিনের বেলায় রীতিমত কলহ-মুখর হয়েই থাকত।

সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে গাছের বাদুড়-গোষ্ঠী তাদের আসন্ন নিশীথ বিহারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তাই তখন তাদের দুর্বোধ্য আলাপ-আলোচনারও যেমন অন্ত ছিল না, তেমনি ডানা ঝাপ্টা দিয়ে আলস্য দূরীকরণেরও সীমা ছিল না। তারপর আরম্ভ হলো বিষ্ঠা ত্যাগ করতে করতে যাত্রাসুরু। অগত্যা সৌন্দর্য্য উপভোগের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বিশু তাড়াতাড়ি অন্যদিকে পা চালাল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পায়চারী করবার পর বিশু আর পারল না। একই সঙ্গে বিরক্তি ও উৎকণ্ঠার আতিশয্যে মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহেও তার অবসাদ ঘনিয়ে আসছিল।

অবসন্নের মতো সে আবার বাড়ীর দিকেই ফিরল। রজতের আক্কেল দেখে বিরক্তির আর সীমা ছিল না তার। মাথার ওপর এতবড় বিপদ অথচ দলপতির হুঁস্ নেই সেদিকে। যেমনি পুষ্প এসেছে, শ্রীমানটিও অমনি তার অঞ্চল আশ্রয় করেছেন—

—এই যে বিশুবাবু!—প্রকাণ্ড একটা হাস্নো-হানা ঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে রজত চুপি চুপি পুষ্পর সঙ্গে কথা কইছিল। হঠাৎ ও পাশ থেকে বিশুকে বেরিয়ে আস্তে দেখে বলল: আপনি এদিকে, আর ওদিকে মিঃ ঘোষাল যে আপনাকে গরু-খোঁজা করছেন। বিকেল বেলায় জল-খাবারও খেলেন না…

—আজ্ঞে না!—বিশু একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। বলল: আপনারা খেয়েছেন তো? তাতেই হ'বে।

রজত সশব্দে হেসে উঠল। বলল: বিশুবাবু দেখছি ভয়ঙ্কর চটেছেন—

—রহস্য রাখুন, কাজের কথা শুনুন।

বিশুর এ মূর্ত্তির সঙ্গে রজতের পরিচয় ছিল না। সে একটু সন্দিগ্ধ হ'য়েই প্রশ্ন করল: হ'লো কী বিশুবাবু?

—হ'লো কী?—ক্ষুব্ধ স্বরে বিশু বলল: বুঝতে পারছেন না,—আমাদের মেয়াদ আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। শুভেন্দু অনেক কিছুই জেনেছে—

—জানুক না। রজত নির্ব্বিকারভাবে বলল: তাতে হ'য়েছে কী?

—হ'য়েছে কী?—মুখ বিকৃত করে বিশু বলল: হয়েছে আপনার মাথা খারাপ।

—তাই নাকি? রজত হেসে ফেলল।

—শুনুন পাগলামী করবেন না।—দলপতিকে ধমক দিয়ে বিশু বলল: মুক্তি-সঙ্ঘকে এখনও বাঁচান যেতে পারে। একটা উপায় আমার মাথায় এসেছে।

—যথা?

—আমি যদি এই সময় আত্মহত্যা করি, তাহলে ওদের সন্দেহটা আপাততঃ সমষ্টিকে ছেড়ে একজনের ওপরে গিয়েই পড়বে—বলতে বলতে সে তলপেটের কাপড় সরিয়ে ছোট্ট একটা রিভলবার্ বার করল।

—ওটা আমার দেওয়া সেইটে, না?—রজত তাড়াতাড়ি বিশুর হাত থেকে রিভলবারটা নিয়ে, তার চেম্বার খুলল।

—হ্যাঁ। বিশু বলল : শুনুন, আমার কেশটা suicide না homicide—এই নিয়ে যখন ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়বে, সেই সুযোগে আপনারা নিজেদের পথ দেখে নিতে পারবেন, বুঝলেন? এ সুযোগ কিছুতেই ফস্‌কাতে দেবেন না।

—যে আজ্ঞে! রজত সস্মিতমুখে রিভলবারটা নিজের দেহের একটা গোপন স্থানে চালান করে দিল।

—ওকি! বাঃ, আমার যন্তর আপনি নিচ্ছেন কেন?

—ঘাবড়াচ্ছেন কেন! যন্ত্র যথাসময়েই ফেরৎ পাবেন। কিন্তু তার আগে একটু ধাতস্থ হ'য়ে নিন।

বিশু মিনিটখানেক ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে রজতের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করল।

—বিশুবাবু, শুনুন শুনুন—

বিশু ফিরেও চাইল না। গোঁ ভরে এগিয়ে চলল।

—I command you বিশুবাবু—

বিশু ফিরে এল। তারপর মুখ ভারি করে বলল : Yes sir—

রজত সহাস্যমুখে বলল : আপনাকে একটা জরুরী খবর দেবার আছে। সঙ্ঘ আপনাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে। বর্ত্তমানে আপনিই তাদের প্রধান সেনাপতি—

—তার মানে? বিশু ভ্রূকুঞ্চিত করল।

—মানে, গোবিন্দপুরের action-এ নিখুঁতভাবে সৈন্য চালনা

কথার ফল। হায় বিশুবাবু! এতদিন পরে আমার আসন বুঝি টলল!

—যাঃ! বিশু বিরক্ত হয়ে বলল: এই সময় আপনি রহস্য আরম্ভ করলেন—

—রহস্য! আচ্ছা পুষু, তুমিই বলতো—

—উনি আবার কী বলবেন?—এতক্ষণ পরে বিশু পুষ্পর ওপর ঝাল ঝাড়বার সুযোগ পেল। রূঢ়স্বরে বলল: ওঁর মতে, আমি তো একটা Political dyspeptic—

—ওই শোন।—পুষ্প এতক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। বিশুর কথা শেষ হতে না হতেই সে হঠাৎ উৎকণ্ঠিতভাবে বলল: মিনু ওঁকেও বলেছে। এখনও তুমি সাবধান হবে না?

ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে বিশু রজতের দিকে তাকাল। রজত বুঝিয়ে দিল: একদিন আপনারই সম্বন্ধে পুষুর সঙ্গে আমার আলোচনা চলছিল। এই সময় হঠাৎ মিনু ঘরে ঢুকে পড়ে। হয়তো আমাদের দু' একটা কথা তার কানে গিয়েছিল। কিন্তু পুষুর ধারণা সে মুক্তি-সঙ্ঘ সম্বন্ধে সব কিছুই জেনে ফেলেছে!

—ব্যাপারটা তো হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয় রজতবাবু।—বিশু চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিন্তু একটা রহস্য পরিষ্কার হ'য়ে গেল তার কাছে। পুষ্পর অত ব্যস্ত হ'য়ে গোবিন্দপুরে ছুটে আসবার আসল কারণ তাহলে মিনতি নয়,—সে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছিল সঙ্ঘের তথা রজতের নিরাপত্তার জন্যে!

—কী মুস্কিল! রজত বলল: আচ্ছা, ধরে নিলাম মিনু

আমাদের সব কিছুই জেনেছে। কিন্তু তাতে হয়েছে কী? এটা যে একটা স্বদেশী ডাকাতি, এমন সন্দেহ কেউ করেছে কী?

—তবু......

—বিশুবাবু। রজতের কণ্ঠে যেন একটা নৈরাশ্যের ভাব ফুটে উঠল। বলল: পুষু স্ত্রীলোক। কিন্তু মেয়েদের মতো ভাব-প্রবণ হওয়া আপনার শোভা পায়না। কাল থেকেই দেখছি, আপনি যেন··· যেন...

—ভয় পেয়েছি, না?

—না তা ঠিক্ নয়। একটু হেসে রজত বলল: মুক্তি-সঙ্ঘ সেদিন রাত্রে আপনার যে পরিচয় পেয়েছে, তাতে আপনাকে ভীতু বলবার প্রবৃত্তি কারুরই হবে না। কিন্তু আপনার মধ্যে যে একটা অনুশোচনার ভাব এসেছে, এটা তো আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না।

—অনুশোচনা? কিসের জন্যে?

—কংগ্রেস ছাড়ার জন্যে। এ পথে আসার জন্যে। লোকে জানে, আপনি কংগ্রেসের ওপর হাড়ে চটা। কিন্তু আমার ধারণা, ওটা আপনার ক্রোধ নয়—অভিমান।

—আপনার ধারণা ভুল।

—মানুষ মাত্রেই ভুল করে থাকে। তাই তো আপনাকে বলছি, ভুলের মাত্রা আর বাড়াবেন না।

—তার মানে?

—মানে, মুক্তি সঙ্ঘে যোগ দিয়ে আপনি যে ভুল করেছেন,—এ

ধারণা আপনাকে ত্যাগ করতে হবে। নিরঙ্কুশ অহিংসার পথ দিয়ে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা যে কখনও আসবে না,—আমার এ কথাটা আপনি বিশ্বাস করুন। ক্রমাগত আইন অমান্য ক'রে ক'রে কংগ্রেস যে রকম নাস্তানাবুদ ক'রে তুলেছে ইংরেজকে, তাতে মনে হয়, আমাদের চরম আশা পূর্ণ করতেও শীগ্‌গীরই তারা বাধ্য হবে। কিন্তু অখণ্ড হিন্দুস্থানের মধ্যে গোটাকতক Ulster তৈরী করবার সুবিধে যদি থাকে তাহলে সে সুযোগ তারা নিশ্চয়ই ছাড়বে না। আমরাও দেখতে পাচ্ছি, দেড়শ বছর পূর্ব্বে ওরা এদেশে Divide and Rule Policy-র যে বীজ পুঁতেছিল, আজ তা গাছ হয়ে রীতিমত ফল দান সুরু করেছে। কিন্তু এর পরিণাম কী?

—কী?

—সেদিন এ দেশের মিরজাফর উমিচাঁদের দলকে ঠাণ্ডা করবেন কী করে? কংগ্রেসের এতদিনকার কৃচ্ছ্রসাধনার শেষ ফল গ্রহণ করবার জন্যে সেদিন এই দেশেরই সুযোগবাদীর দল নিত্য নতুন রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করবে। নিজেদের স্বার্থের জন্যে ইংরেজ সেদিন আরও বেশী করে তোয়াজ করবে তাদের Indian Agents-দেরকে। সুতরাং প্রকাশ্য Civil War করবার সুযোগ নিশ্চয়ই আমরা পাব না। ফলে, কী হবে?

বিশুও অভিভূতের মতো বলল: কী হবে?

—সেদিন এদেশের নিরীহ লোকেরা প্রয়োজন অনুভব করবে আমাদেরই মতন জন-কতক লোকের, যারা অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে।

এক বীভৎস হত্যা উৎসবে সেদিন মেতে উঠবে এ দেশ। সেদিনকার সেই গুপ্ত হত্যা বন্ধ করবার দায়িত্ব হবে মুক্তি-সঙ্ঘের।

—আপনি রক্তপাত করে রক্তস্রোত বন্ধ করতে চান?

—নান্য পন্থা। যারা চোখ বুঁজে দর্শনশাস্ত্র আওড়ায় আমি তো তাদের দলের নই। আমি চোখ চেয়ে ইতিহাস বোঝবার চেষ্টা করি। আমার ধারণা, শান্তির বাণী শুনিয়ে বড় জোর মুমূর্ষু মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যে কারণে মানুষ মুমূর্ষু হয়, তা রোধ করা যায় না।

—কিন্তু,—হঠাৎ পুষ্প বলে উঠল: নিজেদের অস্তিত্বটা যাতে সেদিন পর্য্যন্ত বজায় থাকে, সে চেষ্টা আগে করা উচিত নয় কী?

—অনুচিত কিছু করেছি বলে তো মনে হচ্ছেনা। আমাদের পূর্ব্বে যাঁরা এ পথে এসেছিলেন, তাঁদেরকে যে যে ভুলের জন্যে ফাঁসী কাঠে গিয়ে ঝুল্‌তে হয়েছিল, সে সব নজীর তো আমাদের চোখের সুমুখেই রয়েছে। এর পরও ভুল হবে আমার? পুলিশ হয়তো সন্দেহ করতে পারে আমাদের, কিন্তু প্রমাণ ছাড়া তো তারা কিছুই করতে পারবে না। সে প্রমাণ কোথায়? পুলিশ তো দূরের কথা, আমি মুক্তি-সঙ্ঘেরই যে কোন সভ্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি, সঙ্ঘের অস্তিত্বের প্রমাণ তারা দিতে পারবে না।

—তোমার জন্যে ভয় হয় রজতদা। এই দম্ভের জন্যেই হয়তো একদিন তোমার সর্ব্বনাশ হ'বে।

—মানুষের আত্মবিশ্বাস অকারণ আসে না পুষু। রজত দৃঢ়স্বরে বলল: ওটাকে তুমি আমার দম্ভ বলে ভুল করো না। মুরারীপুকুরের

মতো আমার কোন আস্তানার বালাই যখন নেই, তখন my 'mission is over' বলে বাহাদুরী নেবার সুযোগও আমি কখনও পাব না। তুমি নিশ্চিত জেন, আমি নিজে surrender না করলে কারুর সাধ্য নেই আমাকে ধরে......

পঁচিশ

ঘোষালদের বসত-বাড়ী থেকে কিছু দূরে, বাগানের মধ্যে একটা গেষ্ট-হাউস্ ছিল। বহুকাল পূর্ব্বে বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীরা যখন সফরে এসে খান্দানী জমীদার ঘোষালদের আতিথ্য স্বীকার করতেন, সেই সময় এই অতিথিশালার সৃষ্টি হয়। বাড়ীটা পুরোণ হ'লেও, নিয়মিত সংস্কারের ফলে বেশ ঝক্‌ঝকে তকৃতকেই ছিল। সেদিন এই গেষ্ট-হাউসেরই দোতলার একটা ঘরে বিশুদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হলো।

কয়েকদিন যাবং ক্রমাগত রাত্রি জাগরণের ফলে বিশুর ক্লান্তির আর সীমা ছিল না; সে সোজা গিয়ে শয্যা আশ্রয় করল। কিন্তু রজত শুলো না। লণ্ঠনটা মশারীর ভেতর নিয়ে গিয়ে, উপুড় হ'য়ে পড়ে সে চিঠি লিখতে সুরু করল।

—কাকে লিখ্‌ছেন? বিভূতিবাবুকে নাকি?

রজত সংক্ষেপে বলল: দরকারি চিঠি।

উত্তর শুনে বিশু ক্ষুন্ন হ'লো। চিঠিটা দরকারি হ'তে পারে, কিন্তু কাকে লেখা হচ্ছে সে কথা জানাতে এত আপত্তি কিসের! রজত কি তাকেও সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে নাকি! তাই এত লুকোচুরী!

বিশু মিনিট পাঁচেক ভাবল। তারপর রজতকে একবার বাজিয়ে

নেবার উদ্দেশ্যে বলল : পুষ্প দেবীর সঙ্গে তো অনেকক্ষণ নিরিবিলিতে ছিলেন, সে কথাটা সম্বন্ধে জানতে পারলেন কিছু ?

রজত ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কলম থামাল। কিন্তু পরক্ষণেই সহাস্যমুখে বলল : না। আপনি একবার চেষ্টা করুন না !

—সেটা দয়া করে আপনিই করবেন। আমার মশাই ওঁর সঙ্গে কথা কইতে তেমন ভরসা হয় না !

রজত হাসল। বলল : আপনি অকারণ ওকে দেখে ঘাবড়ে যান ! ও সাধারণত একটু গম্ভীর বটে, কিন্তু ও যে স্ত্রীলোক এ কথা ভুলে যান কেন ? ঠিক্ জায়গায় hit করতে পারলে, দেখবেন সত্যি কথা গড়্ গড়্ করে বেরিয়ে আসবে।

বিশু তাড়াতাড়ি উঠে বসল। বিস্ময়ের চাইতেও কৌতূহল হ'লো তার বেশী। বলল : স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে এই যদি আপনার ধারণা, তা হ'লে পুষ্পদেবীকে দলে নিয়েছিলেন কেন ?

রজত হাসিমুখেই জবাব দিল : যে কারণে আপনাকে দলে নিয়েছিলাম, ঠিক সেই কারণে ওকেও সঙ্ঘের মেম্বার করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

—বাধ্য হয়েছিলেন ? তার মানে ?

—তার মানে, মুক্তি সঙ্ঘের কথাটা আপনার মতো পুষ্পও একদিন জানতে পেরেছিল। বাইরের লোকের কাছে, কথাটা একবার প্রকাশ হ'য়ে যাবার পর, সঙ্ঘের আইন অনুযায়ী, হয় তাকে দলে টানতে হ'বে, না হয় তার মুখ চিরকালের মতো বন্ধ করে দিতে হ'বে ! এ ছাড়া তৃতীয় কোন পন্থা তো নেই !—কথাগুলো রজত বেশ হাসি মুখেই বলল।

শুনে বিশু বিচলিত হ'য়ে পড়ল। কিন্তু সঙ্ঘের কঠোর বিধি

নিষেধের কথা স্মরণ ক'রে সে চঞ্চল হ'লো না। সে বিচলিত হলো বিশেষভাবে রজতের কথা ভেবেই। প্রসঙ্গক্রমে পুষ্প সেদিন বলেছিলো, রজতদা পাষাণ! সম্ভবতঃ কথাটা সে সেদিন অভিমান ভরেই বলেছিল; কিন্তু আসলে অত্যুক্তি সে এতটুকুও করেনি। রজত যে একজন প্রথম শ্রেণীর নারী-বিদ্বেষী সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা সম্বন্ধে লোকটার ব্যক্তিগত ধারণাটা এতই দৃঢ় যে, কোন রকম ব্যতিক্রমের প্রশ্নই ওঠে না। পুষ্পর জন্যে মনের মধ্যে তার এতটুকুও দুর্বলতা নেই। নাহলে, পুষ্পর মতো মেয়ের সম্বন্ধে ও কখন অমন অশ্রদ্ধাভরে মন্তব্য করতে পারে?

—বিশুবাবু ঘুমোলেন নাকি?

বিশু উত্তর দিল না। রজত তখন চিঠিপত্র গুছিয়ে নিয়ে, আস্তে আস্তে মশারী সরিয়ে বাইরে এল।

বিশু সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠল। তারপর রজত যখন নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে তার রবার-সোলের জুতোটার মধ্যে পা ঢোকাল তখন সে আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না। বলল: আপনি কি আমায় ডাকলেন? একি! এত রাত্রে আবার যাচ্ছেন কোথায়?

—যাইনি কোথাও, আসছি। বলে, রজত মিনিট খানেকের জন্য বাইরে থেকে ঘুরে এল। তারপর আবার মশারীর মধ্যে ঢুকে বলল: অনেক পরিশ্রম করেছেন বিশুবাবু, এবার আপনার কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া উচিৎ।

বিশু আরও সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠল, এ কথা কেন! বলল: চাইলেই তো সব জিনিষ পাওয়া যায় না!

—দিলেও তো অনেকে তা নিতে পারেনা !

—তার মানে ?

—এখানে যখন একবার এসে পড়েছেন, তখন হঠাৎ অকারণ চলে গেলে, আপনার সম্বন্ধে কথা উঠতোই ! কিন্তু, চাক্‌রীর অজুহাতে সরে পড়লে, আমি অন্ততঃ আপনার বুদ্ধির তারিফ্‌ করতাম !

—কিন্তু আমি যে সত্যিই সে চাক্‌রী ছেড়ে দিয়েছি ! ভাল কথা, ব্যাপারটা আপনাকে বলা হয়নি, শুনুন্‌……

—কিছু দরকার নেই ! রজত গম্ভীরভাবে বলল : আপনার মতো মরালিষ্ট যে বেশীদিন সুকুমারের চাক্‌রী করতে পারবে না, সে কথা আমি আগেই জানতাম। কিন্তু, আমার ইঙ্গিতটা তখন আপনার ধরতে পারা উচিৎ ছিল ! যাক্‌গে, শুয়ে পড়ুন, অনেক রাত হ'য়ে গেছে।

রজত নিজেও শুয়ে পড়ল। কিন্তু বিশু চেষ্টা করে জেগে রইল। রজত যে তখন তাকে নিদ্রিত মনে করেই বাইরে যাবার চেষ্টা করেছিল সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। অথচ এই নির্বান্ধব দেশে বিশুর মত সহকারীকে লুকিয়ে রজত যে যেতে চায় কোথায়, তাও সে ভেবে পেল না। পরিচিতদের মধ্যে আছে তো কেবল বিভূতি ! সেও আবার থাকে এখান থেকে তিন মাইল দূরে গোবিন্দপুরে। কিন্তু রজত নিশ্চয় এত বোকা নয় যে, কেবলমাত্র অন্ধকারে আত্মগোপন করবার সুযোগ নিয়েই গোবিন্দপুরে যেতে ভরসা করবে। তাহলে ?—ঘুমে বিশুর চোখ যেন জুড়ে আসছিল ; তবুও সে আপ্রাণ চেষ্টা করল জেগে থাকবার। রজতের গোপন অভিযানের রহস্য তাকে জানতেই হবে ! সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত নরম বিছানায় শুয়ে থাকাটাই তার কাল হ'লো। কতক্ষণ সে ঘুমিয়ে ছিল বুঝতে পারল না; হঠাৎ দেখলো রজতের বিছানার উপরে লণ্ঠনটি মিট্‌মিট্ ক'রে জ্বলছে বটে কিন্তু রজত নেই! সে তখন তাড়াতাড়ি মশারী তুলে বাইরে এল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আর একবার সে চারদিকে তাকাল। কিন্তু লণ্ঠনের ক্ষীণালোকে দেওয়ালের ওপর নিজের ছায়াটি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। উৎকণ্ঠার জন্য কোন কিছু চিন্তা করে করবার মতো অবস্থাও তখন তার ছিল না। সে তাড়াতাড়ি, সেই অবস্থাতেই খালি পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উত্তেজিত হ'লেও বিশু কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে তাড়াতাড়ি চলবার চেষ্টা করল না। সে আস্তে আস্তেই ওপর থেকে নেমে এল; বাগানে গিয়ে ঢুকলোও নিঃশব্দে। তারপর একটু এগিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

—আমি কিছুতেই বলব না! পুষ্প তখন অস্ফুটস্বরে বলছিল: সে কথা জেনেছি আমি নিজের দায়িত্বে। তোমার ক্ষমতা থাকে, বিশ্বাস-ঘাতককে খুঁজে বার করো না?

রজত বলল: ক্ষমতা আমি নিশ্চয়ই প্রয়োগ করতাম, যদি না জানতাম, তুমি বিশুবাবুকে বাধা দিতে আসনি, এসেছিলে অনুমতি নিতে। কিন্তু নামটা তার আমাকে বললেই ভাল করতে তুমি। আমাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হ'বে তো।

—কৈফিয়ৎ দিতে হ'বে?

—নিশ্চয়ই। বিশুবাবু তো এর মধ্যে আমাকে বার তিনেক জিজ্ঞাসা করেছেন। বিভূতিও নিশ্চয়ই…

—রজতদা। পুষ্প চাপা গলায় গর্জ্জন করে উঠল : ওই লোকটার সম্বন্ধে তোমার এই গদগদ ভাব কি কিছুতেই যাবে না? এখনও চিন্‌তে পারলে না ওকে?

—ছিঃ পুষ্প! আড়ালে দাঁড়িয়ে কোন ভদ্রলোকের সম্বন্ধে অভদ্র ইঙ্গিত করা ভদ্রমহিলার লক্ষণ নয়।

—রজতদা! তুমি আমাকে অপমান করছো?

—না, সদুপদেশ দিচ্ছি। বিশুবাবুর মতো একজন কর্ম্মীকে ভবিষ্যতে তুমি অকারণ অপমান করবার চেষ্টা করবে না—

—আমি বুঝতে পারছি না, তুমি এমন কী দেখেছ ওর মধ্যে···

—আমিও বুঝতে পারছি না, এমন কী তিনি করেছেন, যাতে তার ওপর তোমার এত গায়ের জ্বালা।

পুষ্প চট্ করে জবাব দিতে পারল না।

রজত আবার বলল : বিশুবাবু যে কাজ করেছেন তাতে মুক্তি-সঙ্ঘের প্রত্যেক সভ্যের উচিৎ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা। তুমি আমি আজও যে এখানে দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে কথা কইতে পারছি, সেটা ওই বিশুবাবুরই কর্ম্মতৎপরতার ফল—

—তাই নাকি! কী করেছেন তিনি শুনি?

—খুন দুটো তিনিই করেছেন—

—বিশুবাবু? পুষ্প যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল। বলল : নিজের হাতে খুন করলেন?

—হ্যাঁ, মুক্তি-সঙ্ঘের যাঁরা পুরোন চাঁই, যাঁরা চিরকাল আমাদের বড় বড় কথা শুনিয়ে এসেছেন, তাঁরা সেদিন কী করেছিলেন জান?

বিশুবাবুকে একলা ঠেকিয়ে দিয়ে তাঁরা দেউড়ী আগ্‌লাবার নাম করে সরে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিভূতিও ছিল।

—তারপর? পুষ্প সভয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—বিশুবাবু ওদিকে যতই তৎপর হোন না কেন, এদিকে বুদ্ধি-শুদ্ধি অত্যন্ত অল্প। দলের লোকের মৎলব তিনি কিছুই বুঝতে পারেন নি। তাই বিভূতিকে আড়ালে ডেকে, অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বললেন: একজন সহকারী পেলে বড্ড ভাল হতো। বুদ্ধিমান বিভূতি তখন কাকে ঠেকিয়ে দিলে জান? আমাদের মণ্টুকে, একটা আঠার বছরের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে—

—বল কী?

—তারপর শোন। দলবল নিয়ে বিভূতি দেউড়ী আগ্‌লাতে চলে গেল, আর বিশুবাবু মণ্টুকে নিয়ে হাবেলীতে ঢুকলেন তালা ভেঙ্গে। ভদ্রলোক সবে সিন্দুকের মেসিনে এ্যাসিড্ ঢেলেছেন, কলটা গলতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় হুড়্‌মুড়্ করে দু'জন লোক ঘরে এসে ঢুকল। ব্যাপারটা আশাতীত হলেও বিশুবাবু ঘাবড়ালেন না; তাড়াতাড়ি এ্যাসিড্ রেখে রিভলবার তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে জ্বলে উঠল একটা শীকারী টর্চ্চ। আর এক সেকেণ্ড দেরী হ'লে কী হতো জানি না। জনার্দ্দনবাবু তখন তাঁর দু'নলা বন্দুকটা তুলে ধরেছেন বিশুবাবুর বুকের কাছে; দেওয়ান মশাইও তাঁর শড়্‌কীটা উঁচু করেছেন মণ্টুর মাথা লক্ষ্য করে, সঙ্গে সঙ্গে মণ্টুর কাঁধের ওপর দিয়ে বিশুবাবু গুলী করলেন। প্রথমটাতে জনার্দ্দনবাবু পড়লেন, দ্বিতীয়টাতে পড়লেন দেওয়ান মশাই। বিশুবাবুর যদি আর

এক সেকেণ্ড দেরী হতো, তাহলে আমাদের অবস্থাটা কী হতো জান?

পুষ্প অভিভূতের মতো আবার বলল: বিশুবাবু খুন করলেন?

—হ্যাঁ। উনি একটুকুও বিচলিত হননি। তাঁর মুখের ওপর আলো পড়তেই জনার্দ্দন বাবু চীৎকার করে উঠেছিলেন: বিশু তুমি? অন্য লোক হ'লে সে সময় ঘাবড়ে যেত। কিন্তু বিশুবাবু তক্ষুণি গুলী করলেন। শুধু তাই নয়, ওঁর judgement এত প্রখর যে, দেওয়ান মশাইকেও যে সঙ্গে সঙ্গে গুলী করা দরকার সেটা তাঁর তক্ষুনি মনে পড়েছিল···

—কেন?

—বুঝতে পারলে না? দেওয়ান মশাই বিশুবাবুকে না চিনলেও নামটা শুনতে পেয়েছিলেন তো। বিশুবাবু তাই তাঁর কথা বলবার শক্তি সেই মুহূর্ত্তেই নষ্ট করে দিলেন। শুধু তাই নয়, ফিরে আসবার সময় যখন দেখা গেল, আমাদের দলের ভূতো ভীষণ জখম হয়ে কাৎরাচ্ছে,—তাকে সরাবার কোন উপায় নেই, তখন তাকেও তিনি গুলী করলেন। তারপর একটা শাবল দিয়ে মুখখানাকে তার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এমন বিকৃত করে দিলেন যে, পুলিশ শত চেষ্টা করেও তার কোন পরিচয় জানতে পারবে না। ভদ্রলোক কতবড় বুদ্ধিমান বুঝতে পারছ?

—হুঁ! পুষ্প বলল: কিন্তু তুমি নিজে তো তখন ছিলে না। ওঁর সম্বন্ধে এত কথা জানলে কী করে?

—মণ্টুর কাছ থেকে শুনেছি। তাছাড়া দলের আর সকলেও

স্বীকার করেছে। কিন্তু, তোমাকে আবার অনুরোধ করছি পুষু, এ খবর যে তোমাকে দিয়েছিল তার নামটা বল।

পুষ্প হাসল।

—বুঝতে পারছ না? ওদের কাছে যে আমার মান থাকবে না!

পুষ্প বলল: তার চেয়ে আমাকে শেষ ক'রে দিয়ে ঝন্‌ঝাট মিটিয়ে ফেল না।

—ছিঃ পুষু—

—ছিঃ কেন! তোমার হাতে মরব, তাতে তো আমার দুঃখ কিছু নেই।

—যাঃ, আবার পাগলামী করে! যাও, শোও গে যাও। কেউ জান্‌তে পারলে লজ্জায় পড়ে যাবে।

পুষ্প কথা কইল না।

রজত আবার বলল: যাও, শোও গে যাও। আমারও অনেক দেরি হয়ে গেছে—লোকটাও হয় তো এতক্ষণ মশার কামড়ে মরীয়া হয়ে উঠেছে! বলে সে এগিয়ে চলল।

বিশুও নিঃশব্দে অনুসরণ করল।

রজত কিন্তু সদর দরজার দিকে গেল না। বাড়ীর পিছন দিকে পরিত্যক্ত গোশালার মতো একটি ঘর ছিল, রজত তারই ভেতর ঢুকে টর্চ্চ জ্বালল। তার পর প্রকাণ্ড একটা জাবনার-খোলা সরিয়ে হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে গেল!

ব্যাপার কিছু বুঝতে না পারলেও, বিশু ধরা পড়বার ভয়ে আর অগ্রসর হতে ভরসা করল না। কিন্তু কৌতূহলেরও অন্ত রইল না

তার। এত অল্প সময়ের মধ্যে রজত এই গুপ্তদ্বারের সন্ধান পেল কী করে!

রজত চলে যাবার পর পুষ্প বাড়ীর দিকে ফিরল। সম্ভবত: অন্যমনস্ক থাকার জন্যেই সে একেবারে বিশুর সামনে এসে পড়ল। তারপরই একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে একেবারে তিন হাত পেছিয়ে গেল।

বিশু এগিয়ে এসে তার হাত ধরল। বলল: ভয় কী, আমি! আমার সঙ্গে এস।

বাগানের মধ্যে এক জায়গায় একটা বেদী-বাঁধান প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ ছিল। পুষ্পকে টেনে এনে বিশু তারই একধারে বসিয়ে দিল। নিজে বসল না। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল: তোমার রজতদা গেলেন কোথায়?

পুষ্প উত্তর দিল না।

উত্তর দিলেও, পুষ্প যে সত্য কথা বলবে না এ সন্দেহ বিশুর আগে থাকতেই ছিল। কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে কী করা যায়! কী শাস্তি দেবে সে পুষ্পকে। বিশু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবেই ফুলতে লাগল।

মিনিট্ পাঁচেক পরে হঠাৎ পুষ্প আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠল: এবার আমাকে ছেড়ে দিন! কেউ জানতে পারলে সর্ব্বনাশ হবে—

—সর্ব্বনাশ যদি হয়ই, সেটা তো আর আমার জন্যে হবে না। জলদগম্ভীর স্বরে বিশু বলল: এত রাত্রে তুমি আমার জন্যে নিশ্চয়ই ঘর ছেড়ে বাইরে আসনি। এখন কৈফিয়ৎ দাও, সেদিন আমার সঙ্গে তুমি কেন অভিনয় করেছিলে?

—অভিনয় !

—অভিনয় নয় ? সামনে দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে লোভ দেখাবে, আর আড়ালে গিয়ে বদনামী করবে রজতদার কাছে ? আমাকে এই-ভাবে উন্মত্ত করে তুমি মজা দেখতে চাও ?

—মজা দেখতে চাই !

—নিশ্চয়ই ! বিশু চীৎকার করে উঠল : তুমি এত বড় হয়ে যে, আমাকে তুমি নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাও ? তোমাকে আমার ভাল লাগাটা এতই উপহাসের ব্যাপার তোমার কাছে ? তোমাদের মতো আমি অর্থবান নই বলে, তুমি আমার মনুষ্যত্বর পর্য্যন্ত কোন মূল্য দেবে না ? এই তোমার শিক্ষা ! এরই দম্ভে তুমি আমাকে উপহাস করতে সাহস করো !—বিশু যত উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল কণ্ঠস্বরও তার তত উচ্চগ্রামে চড়তে লাগল। নিস্তব্ধ রাত্রিতে বহুদূর পর্য্যন্ত ভেসে গিয়ে সেই স্বর প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

ব্যাপার দেখে পুষ্প একেবারে দিশেহারা হ'য়ে গেল। বলল : দোহাই আপনার বিশুবাবু, এভাবে আমার সর্ব্বনাশ করবেন না—

—আমি তোমার সর্ব্বনাশ করছি, না তুমি আমার সর্ব্বনাশ করছো ?

—দোহাই আপনার, চুপ করুন—

—চুপ করেই তো আমি ছিলাম ! সেদিন কেন তুমি আমার মুখ খোলালে ? এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার, মনে মনে ভালবাসবে তুমি রজতকে আর আমাকে নিয়ে করবে ছেলেখেলা ?

—বিশুবাবু! ব্যতিব্যস্ত হয়ে পুষ্প এবার বিশুর দুটো হাত মুঠো করে ধরল। স্খলিত কণ্ঠে বলল : আমাকে ভুল বুঝবেন না—

—তার মানে? তুমি কি বলতে চাও, সেদিন তুমি আমার সঙ্গে অভিনয় করোনি?

পুষ্পর চোখে জল এল। সে মাথা নেড়ে বলল : না—

অন্ধকারের মধ্যে চোখের জলের ব্যাপারটা বিশুর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পুষ্পর দুর্ভাগ্য, তার মাথা নাড়ার ফলে, একটা ফোঁটা গিয়ে পড়ল বিশুর হাতে। সঙ্গে সঙ্গে সে সজোরে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। এখনও অভিনয়?

অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে পুষ্পর সরল মনের সহজ কথাগুলি শোনার প্রতিক্রিয়াটা বড় ভয়ানক হয়ে দেখা দিয়েছিল বিশুর মনে। মনের মধ্যে তখন তার যা হচ্ছিল, সেটা নিরঙ্কুশ ক্রোধও নয় ঘৃণাও নয়। আ[illegible] মন তার যতই ভাবছিল, এই মেয়েটার কাছে ব্যক্তিত্বের মূল্য তার [illegible] কড়িও নেই, ততই সে উন্মত্ত হয়ে উঠছিল, যা অনস্বীকৃত [illegible] স্বীকার করিয়ে নেবার জন্য। তার এতদিনকার আদর্শবাদ আকাশেই শুকিয়ে গেল; যুক্তি-তর্কের প্রেরণাও তলিয়ে গেল বিস্মৃতির অতলে সৎ-শিক্ষার প্রলেপ দিয়ে, সুসভ্য সামাজিক রীতি-নীতির মুখ চেয়ে যে পশুশক্তিটাকে সে এতাবৎকাল চোখ রাঙিয়ে দাবিয়ে রেখেছিল, সুযোগ বুঝে সেই বর্ব্বরটা গর্জ্জন করে উঠল। বিরাট মস্তকধারী আদিম কালের সেই দানবটার মস্তিষ্কের বালাই ছিল না; তাই সে তার মজ্জাগত অকৃত্রিমতার সঙ্গেই মনের ইচ্ছা প্রকাশ করল। সে ভাব প্রতিফলিত হ'লো গিয়ে বিশুর চোখের হিংস্র দৃষ্টিতে—

সে যে সত্যই অবজ্ঞার পাত্র নয়। ইচ্ছা করলে সে যে এই মুহূর্ত্তেই তার পৌরুষের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিতে পারে,—এই মহাসত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করবার সঙ্কল্প, ক্রমেই তার দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠছিল। অগ্নিমন্ত্রের উপাসক সে, এই শ্রুতি-মধুর কথাটিকে সুযোগমত ব্যবহার করে মেয়েটা সেদিন তাকে বিচলিত করে ফেলেছিল। ওর ধারণা, তেজ-এর দোহাই পেড়ে তার মতো পুরুষকে বুঝি বার বার নিস্তেজ করে ফেলা সম্ভব। এমন বুদ্ধি না হলে রজত এদেরকে এত ঘৃণা করে! ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে, বিশুর মনে যে আগুন জ্বলেছে সেটা আদৌ আলেয়া নয়; শক্তি তার অতীব প্রচণ্ড। এই মহাসত্যকে ও আজ উপলব্ধি করতে বাধ্য হবে,—সর্ব্বস্বর বিনিময়ে।

—উঠে দাঁড়াও! বিশু সগর্জ্জনে আদেশ করতে গেল। কিন্তু গলা দিয়ে তার আওয়াজ বেরুল না। নিদারুণ উত্তেজনার মধ্যেও সে অনুভব করল, তার বুকের ভেতর থেকে কী যেন একটা ভারি জিনিষ ক্রমাগত ঠেলে ঠেলে ওপর দিকে উঠবার চেষ্টা করছে। সে শেষে সক্রোধে খিঁচিয়ে উঠল : উঠে দাঁড়াও—

পুষ্প তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল।

অতঃপর কী করা যায়! বিশু মুহূর্ত্তকাল ভাবল। তারপর পুষ্পর শাড়ীর আঁচলটা টেনে নিয়ে তার হাত দুটো বাঁধবার চেষ্টা করল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ছেড়ে দিল। উত্তেজনার আতিশয্যে হাত দুটো তার এত কাঁপছিল যে মুষ্টি কিছুতেই দৃঢ় হচ্ছিল না। ছাড়া পেয়ে পুষ্প আবার বসে পড়ল।

কিন্তু কিছু একটা করতে হবে তো। জড়িত স্বরে বিশু আবার আদেশ করল: উঠে দাঁড়াও—

পুষ্প আবার উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু কলের পুতুলের মতো যে মেয়ে আদেশ পালন করে, তাকে আর কী শাস্তি দিতে পারা যায়! বিশু ভাববার চেষ্টা করল; কিন্তু কিছুই ভেবে পেল না। অথচ পুষ্পকে একবার অন্ততঃ ভীষণভাবে অপমান করতেই হবে। আচ্ছা—

পুষ্পকে জড়িয়ে ধরল বিশু। পুষ্প এতটুকুও বাধা দিল না। কিন্তু আলিঙ্গন নিবিড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশু অকস্মাৎ আবার তাকে ছেড়ে দিয়ে পেছিয়ে গেল। পুষ্পও আবার বসে পড়ল।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বিশু বারকতক হিস্ হিস্ করে নিঃশ্বাস ফেলল সাপের মতো। তারপর আবার গর্জ্জন করে উঠল: উঠে দাঁড়াও—

পুষ্প তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করল।

—কাছে এস। ওটা আমাকে দাও।

এবার পুষ্প আদেশ পালন করল না।

—ওটা আমাকে দাও বলছি......বিশু কাছে এগিয়ে এল।

পুষ্প চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল।

—তবে রে...... কাণ্ডজ্ঞান বলতে বিশুর তখন আর কিছুই ছিল না। সে উন্মাদের মতো পড়্ পড়্ করে পুষ্পর ব্লাউজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল। কিন্তু যা সে চাইছিল, সেটা তখন সেখানে ছিল না।

জিনিষটা, বাজার-চলতি নিকেলের সিগারেট কেসের মতো দেখতে

ছোট্ট একটি রিভলবার। বিশুর মৎলব বুঝতে পেরেই পুষ্প সেটা যথা স্থান থেকে সরিয়ে ফেলেছিল।

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে পুষ্পর হাত-সাফাইটা দেখতে না পেলেও ব্যাপারটা বিশু বুঝল। রুদ্ধ আক্রোশে মিনিট খানেক ফোঁস ফোঁস করে সে আবার বলল: যদি বাঁচতে চাও ওটা আমাকে দাও,—দাও বলছি……

পুষ্পর মনের অভিভূত ভাবটা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসছিল। সে নীরবেই দাঁড়িয়ে রইল।

—তোমার গায় হাত দোব, সেটা ভাল হবে? এখনও বলছি দাও ওটা……

চমৎকার। বিশু যেন এর পূর্ব্বে পুষ্পর গায়ে হাত দেয় নি! কিন্তু ওর আসল মৎলব কী! অপরাহ্ণের একটা ঘটনাও পুষ্পর মনে পড়ে গেল। বিশুর আত্মহত্যা করবার অদ্ভুত যুক্তি শুনে, রজত কৌশলে তার রিভলবারটা কেড়ে নিয়েছিল। যন্তরটার জন্যে সে সময়েও বিশু বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কেন এ ব্যাকুলতা! পণ্ডিতেরা বলেন, মানুষের আত্মহত্যা করবার স্পৃহাটা নাকি এক রকমের সাময়িক উন্মত্ততা। প্রেরণাটা নাকি নেশার মতো পেয়ে বসে মানুষকে এবং সুযোগ সুবিধা ঘটলে সে ইচ্ছা পূর্ণ করতেও বিলম্ব করে না তারা। কিন্তু মানুষ তো অকারণ উন্মত্ত হয়ে উঠে না। বিশুর জীবনে হঠাৎ এমন কী ঘটল যার জন্যে সে আত্মহত্যার নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। কর্ম্ম-জীবনেও তার চরম সাফল্য এসেছে, তবে কিসের দুঃখে সে……

—তুমি কি কিছুতেই আমাকে ভদ্রলোক থাকতে দেবে না? অগত্যা

বেদীটার ওপর অবসন্নের মতো বসে পড়ে বিশু বলল : এখনও বলছি ওটা দাও, না হলে—

—না হলে কী করবেন ? পুষ্প নিঃশব্দে চেম্বার খুলে রিভলবারের ভার মুক্ত করল।

—কী করবো বুঝতে পারছ না ? যে লোক একবার খুন করতে পারে······বুঝতে পারছ না ?

—পারছি বৈকি ! কিন্তু······ পুষ্প এবার মনে মনে হাসল। বেচারা সত্যিই বড় সরল ! না হলে তাকে হত্যার বিভীষিকা দেখাতে চায় ! অথচ, এই অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যে সে নিজে যে সর্ব্বনাশের আশঙ্কা করেছিল, কুমারী মেয়েদের জীবনে যার চাইতে বড় ক্ষতি আর কিছু থাকতে পারে না, তার মাথায় সেই অভিশাপের বোঝা চাপিয়ে দেবার ইচ্ছাটা বিশু তো ইঙ্গিতেও প্রকাশ করল না ! সম্ভবতঃ কথাটা ওর মাথায় একেবারেই আসেনি ! নাহলে, অন্তত পক্ষে, বিভীষিকা দেখাবার অজুহাতেও ইঙ্গিতটা তো সে দিতে পারত ! লোকটা শুধু অদ্ভুত নয়, বোকাও বটে !

—ও সব কিন্তু-টিন্তু ছাড় পুষু। ওটা আমাকে একবার দাও, তারপর তুমিও বাঁচ, আমিও নিশ্চিন্ত হই !

পুষ্প বলল : ও কাজ করতে গেলে যন্তর কি চেয়ে নিতে হয় ? কেড়ে নিতে হয়, তাও জানেন না ?

পুষ্পর কথার ভঙ্গিতে বিশু এবার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর রূঢ়স্বরে বলল : ধন্যবাদ ! বলেই, রিভলবারটা পুষ্পর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের ডান কানের ওপর চেপে ধরল।

টিক্ করে একটা শব্দ হলো ! হাসি চেপে পুষ্প বলল : কী হলো ?

অন্ধকারে বিশুর মুখের অবস্থাটা দেখা গেল না। সে শুধু একবার পুষ্পর সামনে থমকে দাঁড়াল! তারপর রিভলবারটা বেদীর ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্রুতপদে অগ্রসর হলো।

—শুনুন শুনুন, পুষ্প ছুটে গিয়ে বিশুর হাত ধরল!

—ছেড়ে দাও বলছি! সজোরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বিশু বলল: যথেষ্ট হয়েছে, থাক···

—একি! আপনি কাঁদছেন?

বিশু আর সামলাতে পারল না। সেইখানেই ধপ্ করে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কী বুকফাটা কান্না···

একি কাণ্ড! পুষ্প ভেবেই পেল না, কেঁদে ফেলবার মতো এমন কী ঘটল ইতিমধ্যে? বিশুর মতো একটা জোয়ান মানুষ, সেও এই রকম শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে পারে! এত ছেলেমানুষ বিশু! এত অভিমানী···অথচ মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে এই বিশুই নিজের হাতে ছুটো খুন করেছে!

—বিশুবাবু লক্ষ্মীটি! বিশুর পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পুষ্প তার মুখের ওপর থেকে হাত সরাবার চেষ্টা করল। ফলে বিশুর কান্না আরও বেড়ে গেল।

এখন এ পাগলটাকে নিয়ে সে কী করবে! পুষ্প অকারণ একবার চারদিকে তাকাল। তারপর আবার বিশুর হাতদুটো ধরে বলল: বিশুবাবু, কী হয়েছে আমাকে বলবেন না?

বিশু কোন উত্তর দিল না। কিন্তু কান্নার উচ্ছ্বাসটা তার কিছুক্ষণের মধ্যেই কমে এল। তারপর হঠাৎ এক সময় উঠে পড়ে, কোনদিকে দৃকপাতমাত্র না করে সোজা চলে গেল গেষ্ট-হাউসের দিকে।

ছাব্বিশ

পরদিন বিশুর যখন ঘুম ভাঙল, তখন আর সকাল ছিল না। অকস্মাৎ একটা প্রবল আলোড়নে ঘুম ভেঙে যেতেই সে দেখল ব্যাপার গুরুতর। তার বিছানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে লিলি ও মিনতি তারস্বরে কলরব করছে। লিলির হাতে আবার এক কুঁজো জল। সে কুঁজো নেড়ে বলল: এখনও উঠুন বলছি, নইলে, জল ঢাললুম্ বলে—

বিশু ধড়্মড়্ করে উঠে বসল।

—এ রকম বে-প্যাটার্ণ ঘুমের কথা তো জন্মে শুনিনি বাবা! তিন তিনবার চাকর এসে ডেকে গেল তবু হুঁস নেই? উফ্, আপনি মানুষ না মহি-রাবণ?

—ভুল করোনা লিলি! রজত তার নিজের বিছানার ওপর বসে মজা দেখছিল। বলল: সে ভদ্রলোকের নাম মহি-রাবণ নয়, কুম্ভকর্ণ!

—তুমি আর দালালী করতে এস না! লিলি ধমক দিয়ে বলল: তোমাকেও তো চুলের মুঠি ধরে ঘুম ভাঙাতে হলো! উফ্, তোমরা মানুষ না জানোয়ার?

—আপনার কী মনে হয় বিশুবাবু? রজত সহাস্যমুখে প্রশ্ন করল: আমরা আসলে কী?

পুষ্প দাঁড়িয়েছিল ঘরের বাইরে, বারান্দার রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে। তারও মুখের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যকে ছাপিয়ে চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠেছিল হাস্যোজ্জ্বল। ব্যাপারটা সেও উপভোগ করছিল। বিশু আড়চোখে একবার তার মুখখানা দেখে নিয়ে বলল: নিশ্চয়ই জানোয়ার! না হলে আমাদের নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে মহিলারা এত আনন্দ পান?—বলেই আবার সে তার দিকে তাকাল। পুষ্প অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ব্যাপারটা মিনতির দৃষ্টি এড়ায়নি। সে সকৌতুকে কী একটা মন্তব্য করতে গিয়েও সামলে নিল।

—তবু ভাল! লিলির অন্য কোনদিকে নজর ছিলনা। সে তার পূর্ব্ব কথারই জের টানল: নিজেদের আসল পরিচয়টা তাহলে জানেন দেখছি। এখন, দয়া করে উঠ্‌বেন কী?

—সত্যি রজতদা'—মিনতি বলল: তোমরা তাড়াতাড়ি এস। ওদিকে এতক্ষণে হয়তো ব্রহ্মমেধ যজ্ঞ সুরু হয়ে গেছে—

—তোমরা এগোও, আমরা আসছি।

—দেরি করোনা যেন।

মেয়েরা চলে যাবার পর রজত বলল: ব্যাপার কী বিশুবাবু। আজ নিদ্রাদেবী আপনার প্রতি এত প্রসন্না যে—

—ক' রাত্তির ঘুমোইনি, তাই বোধ হয়। বিশু কিন্তু রজতকে অনুরূপ প্রশ্ন করার প্রয়োজন বোধ করলনা। জিজ্ঞাসা করল: কিন্তু, এদিককার ব্যাপার কী? ব্রহ্মমেধ যজ্ঞ—

—ব্যাপার চমৎকার! আপনি তাড়াতাড়ি নিন্—

যতশীঘ্র সম্ভব হাত-মুখ ধুয়ে ওরা বৈঠকখানায় গিয়ে দেখল, ব্যাপার গুরুতরই বটে। ঘোষাল বংশের প্রধান পুরোহিত মহাশয় সদলবলে এসে আগামী শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ পেশ করেছিলেন মিঃ ঘোষালের কাছে। বৃষোৎসর্গের বিরাট ফর্দ্দ দেখে মিঃ ঘোষালের আর ক্রোধের সীমা ছিল না। তিনি সটান জিজ্ঞাসা করে বসলেন: আপনারা মানুষ না শকুনী?

—এঁ্যা?

—একটা মানুষ অপঘাতে মরল, আপনারা কোথায় তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করবেন, তা নয়, নিজেদের পেট্ মোটা করবার জন্তে একটা লাখ দেড়েক টাকার ফর্দ্দ এনে হাজির করেছেন? লজ্জা করলো না আপনাদের?

এইভাবে সূত্রপাত হয় বাদানুবাদের। মিঃ ঘোষালের যুক্তি ছিল: আমার বাবার মৃত্যু যদি স্বাভাবিক হ'তো, তাহলে আমিও স্বাভাবিক ভাবে শ্রাদ্ধ করতাম। একটার জায়গায় দশটা ষাঁড় দান করতাম আপনাদের। কিন্তু—

—তাই বলে, বাপের শ্রাদ্ধ করবে না?

—করবো, যেটুকু না করলে নয়।

অতঃপর পুরোহিত দেখালেন ধর্ম্মহানির ভয়।

—ধর্ম্ম? মিঃ ঘোষাল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন: আপনারা যার ধ্বজা বয়ে বেড়ান, সেই ধর্ম্মের কথা বলছেন?

উল্টো বুঝে পুরোহিত মহাশয় নরম গলায় বললেন: হঁ্যা বাবা, আমি আমাদের সেই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের কথাই বলছি। ধর্ম্ম যে রসাতলে যেতে বসেছে! এখন তোমরাও যদি একে বাঁচাতে না

পার তাহলে আর কে পারবে বল? তোমাদের বিত্ত আছে, অর্থ আছে—

—যে আজ্ঞে! মিঃ ঘোষাল বললেন: কিন্তু, হিন্দুধর্ম্মকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে হ'লে, প্রথমেই কী করা উচিত তা জানেন?

—কী বাবা?

—ব্রহ্মমেধ যজ্ঞ!

—তার মানে?

—মানে, সকলের আগে আপনাদের মতো টিকিধারী ধর্ম্মধ্বজীদের সবংশে নিধন করতে হ'বে—

—কী এত বড় কথা! বিতণ্ডা ক্রমে চরমে উঠল। শেষে পুরোহিত মহাশয় ব্রহ্মশাপ দেবার উদ্দেশ্যে পৈতে বার করে ছেঁড়বার উপক্রম করলেন।

কিন্তু, এক সঙ্গে এক গোছা সুতো ছেঁড়্বার মতো দৈহিক শক্তি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছিল না। ফলে, বল-প্রয়োগ করতে গিয়ে অবস্থা তাঁর আরও শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময় রজত এসে তাঁর মান-রক্ষা করল।

স-সঙ্গী পুরোহিত মহাশয়কে বাইরে নিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা করতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে এ ভাবে কটূক্তি করা আর একজন ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে যে কী ক'রে সম্ভব হ'তে পারে, এ সমস্যা তাঁকে একেবারে দিশাহারা করে দিয়েছিল। কিন্তু, নিজের স্বপক্ষে যুক্তির জাল বুনতে রজতের ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত, পুরোহিত মহাশয়কেও স্বীকার করতে হলো: পিতৃ-

বিয়োগের আকস্মিক আঘাতে বিজয় ঘোষালের মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। নাহলে, জনার্দ্দন ঘোষালের ঔরসে ও-রকম কুলাঙ্গার তো জন্মাবার কথা নয়!

—কিছু ভাববেন না, আমি সব ঠিক করে দেব'খন। রজত তাঁদেরকে আশ্বস্ত ক'রে বিদায় দিল। তারপর বৈঠকখানায় ফিরে এসে মিঃ ঘোষালকে বলল: অপরের sentiment-এ ঘা দিয়ে কখন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এও এক রকমের অসংযম, অধর্ম্ম—

মিঃ ঘোষালের মেজাজ তখনও গরম ছিল। বললেন: তোমার হ'লো কী হে, হঠাৎ ওদের হ'য়ে defence করছো? তুমিও কি শেষে মহাসভায় ঢুকে হিন্দু হ'য়ে উঠলে নাকি?

—আপনি দেখছি বড্ড চটেছেন। রজত হাসিমুখেই বলল: আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মহাসভার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নেই। ওটা মুস্‌লীম্ লীগের মতোই একটা Political body—

—আপনার কাছেও তাহলে ভাবপ্রবণতার মূল্য আছে?—রজতের মুখে sentiment সম্বন্ধে নতুন কথা শুনে বিশু আর কৌতূহল দমন করতে পারল না। বলল: এবং সেটা যত ক্ষতিকরই হোক্ না কেন?

—By Jove! মিঃ ঘোষাল বললেন: ওই রাবিশগুলোর সঙ্গে তুমি যে রকম বিনীতভাবে কথা কইছিলে, আমি তো দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি—

—আমাকে ভদ্রভাবে কথা কইতে দেখে আপনি অবাক হ'য়ে গেলেন?

—আহাহা, তা কেন। ভদ্রতার কথা হচ্ছে না। কিন্তু তুমি ভদ্রতা করছিলে কাদের সঙ্গে? এই মাত্র তুমি মুসলীম লীগের কথা বলছিলে না? তুমি জান, মুস্‌লীম্‌ লীগের আসল স্থষ্টিকর্ত্তা কারা? ওই চাল-কলা বাঁধা বামুনগুলো! ওদের ব্যবসার মূলধনটা যদি হিন্দুধর্ম্ম না হয়ে অন্য কিছু হ'তো, তাহলে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক ধর্ম্মও ত্যাগ করত না, আর সেই সব কালাপাহাড়ের বংশ নিয়ে জিন্না সাহেব আজ দল পাকাতেও পারতেন না!

—আপনার যুক্তির কিন্তু খেই হারিয়ে যাচ্ছে! রঞ্জত হাসিমুখেই বলল: জিন্না সাহেব যেটাকে আজ কাজে লাগাচ্ছেন, সেটাও তো ধর্ম্মান্ধতা!

—আঃ! মিঃ ঘোষাল বিরক্ত হ'য়ে বললেন: ধর্ম্মের সঙ্গে যে ধর্ম্মান্ধতার কোন সম্বন্ধ নেই সেটা কি আর জিন্না সাহেব জানেন না? জানেন! তিনি একজন শিক্ষিত লোক! ফরসী, বদনা, লুঙ্গী, নূর, এগুলোকে তিনি আজ কাজে লাগাচ্ছেন মৎলব করেই, দরকার হয়েছে বলেই—,

—কিন্তু, এর পরিণাম কী?

—সর্ব্বনাশ

—আমিও তো সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম! নবাব বাদশাদের আমলে প্রয়োজন হ'য়েছিল বলেই একদিন ব্রাহ্মণেরা টিকি, নামাবলী, গাড়ু, গোবর, এইগুলোকে কাজে লাগিয়েছিল। ফল যা হবার হয়েছে, কিন্তু, কবে কোন অতীতে ওদের পূর্ব্বপুরুষেরা চালে কী ভুল করে গিয়েছিল, এই অপরাধে আপনি ওদের সন্তানদেরও শাস্তি বিধান করতে চান?

—আমি কি তাই বললাম ? মিঃ ঘোষাল উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। বললেন : আমি বলতে চাই, ওরা আজও টিকি নামাবলী দেখিয়ে আমাদেরকে exploit করতে চায় কেন ? খেটে খাক্ না—

—খেটেই তো খাচ্ছে। বামুনের ছেলে জুতোর দোকান করে দু' বেলা মুচির পায়ে তেল দিচ্ছে। কিন্তু যারা agent-কে খাটিয়ে নিয়ে commission দিতে গররাজি হয়, তাদের মনোবৃত্তির কথাটাও তো ভাবতে হবে !

—তার মানে ?

—মানে বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ-শান্তি, পূজো-পার্ব্বণের ব্যাপারে আজও আমরা ওদেরকে ডেকে আনি। অর্থাৎ আমাদের সমাজের মধ্যে ওদের অস্তিত্বটা অবৈধ নয়। হয়তো এই সামাজিক কাজগুলো অর্থহীন কুসংস্কার। তবুও পরিশ্রম করে ওরা আমাদেরই জন্যে। কিন্তু, পারিশ্রমিক দেবার বেলায় আমরা তো ওদেরকে এক হাত না নিয়ে ছেড়ে দি' না।

ইঙ্গিতটা যথাস্থানে গিয়েই আঘাত করল। কিন্তু মিঃ ঘোষাল আত্মবিস্মৃত হলেন না। সংযত স্বরেই বললেন : তাই বলে, একটা লাখ দেড়েক টাকার ফর্দ্দ আনলেও আমাকে তাই দিতে হ'বে ?

—আমি তো উচিৎ মনে করি ! মুখের হাসি বজায় রেখেই রজত বলল : পিতৃ-শ্রাদ্ধটা যদি আপনার কোন গোমস্তার হ'তো, তা হলে ওরা নিশ্চয়ই বৃষোৎসর্গের ফর্দ্দ আনত না, তিল-কাঞ্চনের ব্যবস্থা দিত। কিন্তু আপনার যখন টাকা আছে, তখন আপনি খরচ করবেন না কেন ?

—তোমার মতে তাহলে, টাকা থাকাটাই অন্যায়।

—ন্যায় অন্যায়ের কথা পরে হ'বে। কিন্তু আপনি Party দিয়ে, Politics করে, নানা রকমের ভূত-ভোজনের অজুহাতে যদি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেন, তা হলে পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ওদেরকেই বা কিছু বেশী দেবেন না কেন?

—আমার টাকা, অথচ আমার নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য থাকবে না?

—সকলেই যদি আপনার মতো ব্যক্তিগত ইচ্ছাটাকে বড় ক'রে দেখে, তাহলে ব্যক্তিত্বের মূল্য তো কারুরই থাকবে না। কিন্তু কথাটা তো তা নয়! টাকা জিনিষটাকে সিন্দুকে আটকে রাখাও যেমন অন্যায় তেমনি একটি মাত্র উপলক্ষের পেছনে উড়িয়ে দেওয়াটাও অপরাধ! আপনি যখন অন্য সব ব্যাপারে দিল-দরিয়া তখন ওই দরিদ্র ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধেই বা এত কৃপণ হ'বেন কেন? ওরা কারখানার মজুরদের মতো ধর্ম্মঘট করতে পারেনা বলে?

মিঃ ঘোষাল ক্রুদ্ধমুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন: Excuse me রজত, তুমি কি কম্যুনিষ্ট হয়েছ?

রজত সস্মিতমুখে উঠে দাঁড়াল।

—উত্তর দিলে না যে?

—ও কথার উত্তর দিতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না!—বলে, রজত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিশুও উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

বাইরে এসে বিশু বলল: এটা কী হলো?

রজত বলল: বাঁশগাড়ী ক'রে রাখলাম। এবার সরে পড়তে আর অসুবিধে হবে না।

বিশু অবাক হ'য়ে গেল! এ লোকটা কি বিনা মৎলবে কিছুই করে না? বলল: এর মধ্যে ভয় পাবার মতো কিছু ঘটেছে নাকি?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। এখানে এসে একটা জাল ফেলেছিলাম, কিন্তু শীকারের দেখা তো এখনও মিলল না—

—কী জাল? বিশু অধৈর্য্য হয়ে উঠল: খুলেই বলুন না ব্যাপারটা—

বাধা পড়ল। এই সময় সুকুমারের প্রকাণ্ড বুইকখানা নিঃশব্দে এসে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল। গাড়ী থেকে একে একে নামল সুকুমার, শুভেন্দু ও রমেশ চৌধুরী।

শুভেন্দুর সঙ্গে রমেশ চৌধুরীকে দেখে রঞ্জত ভ্রুকুঞ্চিত করল! তারপর আস্তে আস্তে বলল: আমার রিপোর্ট তাহলে মিথ্যে নয়! রমেশ চৌধুরীকে সত্যিই suspend করেছে Government.

—রমেশদাকে suspend করেছে? কেন? কে বললে?—বিশু বিরক্ত হয়ে উঠল! বলল: আঃ ব্যাপারটা খুলেই বলুন না?

—খবরটা পাঠিয়েছে আমাদের ইন্‌ফরমার গণেশ!.

—কিন্তু, রমেশদার অপরাধ কী?

—বোধহয়, চোরকে উস্‌কে দিয়ে গেরস্থকে সাবধান করতে যাওয়ার অপরাধ! পুষ্পদের বাড়ী সার্চ্চ করতে গিয়ে ওঁকে কেন যে বোকা ব'নে ফিরে আসতে হয়েছিল, সে রহস্যটা বোধহয় আর চাপা নেই।

—তাহলে?—বিশু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল।

—আপনাকে সাবধান হতে হবে। ও লোকটার অবস্থা এখন

ঘা-খাওয়া বাঘের মতো। বে-সরকারী ভাবে এই কেশটার ফয়সালা করে ও যদি কৃতিত্ব দেখাতে পারে, তবেই ওর ভরসা। নাহলে, ভবিষ্যত একেবারে অন্ধকার।

—তাহলে, আমি এখন করি কী?

—দয়া করে নিজের বুদ্ধিতে কিছু করবেন না। যা করবেন, আমার সঙ্গে পরামর্শ করেই করবেন।

—আপনার সঙ্গে আর কী পরামর্শ করবো। বিশু একটু ক্ষুব্ধ হয়েই বলল: আপনি নিজেই তো আমার সঙ্গে এখন লুকোচুরী আরম্ভ করেছেন। জাল ফেল্‌ছেন, রিপোর্ট পাচ্ছেন, অথচ আমি কিছুই জানি না।

রজত প্রতিবাদ করল না। হেসে বলল: আপনারি মঙ্গলের জন্য লুকোচুরী আরম্ভ করিছি বিশুবাবু। খুন ছুটো করে আপনার মনের অবস্থা সে রকম ভয়ানক হয়ে উঠেছে, আমার তো ভয় করে, অনুশোচনা চাপতে না পেরে যে কোন মুহূর্ত্তে আপনি suicide করে ফেলবেন—

—এই আপনার ধারণা আমার সম্বন্ধে?

—আর কথা নয়। বাধা দিয়ে রজত বলল: এখন চলুন, ওদিকে কী হচ্ছে দেখি।

বিশুকে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকেই রজত শুনল, মিঃ ঘোষাল উচ্ছ্বসিতস্বরে বলছেন: আপনারা অত্যন্ত স্বার্থপর লোক মশাই। শালা-ভগ্নীপতি দু'জনেই এসে দিব্বি এখানে চেপে বসলেন, আর বন্দনা বেচারী একলা পড়ে রইল কলকাতায়। তাকেও নিয়ে এলেন না কেন?

অনুযোগ শুনে, শুভেন্দু গম্ভীরভাবে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। রমেশ চৌধুরীও একটা হেঁ-হেঁ জাতীয় হাসি হেসে কথাটাকে চাপা দিলেন।

মিঃ ঘোষাল সুকুমারকে নিয়েও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একে সে তাঁর এই বিপদে সমবেদনা জানাতে ছুটে এসেছে কলকাতা থেকে; তার ওপর সে একজন অবিবাহিত ধনী যুবক। ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করবার জন্যে এক ফাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে তিনি বললেন: তাই তো বাবা, তোমার অনুপস্থিতিতে অফিসের আবার কোন ক্ষতি না হয়।

সকলের শেষে শুভেন্দুকে বললেন: হেঁ হেঁ, তুমি তো আমার ঘরের ছেলে হে।

ব্যাপার দেখে রজত হেসে ফেলল। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মানুষ কত ভয়ানক হয়েই না উঠতে পারে। আজ বন্দনার জন্যে মিঃ ঘোষালের দুঃখের আর সীমা নেই। অথচ, মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে এই নামটাকে পর্য্যন্ত তিনি সহ্য করতে পারতেন না। রগড় জমে ওঠে —রজত সকৌতুকে কল্পনা করল,—হঠাৎ যদি বন্দনার আবির্ভাব হয় এখানে।

সাতাশ

বস্তুত রজত শুধু কল্পনাই করেছিল। কিন্তু বাস্তবে এমন ঘটনাও ঘটে যার কার্য্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা স্বাভাবিক বুদ্ধিতে অসম্ভব মনে হ'লেও ব্যতিক্রমের আইনের মধ্যে সম্পূর্ণ সম্ভবপর। হয় তো কারণটা কল্পনাতীত হতে পারে। কিন্তু সেটা ব্যতিক্রমের অস্তিত্বের মতো রহস্যময় হলেও অস্বাভাবিক নয়। তাই ঠিক ত্রিশ ঘণ্টা পরে একটা ট্যাক্সী থেকে বন্দনাকে নামতে দেখে রজত একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—রজতদা! নিকটে এসে বন্দনা প্রশ্ন করল: রমেশ নাকি এখানে এসেছে?

রজত উত্তর না দিয়ে একবার বাগানের দিকে তাকাল। রমেশ চৌধুরী মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বেও অদূরে বসে সকলের সঙ্গে গল্প করছিলেন। কিন্তু রজত সবিস্ময়ে দেখল, বন্দনার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শুভেন্দু ও সুকুমারের সঙ্গে হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে গেছেন। কেবল বিশু আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল।

—তোমার বুদ্ধি বিবেচনা কি কখনও হবে না? বিরক্ত হয়ে রজত বলল: তুমি কেন এলে এখানে?

—তুমি রাগ করোনা রজতদা! আমি শুধু দেখতে এসেছি, রমেশ সত্যিই এখানে এসেছে কি না। দেখেই চলে যাব।

—এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে তুমি সটান এখানে চলে এলে?

—একে তুমি সামান্য ব্যাপার বল? বন্দনা উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু সে যা অজুহাত দেখাল তাও আশাতীত। সে জানে রমেশ চৌধুরীর দেশ এই অঞ্চলেই। সেখানে তাঁর আর একটা স্ত্রী আছে, ছেলে-মেয়েও আছে। বন্দনার দৃঢ় বিশ্বাস তার পয়সায় তিনি এখন দেশে বসে প্রথম পক্ষকে নিয়ে মজা মারছেন।

—রজত?—গাড়ীর শব্দ শুনে মিঃ ঘোষালও বাইরে এসেছিলেন। বৈঠকখানার রোয়াকের ওপর থেকে তিনি সক্রোধে প্রশ্ন করলেন: ও স্ত্রীলোকটা আমার বাড়ীতে কেন? কী চায় ও এখানে?

রজত হাত নেড়ে তাঁকে নিরস্ত করল। তারপর বন্দনাকে বলল: কিন্তু, তুমি রমেশবাবুর দেশে না গিয়ে এখানে এলে কেন?

—অশোক যে বললে—

—কে অশোক? মুখ বিকৃত করে রজত বলল: সুকুমারের ভাই?

—হ্যাঁ। সে বললে, রমেশ নাকি দাদার সঙ্গে এখানে এসেছে মিনুদের কেস্ তদ্বির করতে। কিন্তু সে কী করে হতে পারে রজতদা? ওর তো এখন চাকরী নেই—

—রমেশবাবু এখানে বে-সরকারী তদন্তে এসেছেন। রজত বলল: কিন্তু, তোমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে। সঙ্গে কেউ আছে?

একটা ঢোক গিলে বন্দনা বলল: অশোক তো ছিল, কিন্তু—

—ছিল? এখন কোথায় সে?

—হয়তো ষ্টেশনে আছে—

—হয়তো? হুম্,—রজত চিন্তিতমুখে নিজের হাতঘড়ির দিকে

তাকাল। তারপর বিশুর উদ্দেশে বলল: ট্রেণের আর বেশী সময় নেই। আপনি একে একেবারে কলকাতায় পৌছে দিয়ে আস্থন—

—মাফ্ করতে হবে। বিশু তৎক্ষণাৎ বলল।

বিশুর রূঢ় প্রত্যাখ্যানে বন্দনার চোখের দৃষ্টি তীব্র হয়ে উঠল। রজতও ভ্রূ কুঞ্চিত করল। বলল: আপনি বুঝতে পারছেন না—

—মাফ্ করবেন—বিশু সাফ্ জবাব দিল: ওঁর পাল্লায় আর আমি পড়ছি না—

—তাহলে চল বন্দনা আমিই তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি। রজত আর সময় নষ্ট না করে বন্দনাকে নিয়ে ট্যাক্সীতে উঠে বসল।

ট্যাক্সী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশু গেষ্ট-হাউসের দিকে ফিরল। গত পূর্ব্ব রাত্রের দেখা সেই গোশালাটার রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। কিন্তু রজতের উপস্থিতির জন্যে জায়গাটার ধারে যেতেও সাহস করেনি সে। আপাততঃ সে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে নিশ্চিন্ত। বন্দনাকে কলকাতায় পৌছে দিয়ে রজত যত তাড়াতাড়ি এখানে ফেরবার চেষ্টা করুক না কেন, আগামী কাল দুপুরের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ফিরতে পারবে না। সুতরাং এই তার স্বর্ণ সুযোগ।

বিশু প্রথমে গেল গেষ্ট হাউসে, নিজের ঘর থেকে টর্চ্চটা আনবার জন্যে। পাশের ঘরটায় থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছিল রমেশবাবুর। তিনি ঘরেই ছিলেন। বিশুকে বারান্দা দিয়ে যেতে দেখে ডাক্ দিলেন: ওরে শোন—

বাধা পেয়ে বিশু বিরক্ত হ'লো। ঘরে ঢুকে দেখল সেখানে শুভেন্দুও রয়েছে। বলল: কী?

—ওরে, তোকে একবার দেশে যেতে হবে।

বিশু বিস্মিত হলো। বলল: কেন?

রমেশবাবু বললেন: আমার কয়েকজন বন্ধুর ভয়ানক মাছ ধরার ব্যায়রাম আছে। তাঁরা একবার আমাদের ওদিকে গিয়ে বস্‌তে চান। কিন্তু আমার পুকুরে তো মাছ নেই।

—আমাদের পুকুরে আছে নাকি?

—আছে বৈকি।

—বল কী! বিশু আশ্চর্য্য হয়ে বলল: কাকাদের গর্ভে সর্ব্বস্ব গেছে আর মাছগুলো যায়নি?

রমেশবাবু হাসলেন। বললেন: Village politics-এর ওই তো মজা রে! এ তো আর তোর একলার জমি নয় যে, খাজনার দায়ে নিলেম হয়ে যাবে। এ যে সরিকানি পুকুর! সেখানে তোর কাকাদের যদি কিছু থাকে তোরও নিশ্চয়ই কিছু আছে। আমি জানি তোদের বড় পুকুরে দেড় মণ পর্য্যন্ত কাত্‌লা আছে।

—কিন্তু আমি তো এখন সেখানে যেতে পারব না।

—কেন? রমেশবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিশুর দিকে তাকালেন। বললেন: এখানে বসে আড্ডা দিচ্ছিস; না হয় দুদিন দেশ থেকেই ঘুরে এলি?

—আমি এখানে আড্ডা মারতে আসিনি। বিশু চটে গেল।

—তবে কি কোন কাজে এসেছিস্ নাকি? রমেশবাবু এবার একটু হাসলেন।

বিশু এবার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু বিচলিত হ'লো না। বলল

হ্যাঁ। এক রকম কাজ বৈকি। আমার সেই পূর্ব্বের চাকরী আর নেই। আমাকে আবার চাকরী জোগাড় করতে হবে!

—আপনি তাহলে,—এবার প্রশ্ন করল শুভেন্দু: এখানে বসে চাকরী জোগাড় করছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।—সেদিনকার সেই কথা কাটাকাটির পর থেকে শুভেন্দুর সঙ্গে বিশুর বাক্যালাপ ছিল না বললেই হয়। তবুও, মনের ভাব চেপে বিশু হাসিমুখেই জবাব দিল: এক্ষেত্রে সমাজের মুরুব্বিদের আমি একটু সন্তুষ্ট করে চলাই কর্ত্তব্য মনে করি। আমার ধারণা, সে-বারে যাঁরা আমার চাকরী জোগাড় করে দিয়েছিলেন, এবারেও তাঁরাই দেবেন।

—তা বটে! শুভেন্দুর মনের ভাব কিছুই বোঝা গেল না। সে চিন্তিত মুখে বলল: কিন্তু, রমেশ যে আবার তাঁদের কথা দিয়ে ফেলেছে—

—আচ্ছা, তুই তাহলে এক কাজ কর,—রমেশবাবু হঠাৎ যেন একটা পথ দেখতে পেলেন। বললেন: তুই তোর মেজকাকাকে একখানা চিঠি লিখে দে যে, আমার জন চারেক বন্ধু যাচ্ছেন মাছ ধরতে। রাত্তিরে তাঁদেরকে আমার ঘরটা খুলে শোবার ব্যবস্থা করে দিও। আর তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে রমেশদার বাড়ীতে।

—আচ্ছা, তাই দোব'খন। বিশু প্রস্থানোদ্যত হলো।

—দোব'খন নয়, এখুনি দে। রমেশবাবু তাড়াতাড়ি একখানা পোষ্টকার্ড বার করে দিয়ে বললেন: ভদ্রলোকেরা অনেকদিন থেকে বলছেন, আমার আর মুখ থাকে না, তুই এখুনি লেখ—

—তোমার সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি!—অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে বিশু

চিঠি লিখতে আরম্ভ করল। তারপর চিঠি শেষ করে, ঠিকানা লিখতে গিয়েই তার কলম থেমে গেল।

—কী হলো ?

—আমার ঘরে তো তাঁদের থাকবার সুবিধে হবে না!

—হবে না? শুভেন্দু অন্যমনস্কের মতো বিশুর হাত থেকে পোষ্টকার্ডখানা নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল: তাই তো...

—কিন্তু কেন বল্ দেখি? প্রশ্ন করলেন রমেশবাবু।

—বুঝতে পারছ না? বিশু বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল: ছ' বছর সে ঘরে কেউ ঢোকেনি। হঠাৎ সে ঘরে গিয়ে কেউ রাত কাটাতে পারে?

—তাও তো বটে। শুভেন্দু পোষ্টকার্ডখানা ইতিমধ্যে পকেটস্থ করে ফেলেছিল। চিন্তিত হয়ে বলল: অগত্যা তাহলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

অব্যাহতি পেয়ে বিশু নিজের ঘরে এল। তারপর টর্চ্চটা নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেল বাগানে।

কিন্তু আবার বাধা পড়ল। গত-পূর্ব্ব রাত্রে পুষ্পকে টেনে এনে সে যে অশ্বত্থ-বেদীটার ওপর বসিয়ে দিয়েছিল, ঠিক তারই কাছে দাঁড়িয়েছিল লিলি। দেখেই বিশু উল্টো দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল।

—বিশুবাবু! তীক্ষ্ণকণ্ঠে লিলি চীৎকার করে উঠল: শীগ্‌গীর একবার আসুন তো—

বিশু ফিরল। কিন্তু নিকটে এসে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। দেখল, লিলির এক হাতে জুতো, অপর হাতে একটা শ্বেত-করবীর ডাল।

সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। ওদিকে একটা কল্‌কে ফুল'গাছের তলায় আড়্ হয়ে শুয়ে নিজের গালে হাত বুলোচ্ছে সুকুমার।

—রাস্‌কেলটাকে একটু ধরে রাখুন তো, আমি ওদের ডাকি। বলেই, লিলি ছুটে চলে গেল খিড়কীর পুকুরের দিকে।

পরিস্থিতিটা অভাবনীয় হলেও বিশু কিন্তু ঘটনাটা জানবার জন্যে কোন রকম আগ্রহ প্রকাশ করল না। সুকুমারের মতো ছেলের পক্ষে এ ক্ষেত্রে কী ধরণের অপরাধ করা স্বাভাবিক, সে সম্বন্ধে তার সন্দেহ-মাত্রও ছিল না। সে অপেক্ষা করতে লাগল অপরাধীর কৈফিয়ৎ শোনবার জন্যে।

সুকুমার কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টাই করল না; এমন কি বিশুর দিকে একবার চেয়েও দেখল না পর্য্যন্ত। শুধু আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বেদীটার ওপর বসল।

বিশু একটু আশ্চর্য্য হলো। সুকুমারের ভাব-ভঙ্গীর মধ্যে অপরাধী জনোচিত কোন রকম দুর্ব্বলতা তো প্রকাশ পাচ্ছে না। তার চাকরী যাওয়ার উপলক্ষের কথাটাও মনে পড়ে গেল। সেবারেও সুকুমার তার কাছে ধরা পড়েছিল এই রকম হাতে-নাতে। অবশ্য সেবারে বন্দনার তরফ থেকে কোন রকম প্রতিবাদের প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু সুকুমার তো তার অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন ছিল! এই শ্রেণীর অপরাধীরা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সাধারণত দুটি পন্থা অবলম্বন করে থাকে। সাক্ষীর ওপর হয় তারা ভয়ানকভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে কিংবা তার মুখ বন্ধ করবার জন্যে প্রকাশ করে চরমতম হীনতা। সুকুমারও সেবারে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করেছিল ক্রুদ্ধ হয়ে। কিন্তু উপস্থিত তো তাকে ক্রুদ্ধ

মনে হচ্ছে না। বিচলিতও সে হয়নি; বরং তার মুখের ওপর কেমন যেন একটা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার ভাব ফুটে উঠেছে। ব্যাপার কী!

মিনতি ও পুষ্পকে টানতে টানতে লিলি এসে উপস্থিত হলো। বলল: তোরা এখানে দাঁড়া, আমি দারোয়ানদের ডেকে আনি। বলেই, আবার সে প্রস্থানোদ্যত হলো। কিন্তু পুষ্প তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে নিরস্ত করল।

বিশু এবার একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। লিলি মেয়েটা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির বটে, কিন্তু উপস্থিত ওর মৎলব কী। ওর ব্যবহারের মধ্যে ক্রোধ যতখানি প্রকাশ না পাচ্ছে তার চাইতে ঢের বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে উৎসাহটা। কোন রকমে লোকজন জড় করে তাদের সুমুখে সুকুমারকে অপদস্থ করতে পারলেই যেন ওর আশা পূর্ণ হয়। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী! শেষ পর্য্যন্ত পর্ব্বতের মুষিক প্রসবের মতো কোন ঘটনা ঘটবে নাকি।

—আপনার বোনকে বলুন,—এতক্ষণ পরে সুকুমার কথা কইল। পুষ্পকে উদ্দেশ করে জলদ-গম্ভীর স্বরে সে বলল: শুধু দারোয়ানদের ডাকলেই হবে না, মিঃ ঘোষালকেও ডেকে আনা চাই—

পুষ্প অভিভূতের মতো চেয়ে রইল, কোন কথা কইতে পারল না।

—কী হয়েছে মিঃ সেন? প্রশ্ন করল মিনতি: বিশুবাবু আপনি কিছু জানেন?

—না। সুকুমার বলল: বিশুবাবু শুধু ওই মহিলাটির উপকার করবার মতলবেই এসেছেন, জানেন না কিছুই।

—কিন্তু হলো কী?

—সেটা আপনার বান্ধবীই বলুন না।

লিলি ফোঁস্ করে উঠল। মিনতি তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিল। কিন্তু সুকুমারের মেজাজ দেখে নিজেও সে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। লিলির অদ্ভুত প্রকৃতির কথা তো তার অজানা নয়! বলল: ওর কথা ছেড়ে দিন, ও একটা পাগলী। কিন্তু...

—খবরটা রাখেন দেখছি। বাধা দিয়ে সুকুমার বলল: পাগলের আস্তানা পাগলা-গারদেই হওয়া উচিৎ। কিন্তু, আপনার বাবা বাড়ীতে পাগল পুষে কেন আমাদের অপমান করাচ্ছেন, সে জবাব তাঁকে দিতে হবে।

—লিলি।—পুষ্প এবার বিরক্ত হয়ে বলল: তুই ওঁকে কেন অপমান করেছিস্?

লিলি গর্জ্জন করে উঠল: আমি অপমান করেছি, না, ও আমায় অপমান করলে? জানিস্ ভাই মিনি, আমি কেবল মাত্তর্ জিগ্ গ্যেস্ করেছিলুম, পুণি এলো না কেন। তাতে ও কী বললে জানিস? ফট্ করে বললে, তুমি এবার বন্দনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করগে যাও, তোমার মতো মেয়ের সঙ্গে আমি প্রণতিকে মিশতে দেব না—

—এ কথার মানে? লিলিকে নিরস্ত করে বিশু এবার সুকুমারের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াল। ভ্রুকুটি করে বলল: এ কথার মানে কী?

—মানে আবার কী! সুকুমারও সক্রোধে জবাব দিল: যে মেয়ের বাক্স থেকে একশ সতেরখানা প্রেমপত্র বেরোয় তার সঙ্গে আমার বোনকে আমি নিশ্চয়ই মিশতে দেব না।

—কী? লিলি চীৎকার করে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পুষ্প তাকে ধমক দিল: চুপ কর মুখপুড়ি—

কিন্তু চিঠির উল্লেখে পরিস্থিতির আবহাওয়াটা অন্য গতি ধারণ করল। লিলির অভিযোগ শুনে, মেয়েরা সুকুমারের ওপর কতখানি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, সেটা যত না প্রকাশ পেল, তার চাইতে বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠল তাদের আলোচনা চাপা দেবার আগ্রহটা। কিন্তু বিশু পুরুষ মানুষ, তার ওপর নীতিবাগীশ। তার মাথায় মেয়েদের মনের অত সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্যাঁচ্ কিছুই ঢুকল না। সে রহস্যটাকে আরও ফ্যালাও করে ফেলল।—যতো সব ছেলে-মানুষী,—এই অজুহাত দেখিয়ে মেয়েরা যেমনি প্রস্থান করবার উপক্রম করল, অমনি সে সুকুমারকে প্রশ্ন করে বসল: চিঠির কথা কে বলেছে আপনাকে

সুকুমার চুপ করে রইল।

—চুপ করে থাকলে হবেনা, উত্তর দিতে হবে। কে বলেছে,—বন্দনা?

সুকুমার একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল। তবুও জোর করে মনে সাহস এনে বলল: হ্যাঁ, কেন? কী হয়েছে তাতে?

—কী হয়েছে? বিশু সক্রোধে খিঁচিয়ে উঠল: You fool, বন্দনার মতো একটা মেয়ে-মানুষের কথায় বিশ্বাস করে তুমি লিলিকে অপমান করতে সাহস করো? এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার! টাকার গরমে মাথা একেবারে বিগড়ে গেছে? Stupid, মানহানির মামলা বোঝো? কত টাকা আছে তোমার? আমি তোমাকে......

—আঃ কী হচ্ছে, থাম থাম। বিশুর মূর্ত্তি দেখে মিনতি একেবারে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। সে সজোরে তার বাহু আকর্ষণ করে বলল: চলে এস এখান থেকে। আঃ এস না—

বিশুকে কিছুদূর পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে মিনতি তার হাত ছেড়ে দিল। বলল: কী হবে ও সব নোংরা ঘেঁটে? চলুন—

—নোংরা? সঙ্গে সঙ্গে বিশু আবার ঘুরে দাঁড়াল।

—আবার কী হলো?

—রাস্‌কেলটাকে জানিয়ে দিয়ে আসি ব্যাপারটা মোটেই নোংরা নয়। লিলিকে চিঠিগুলো লিখেছিল ওরই বোন প্রণতি—

—আঃ। পুষ্প এবার বিরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু বিশুকে বাধা দেবার জন্যে বিরক্তি প্রকাশ করলেও সে বলল মিনতিকে উদ্দেশ করে: কী এমন হয়েছে যে এই নিয়ে এত হৈ-চৈ করতে হবে?

শুনে বিশু অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'লো। সুকুমারকে সেও অপমান করেছে কিন্তু করেছে পুষ্পকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেই,—লিলি পুষ্পর বোন বলে। না হলে, একটা ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হয়েও সুকুমার যদি তার বোনকে লিলির সঙ্গে মিশতে না দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, সেটা নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু মারাত্মক অপরাধ নয়, যার জন্যে লিলির স্বপক্ষে জুতো মারার অজুহাত খাটতে পারে। অথচ তার কাজের জন্যে পুষ্প তাকে ধন্যবাদ তো দিলই না, বরং প্রকাশ করল বিরক্তি। মেয়েরা এমনি অকৃতজ্ঞই বটে!

অপর পক্ষে সুকুমারের ব্যবহারের মধ্যেও একটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করে মনটা তাঁর খুঁৎখুঁৎ করছিল। চিঠির আসল রহস্যটা অবশ্য সুকুমারের জানবার কথা নয়। কিন্তু এই না-জানার ফল স্বরূপ তার মতো ছেলের পক্ষে যে সুযোগটা গ্রহণ করা সব চাইতে স্বাভাবিক ছিল সেটা সে গ্রহণ করল না কেন? কুমারী মেয়েদের কলঙ্ক কাহিনীগুলোকে কাজে লাগিয়ে

কার্যোদ্ধার করে থাকেন যাঁরা, সুকুমার তো সেই শ্রেণীরই একজন ভদ্রলোক। অথচ অমন একটা সুযোগ ত্যাগ করে সে সাবধান হয়ে উঠল নিজের বোনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। কেন? সুকুমার তো উচ্ছ্বাসপ্রবণ ছেলে নয় যে, সামান্য কারণে রাতারাতি নীতিবাগীশ হয়ে উঠবে।

—লিলি! পুষ্প আবার চাপা গলায় বলে উঠল: তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি কি কখনও হবে না? এই সামান্য কথা নিয়ে তুই একজন ভদ্রলোককে অপমান করে বসলি?

—ইস্! কী আমার ভদ্রলোক রে! লিলি নাক ফুলিয়ে বলল: ব্যাটা বদমাইস! ব্যাটাকে কালও জুতো মেরেছি, আজও মেরেছি, আবার মারব......

—এঁ্যা? মিনতি সকৌতুকে বলল: ওকে কালও মেরেছিলি, কেন রে?

—কেন?—ভ্রুভঙ্গি করে লিলি বলল: কাল বাগানে আমাকে একলা পেয়ে ব্যাটা কী বলছিল জানিস? বলছিল: লিলি, আমি যদি তোমায় চিঠি লিখি উত্তর দেবে তো? আমি বললুম: হঠাৎ আমাকে আবার কী চিঠি লিখবেন? ব্যাটা তখন গদগদ হয়ে বললে: যে কথা আমি মুখে বলতে পারছি না, তাই তোমায় লিখে জানাব! এই রকম আরও সব অনেক কথা বললে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও পা থেকে......

—চুপ্ কর মুখপুড়ি! বিশুর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে পুষ্প লিলিকে আবার ধমক দিল।

—দেখ্ পুষি! লিলিও এবার চটে গেল। বলল: মুখপুড়ি মুখপুড়ি করিস্‌নে বলছি! আমাকে মুখপুড়ি বলবার তোর কী right আছে?

—আঃ! লিলিকে ঠাণ্ডা করে মিনতি বলল: তুই সত্যিই একটা পাগলী! দেখিস, এ সব কাণ্ডের কথা যেন আর কারুর কানে না ওঠে! বিশুবাবু, আপনিও দয়া করে—

—জানি!

আটাশ

বিশুর ইচ্ছে ছিল, মেয়েদেরকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েই সে আবার ফিরে আসবে গোশালার দিকে। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফেরা তার হলো না। বৈঠকখানা থেকে মিঃ ঘোষালের ডাক্ এল : ওহে, বিশু, শোন শোন—

বিশুকে ঘরে ঢুকতেই হলো।

—বসো। মিঃ ঘোষাল গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ বিশুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন : তুমি কি এখন গেষ্ট-হাউস থেকে আসছ? শুভেন্দুরা ওখানে রয়েছে দেখলে?

—হ্যাঁ।

—ইয়ে,—মিঃ ঘোষাল একটু ইতস্তত: করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন : ওই মেয়েটার সম্বন্ধে কিছু বলছিল নাকি ওরা?

বিশু এবার মনে মনে হাসল। এদিকে বন্দনাকে ক্রোধের বশে বিতাড়িত ক'রে মিঃ ঘোষাল সমস্যায় পড়ে গেছেন, শুভেন্দু ও রমেশবাবুর কাছে মুখ দেখাবেন কী করে! ওদিকে ওরাও মুখ লুকিয়ে বসে আছে বন্দনারই আবির্ভাবের জন্যে। বলল : কই, কিছু তো শুনলুম না।

—তাহলে বোধ হয়,—মিঃ ঘোষাল এবার যেন একটু ভরসা পেলেন। বললেন : ওরা বন্দনার আসার খবরটা জানে না। এ ভালই হ'লো কী বল? অপ্রিয় ব্যাপারটা নিয়ে আর হৈ চৈ কিছু হ'লো না। ভাগ্যিস্ রজত ছিল, কী বল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিঃ ঘোষাল অতঃপর রজতের সুখ্যাতি আরম্ভ করলেন : অমন ছেলে লাখে একটা মেলে না। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনি বুদ্ধি বিবেচনা, তেমনি চরিত্রবান। দেখলে না, কেমন চট্ করে মেয়েটাকে নিয়ে সরে গেল। অন্য কেউ হলে পারতো ? পারলেও তার নিন্দে রট্‌তো। অথচ রজত সম্বন্ধে ও প্রশ্নই ওঠে না। আমরা সকলেই জানি, সব রকম নিন্দে সুখ্যাতির বাইরে ও। অবশ্য গোটা কতক মারাত্মক দোষও আছে ওর—

—তাই নাকি ? কিন্তু প্রস্থান করবার মতলবে উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার বসে পড়ল। সাগ্রহে প্রশ্ন করল : কী রকম ?

—ওকে এক ধরণের পণ্ডিত মূর্খ বলা যেতে পারে। ও পড়াশোনা করেছে প্রচুর। যে কোন subject নিয়ে কথা কইবার মতো বিদ্যে কিছু ওর আছে। বিশেষতঃ দেশ-বিদেশের ইতিহাসগুলোকে ও যেন গুলে খেয়েছে। কিন্তু তুমি শুনলে আশ্চর্য্য হবে, এই বিংশ শতাব্দীর যুগে, এত লেখাপড়া শিখেও, ও আজও ভারতবর্ষের সেই সনাতন ধর্ম্মকে আদর্শ বলে মনে করে। দেখলে না, কাল সেই চাল-কলা-বাঁধা বামুন-গুলোর হয়ে আমাকে কী রকম শুনিয়ে দিলে ?

বিশু আবার মনে মনে হাসল। একজন শিক্ষিত লোককে সমালোচনা করতে গিয়ে আর একজন শিক্ষিত লোক কতখানি আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়ে ! মিঃ ঘোষাল রজতের শিক্ষার সমালোচনা করছেন, বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষার দোহাই পেড়ে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন, যে-শিক্ষা মনকে উদার ক'রে তোলে, কুসংস্কারকে এড়িয়ে চলতে শেখায়, সে শিক্ষা তাঁর আছে। এবং আছে বলেই তিনি রজতের দোষগুলো বিচার করতে, তথা উপেক্ষা করতে

পারছেন স্নেহের হাসি হেসে। অপর পক্ষে রজত যে গতকাল কেন ব্রাহ্মণদের হ'য়ে দালালী করেছিল, সে কথা সে ভাল করেই জানে। অথচ সেই তুচ্ছ কথাটার ওপর নির্ভর ক'রেই মিঃ ঘোষাল সবজান্তা বিধাতার মতো বলে বসলেন: রজত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সনাতন ধর্ম্মী!—বিংশ শতাব্দীর সংশিক্ষা মিঃ ঘোষালকে অনেক কিছুই শিখিয়েছে, শুধু শেখায়নি আত্ম-সচেতন হ'তে। এ শিক্ষার সম্ভবতঃ এইটেই একমাত্র পরিচয়। নাহলে, তিনি বুঝতেন: যে বস্তুটা তাঁকে বিচার-প্রবণ ক'রে তুলেছে, আসলে সেটা সং-শিক্ষার ঔদার্য্য নয়,—স্পর্দ্ধা! ঔদার্য্যের মুখোস পরে তাঁর শিক্ষার দম্ভটাই প্রকাশিত হ'য়ে পড়ছে। মিঃ ঘোষাল ভুলে গেছেন: সংশিক্ষা কখনও মানুষকে দাম্ভিক হ'তে শেখায় না। পরন্তু রজতের কথা-বার্ত্তা ও আচার-ব্যবহারের মধ্যে বিদ্যাং দদাতি বিনয়ং—এই ধরণের খাঁটি ভারতীয় নীতি কথাগুলো প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে বলেই,—সে পণ্ডিত মূর্খ বা গোঁড়া।

রমেশবাবুকে নিয়ে শুভেন্দু ও সুকুমার ঘরে ঢুকল। বিশু আবার উঠে পড়ল।

—আবার উঠ্‌ছো কোথায়?—মিঃ ঘোষাল বললেন: রাতের খাওয়াটা একেবারে খেয়ে যাওনা! এঁরাও এসে গেছেন—

সুতরাং বিশুকে আবার বসতে হলো।

কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পরও সে নিস্তার পেল না। শুভেন্দুরা গেষ্ট-হাউসের দিকে রওনা হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ ঘোষাল আবার তাকে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন। উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বললেন: হ্যাঁ হে বিশু, সুকুমারের কী হয়েছে বলতে পারো?

—কী হ'য়েছে ?

—যাবার সময় হঠাৎ আমাকে বলে গেল : Excuse me, কাল সকালেই আমি চলে যাচ্ছি ! হঠাৎ কী হ'লো ওর ?

বিশু নির্ব্বিকার মুখে বলল : হয়তো অফিসের জন্যে যেতে চাইছে—

—নাঃ তা নয় ! মিঃ ঘোষাল মাথা নেড়ে বললেন : আজ বিকেলেও ওর সঙ্গে আমার কথা হ'য়েছে। আমি লোকজন খাওয়াব শুনে, ও এখানে এক মাস পর্য্যন্ত থাকতে রাজি হয়েছিল—

—আপনি তাহলে মত্ বদলেছেন ? বিশু একটু আশ্চর্য্য হয়েই জিজ্ঞাসা করল : লোকজন খাওয়াবেন তাহলে ?

—হ্যাঁ, কিন্তু এখন নয়। এদিককার দশদিন তো প্রায় শেষ হ'য়েই এল,—এখন শ্রাদ্ধটা কোন রকমে নমো নমো ক'রে সেরে দিয়ে, ভাবছি, আসছে মাসে সপিণ্ডকরণের দিন একটু ঘটা করবো। কিন্তু...

—তাহলে, বিশু হেসে বলল : রজতের দালালীতে কাজ হ'য়েছে বলুন ?

মিঃ ঘোষাল গম্ভীরভাবেই বললেন : না তা ঠিক্ নয় ! সমাজে বাস করতে গেলে আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছে-অনিচ্ছেরও তো দাম দিতে হয়। কিন্তু সুকুমারের হ'লো কী ?

—আপনি কেন এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন ?

—সামান্য ? মিঃ ঘোষাল আবার মাথা নাড়লেন। বললেন : নাঃ something wrong. আচ্ছা, মিনুকে একবার জিগ্ গেস্ করে দেখি।

মিনতি এল। তারপর এল পুষ্প। লিলিকেও ডাকা হলো সকলের

শেষে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘণ্টা দেড়েক সময় কেটে গেল। কিন্তু কেউই সুকুমার সম্বন্ধে মিঃ ঘোষালের মনে কোন রকম আলোক-পাত করতে পারল না।

অব্যাহতি পেয়ে বিশু তাড়াতাড়ি গোয়াল-ঘরের দিকে অগ্রসর হলো। মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল সে। আজকের মধ্যে গোশালার রহস্য তাকে উদ্‌ঘাটন করতেই হ'বে, অথচ বাধা পড়ছে ক্রমাগত। সে আরও তাড়াতাড়ি পথ চলবার জন্যে পকেট থেকে টর্চ্চটা বার করে জ্বালল।

কিন্তু আবার বাধা পড়ল। টর্চ্চের আলোতেই দেখা গেল রমেশবাবু ও শুভেন্দু সেই অশত্থ-বেদীটার ওপরে বসেই বিশ্রাম্ভালাপ করছে।

অগত্যা গোশালা রহস্য উদ্‌ঘাটনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বিশু নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু আর একটা রহস্য তাকে চঞ্চল করে তুলল। এত বাধা পড়ছে কেন? ব্যাপারটা কোন রকম বিপদের পূর্ব্বাভাষ নয় তো!

—বিশুবাবু! মশারীর ভেতর থেকে মৃদুস্বরে রজত ডাকল।

—আপনি? বিশু যেন ভূত দেখল।

—আস্তে মশাই আস্তে! শুনতে পাবে যে—

বিশু সবিস্ময়ে চাপা গলায় প্রশ্ন করল: আপনি বন্দনার সঙ্গে কলকাতায় যান নি?

—আপনি বলেন কী? ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ করে রজত বলল: শুভেন্দুরা এখানে থাকতে আমি যাব কলকাতায়?

—তবে যে বললেন—

—বলেছিলুম আপনাকে সরাবার জন্ম।—একটু রূঢ়স্বরেই রজত বলল: কিন্তু আপনি গ্রাহ্য করলেন না। আপনাকে আমি দু' দুবার সুযোগ দিলাম, কিন্তু···আপনাকে নিয়ে আর তো আমি পারিনা বিশুবাবু। আপনি কি আমাদের সকলকে ডোবাতে চান?

রজতের কাছ থেকে এ ভাবে ভৎসিত হওয়া বিশুর জীবনে এই প্রথম। সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। অথচ অপরাধ তারই। গোয়াল-ঘরের রহস্যের মতো একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সে এমনই উন্মত্ত হয়ে পড়েছিল যে রজতের এই অতি সহজ ইঙ্গিতটাও ধরতে পারে নি।

—আপনার ছেলেমানুষী অসহ্য। রজত আবার বলে উঠল: আপনি কি ননীর পুতুল যে, বন্দনার পাল্লায় পড়লে একেবারে গলে জল হয়ে যেতেন।

বিশু নীরবেই অপরাধ স্বীকার করে নিল।

—বিশুবাবু। কিছুক্ষণ পরে রজত আবার ডাকল। কণ্ঠস্বর এবার অত্যন্ত নরম। বলল: জেগে আছেন?

—আছি। কী হয়েছে?

—বড্ড খিদে পেয়েছে, কী করি বলুন তো?

—ও বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে আসুন না। বিশু একটু আশ্চর্য্য হয়েই বলল: রাত তো এখনও বেশী হয় নি।

—আপনার মাথা খারাপ হয়েছে। আমি তো এখন কলকাতায়।

—তার মানে? বিশু বিস্মিতকৌতুকে বলল: আপনি কি আসছে কাল দুপুরের পূর্ব্বে আত্মপ্রকাশ করবেন না নাকি?

—নিশ্চয়ই না। এই সুযোগে সব কাজ সেরে ফেলতে হবে আমায়। কিন্তু এখানে ঢুকে কী মুস্কিলে পড়লুম দেখুন তো। এতক্ষণ বিভূতির সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে খাবার কথা মনেই ছিলনা। এদিকে এখন...

—এখানে আবার ফিরতে গেলেন কেন ?

—টাকার জন্যে। বেরুবার সময় তো প্রস্তুত ছিলাম না। শ' দুয়েক টাকার এক্ষুনি দরকার। আপনারা যখন খেতে গিয়েছিলেন, সেই সুযোগে ঢুকেছিলাম। কিন্তু বেরুতে গিয়েই দেখলাম, শুভেন্দুরা দরজা আগলে বসে রয়েছে।

—দরজা ? কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে বিশু বলল : আপনি কোন দরজার কথা বলছেন ?

রজত এতটুকুও ইতস্ততঃ না করে গোশালাটার উল্লেখ করল। বিশুরও রহস্য উদ্‌ঘাটনের আকাঙ্ক্ষা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলো কারণ রহস্য তার মধ্যে কিছুই ছিল না। পরিত্যক্ত জাবনার খোলাটা সরিয়ে ফেললেই বেরিয়ে পড়ে প্রকাণ্ড একটা গর্ত। সেইটেই বাইরে যাবার গুপ্তদ্বার। দ্বারের বাইরেই আছে একটা আঁস্তাকুড়, তারপরেই আরম্ভ হয়েছে বাঁশিনী-বাঁশের নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গল পেরিয়েই বাদা। সেই বাদার আল্ ধরে গোবিন্দপুরে যাওয়া যায়।

—কিন্তু, শুভেন্দুরা এতক্ষণ ওখানে বসে করছে কী ? ওদের ঘুম পায় নি ?

বিশু বলল : হয়তো ওরা আপনার গুপ্ত-দ্বারের সন্ধান পেয়েছে—

—সে তো পেয়েইছে। আমি ওদের ঢুকতে দেখেছি ওর ভেতর। কিন্তু হতভাগারা ওখানে বসে আছে কেন ? হয় আবার ওর ভেতর

ঢোক্, আমি সদর দিয়ে সরে পড়ি। না হয় ঘরে এসে শুয়ে পড়্‌...
কিন্তু,—রজত আরও অধৈর্য্য হয়ে পড়ল। বলল: কী করা যায়! দেখুন দেখি, কুঁজোটাতে জল্-টল্ কিছু আছে কি না! উফ্, পেটের ভেতর যেন ভীমরুল্ কামড়াচ্ছে...

বিশু কুঁজো এনে দিল। আধ্-কুঁজো জল্ টেনে, কথঞ্চিৎ ধাতস্থ হ'লো রজত। বলল: তারপর এদিক্‌কার খবর কী বলুন? উল্লেখ-যোগ্য কিছু ঘটেছে নাকি?

—ঘটেছে বৈকি। বিশু লিলি-ঘটিত ব্যাপারটাকে সবিস্তারে বর্ণনা করল। তারপর বলল: এ ব্যাপারের পর সুকুমারের পক্ষে এখানে থাকা সত্যিই অসম্ভব। কিন্তু সে কাল চলে যাবে শুনে মিঃ ঘোষাল বড্ড মুষড়ে পড়েছেন।

—স্বাভাবিক! রজত গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল: সুকুমারকে বাড়ীতে বসিয়ে তোয়াজ করার একটা ভাল সুযোগ এসেছিল,—হয়তো মেয়েটারও একটা হিল্লে হ'য়ে যেত। কিন্তু ফস্‌কে গেল!

ইঙ্গিতটা অত্যন্ত স্পষ্ট। বিশু আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: কিন্তু, সুকুমার যে জাতে তাম্বুলি—

—নাঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। রজত বিরক্ত হ'য়ে বলল: মিঃ ঘোষাল কি আপনার মতো সেকেলে লোক যে, জাত বিচার ক'রে মেয়ের বিয়ে দেবেন?

—কিন্তু আমি জানি, বিশু দৃঢ়স্বরে বলল: একটি ছেলেকে তিনি reject করেছিলেন, সে বামুন নয় বলে—

—ছেলেটি নিশ্চয়ই বড়লোক নয়?

—না। কিন্তু শিক্ষিত এবং সৎ-চরিত্র।

—আরে রাখুন আপনার সৎ-শিক্ষা আর সৎ-চরিত্র!—অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে রজত বলল : বর্ত্তমান সভ্যতার কাছে ওসবের কোন দাম নেই ; ওসব পুরোণ হ'য়ে গেছে! পৃথিবীতে এখন শুধু দুটি জাতের মানুষ বাস করে,—বড়লোক আর ছোটলোক—

—আপনি তাহলে বল্‌তে চান, এ যুগের মানুষের কাছে মনুষ্যত্বের কোন দাম নেই? কাঞ্চন-কৌলীন্যই সব?

—Not only কাঞ্চন-কৌলীন্য! আমি তো ধনী-দরিদ্রের কথা বলিনি, বলেছি বড়লোক আর ছোটলোকের কথা। ছোটলোকেরা যাদের কথায় চালিত হয়, তারাই হ'চ্ছে বড়লোক—

—কিন্তু—

—There is no কিন্তু। রজত আরও উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। বলল : বর্ত্তমান সভ্যতার কাছে সব চাইতে দাম বেশী প্যাঁচোয়া মানুষের। এরাই হ'চ্ছে বড়লোক। আপনিও প্যাঁচ কষুন, তদ্বির করুন, দেখবেন দেশের লোকে আপনাকেও একজন কেষ্ট-বিষ্টু বলে মেনে নেবে। নাহলে, সারা জীবন আপনার বেগার খাটাই সার হ'বে!

বেগার খাটার কথায় বিশু এবার সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠল। রজত কংগ্রেসের ওপর কটাক্ষ করছে না তো! একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই জিজ্ঞাসা করল : এটা নিশ্চয়ই আপনার ব্যক্তিগত বিশ্বাস?

—না। এটা হ'চ্ছে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনশাস্ত্রের মূল কথা। এ দর্শন ভারতবর্ষের দর্শন নয়। এতে অনর্থের কথা নেই ; শান্তির বাণী নেই ; কোন আধ্যাত্মিক কল্পনাও নেই! এতে

আছে নিরঙ্কুশ অর্থনীতির কথা; বাস্তববাদের খাঁটি পরিচয়; বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে কৌশলে আত্মরক্ষা এবং স্বার্থ সিদ্ধি করবার প্ররোচনা। বিংশ শতাব্দীতে বড় লোক হতে হলে আপনাকেও এই দর্শনশাস্ত্রের ঋষিটিকে সর্ব্ব-নিয়ন্তা বিধাতার মতো পূজো করতে হবে, যদিও এই দর্শনশাস্ত্র ধর্ম্ম ও ঈশ্বরবাদের পরম শত্রু। এই শাস্ত্রের মূল কথা যদি ছোট লোকেরা বুঝতে না পারে,—আপনাকে তাহলে ছোটলোকদের বন্ধু সেজেই, Dictator হ'তে হ'বে। বুঝলেন, প্যাঁচ্ জানা থাকলে, ছোটলোকদের দোহাই পেড়েও বড়লোক হওয়া যায়।

বিশু একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। রজত যে আসলে কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে সেটা বুঝতে তার একটুও বিলম্ব হয় নি। কিন্তু লোকটার তাহলে সত্যিকার মতবাদ কী? একটা পুরোন কথাও তার মনে পড়ে গেল। একদিন মিনতির মুখে সে শুনেছিল, রজত রুষীয় সাম্যবাদের উদাহরণ দেখিয়ে অতীত-বিলাসী জনার্দ্দনবাবুকে নাকি একেবারে নির্ব্বাক করে দিয়েছিল। অথচ ওর এখনকার বক্রোক্তি পরিপন্থী বিশ্বাসেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। এ অসঙ্গতির রহস্য কী?

রজত আবার বলল: বুঝলেন মশাই, যদি সত্যিই বড় হতে চান, তাহলে মনুষ্যত্বের কথা ভুলে গিয়ে মেসিন হ'বার চেষ্টা করুন। তদ্বির করুন, প্যাঁচ্ কষুন, দেখবেন তাড়াতাড়ি কার্য্যোদ্ধার হ'য়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন না, রামবাবু অন্নজল ত্যাগ করেছেন দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে, শ্যামবাবু ছোটলোকদের জন্যে ভেবে ভেবে চেহারা ক'রে

ফেলেছেন ঝোড়ো-কাকের মতো। যদুবাবু রাতারাতি বড় হবার জন্যে বেশ্যার দালালী পর্য্যন্ত করেছেন। অথচ একটু খোঁজ নিন্, দেখবেন—রামবাবু চান, English rule without Englishmen. এঁকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে দেশের লোককে অকালে কমলালেবুর খুঁজে বেড়াতে হয়। শ্যামবাবু চান, Capitalism without Capitalists, এঁর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে যত মদ ও মেয়ে মানুষের দরকার হয়, তার দাম জোগায় তাঁরই ছোটলোক অনুগামীরা। যদু বাবু চান, দেশ থেকে বেশ্যাদের একেবারে নির্ম্মূল করতে। ফলে, পল্লী ছেড়ে বেশ্যারা আজ ভদ্রলোকদের মাথার ওপর এসে ঘর ভাড়া করছে। এঁর কর্ম্মশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে দেশের অনেক ভদ্রমহিলাই, বর্ত্তমানে আর ভদ্র নেই। বুঝলেন মশাই, এটা হচ্ছে ism-এর যুগ। শনৈঃ পন্থা। প্রথমে Provincial Socialism নিয়ে কাজ আরম্ভ করুন। তারপর আস্তে আস্তে all India-র কথা বলুন। তার পর যদি দেখেন সুবিধে হচ্ছে না তখন One World-এর কথা বলবেন। কিন্তু খবরদার। Internationalism preach করবার সময় ভুলেও যেন মুখ দিয়ে Nationalism-এর কথা বেরিয়ে না যায়।

বিশু এবার হেসে ফেলল। এতক্ষণ পরে সে যেন রজতের আসল মতবাদের মধ্যে একটা সঙ্গতির আভাস পেল। যাদের সত্যকার কোন Nationality-র বালাই নেই Inter-Nationalism-এর দোহাই পাড়ে তারাই সব চাইতে বেশী। ঠিক কথা। যাদের নিজেদের চরিত্রে গলদ সব চাইতে বেশী, পরের ছিদ্র অন্বেষণ তারাই বেশী করে বেড়ায়।

—ইস্‌স্‌...রজত মুখে আঙ্গুল চাপা দিয়ে বিশুকে নীরব থাকবার ইঙ্গিত করল।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে রমেশবাবুর ঘরের খিল বন্ধ করার আওয়াজও শোনা গেল।

—উফ্‌, বাঁচা গেল।—কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করে রজত যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো। বলল: উফ্‌, পেটের জ্বালা মানুষকে কী রকম বক্তার করে তোলে দেখেছেন। চললুম মশাই, আবার কাল দেখা হবে।

উনত্রিশ

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখে অনেকেই ভুল করে। বিশুও পাশ ফিরে শুলো। এখনও যখন ভাল করে ভোর হয়নি, তখন আরও কিছুক্ষণ সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আলস্য-বিলাসটাকে আরাম করে উপভোগ করা তার হ'লো না। মিনতি এসে তার হাত ধরে নাড়া দিল। বলল: আপনি কী বলুন তো! এদিকে যে দশটা বাজে।

—দশটা বাজে? বিশু তাড়াতাড়ি উঠে বসল। তারপর মিনতিকে একলা দেখে জিজ্ঞাসা করল: একলা যে? তিনি কই?

—তিনি মানে? একটু মুখ টিপে হেসে মিনতি বলল: পুষি?

—না, তাঁকে আমার ভয় করবার কিছু নেই। আমি লিলির কথা বলছি।

—ও হরি! আর আমাকে দেখে বুঝি ভয় করে না?

—এতদিন না করলেও, এবার থেকে করবে। বিশু হেসে বলল: কাল এলে দেখবেন, দরজায় খিল এঁটে ঘুমোচ্ছি—

—তাতেও নিস্তার পাবেন না। মিনতি খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল: দেখবেন, সামান্য একটা কাঠের দরজা আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না।

বিশু এবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মিনতির তারল্যের কথা অবশ্য তার অজানা নয়। কিন্তু হঠাৎ পুষ্প যদি মিনতির খোঁজে এখানে এসে হাজির হয়? পুষ্প যে রকম আড়্‌বুঝো মেয়ে, সে নিশ্চয়ই বিশুকে ভুল বুঝবে।

বিশুকে নীরব দেখে মিনতিও হাসি থামাল। বলল: সত্যি কী ক'রে এত ঘুমোতে পারেন বলুন তো? এদিকে আপনার জন্যে আমি সেই সকাল থেকে ঘর-বার করছি· ·....

—তাই নাকি! কিন্তু, সেই যদি ঘুম ভাঙ্গাতে এলেন, একটু সকাল সকাল এলেন না কেন?

—কী ক'রে আসি বলুন। সলজ্জভাবে, একটু চাপা গলায় মিনতি বলল: ওঁরা যে তখনও ওঘরে ছিলেন।

—ওঃ, বিশু তাড়াতাড়ি বলল: কিন্তু ব্যাপার কী? এত তাড়া কিসের?

মিনতি বলল: বাবা বড় মুস্কিল বাধিয়েছেন। আমাকে বলছেন মিঃ সেনকে অনুরোধ করতে এখানে থাকবার জন্যে।

—সুকুমার এখনও যায়নি তাহলে?

—না। কিন্তু যাব-যাব করছে। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, ঝগড়া হ'লো লিলির সঙ্গে অথচ ও চলে যাচ্ছে যেন আমাদের ওপর রাগ ক'রে। অন্যায় নয়?

—সে তো বটেই! কথাটা কিন্তু বিশুর ভাল লাগল না। সুকুমারকে এখানে আটকে রাখবার জন্যে মিনতির আগ্রহটাও যেন বড্ড বেশী প্রকাশ হ'য়ে পড়ছে। রজত গত কাল শুধু বাপের মৎলবের কথাই

বলেছিল, মেয়ের সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করে নি। কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে পিতাপুত্রী উভয়েরই লক্ষ্য এক। সে গম্ভীরভাবে বলল: আপনি তাকে থাকবার জন্যে অনুরোধ করেছেন তো?

—ধ্যেৎ, আমার লজ্জা করে—

—কিন্তু, বিশুর মুখ এবার মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠল। বলল: এর সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ? আপনি হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গালেন কেন?

বিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে মিনতিও একটু ইতস্ততঃ করল। বলল: আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন না, থাকবার জন্যে—

—আমি আপনার জন্যে সুকুমারকে এখানে থাকতে বলবো?

—আহা তা কেন। মিনতি কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। বলল: ও হঠাৎ চলে গেলে কথা উঠবে তো! তাতে, নোংরা ব্যাপারটা আরও নোংরা হয়ে উঠবে! দুদিন পরে গেলে, কেউ কিছু সন্দেহ করবে না—

হঠাৎ একটা চাকর এসে ঘরে ঢুকল। বেচারা পাড়াগাঁয়ের লোক, আবছা অন্ধকারের মধ্যে বিশু ও মিনতিকে একলা দেখে সে এমন অভিভূত হয়ে পড়ল যে, বক্তব্য ভুলে গেল।

বিশু কঠিন স্বরে বলে উঠল: কী?

—কর্ত্তা আপনাকে ডাকছেন।—বলেই চাকরটা তাড়াতাড়ি প্রস্থান করল।

বিশুও তৎক্ষণাৎ মিনতিকে বলল: আচ্ছা, আপনি এখন আসুন—

মিনতি ভুল বুঝল। প্রস্থানোদ্যত হ'য়ে বলল: আমাকে একটা খবর দেবেন কিন্তু। আমি ঘাটে আছি……

কিছুক্ষণ পরে বিশু বৈঠকখানায় গিয়ে উপস্থিত হ'লো। ঘরে

সুকুমারও ছিল। মিঃ ঘোষাল একটা প্রকাণ্ড টেলিগ্রাম হাতে করে পায়চারী করছিলেন। বিশুকে দেখেই বললেন: তুমি তো তখন রজতের কাছে ছিলে। সে কখন ফিরবে বলতে পারো?

—আজই দুপুরে ফিরবে! বিশু একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলল: কী হয়েছে? ও টেলিগ্রাম কিসের?

—পড়ে দেখ না।

টেলিগ্রাম্ করেছেন মিঃ ঘোষ। সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে: তোমার পত্রে, লিলি পুষ্পের ওখানে আসার কথা শুনে আশ্চর্য্য যত না হয়েছি, দুঃখিত হয়েছি তার চাইতে বেশী। তুমি কালবিলম্ব না করে ওই বুদ্ধি-বিবেচনাহীন মেয়েদুটোকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবে। অন্যথা হলে চলবে না। এখানে গাড়ীর অভাবেও আমার অত্যন্ত অসুবিধে হচ্ছে। সুতরাং সেটা পাঠাতেও যেন ভুল না হয়।

—পড়লে? মিঃ ঘোষাল উত্তেজিতস্বরে বললেন: ঘোষটা চিরকালই পাগলা, কিন্তু এদানিং দেখছি একেবারে উন্মাদ হ'য়ে গেছে। মেয়েরা এতদিন খুলনায় ছিল, তাতে আপত্তি হ'লো না, আর যে মুহূর্ত্তে আমার এখানে এসেছে অমনি তাদের বুদ্ধি বিবেচনার কথা উঠল? টেলিগ্রাম্‌টা দেখলে, At once আর Immediately কথাটা বার সাতেক ব্যবহার করেছে।

—তা তো দেখলাম। বিশু একটু হেসে বলল: কিন্তু, আপনি কী স্থির করলেন?

—আমি তো বুঝতেই পারছি না কোন দিক সামলাবো। অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে, মিঃ ঘোষাল বললেন: এদিকে এই টেলিগ্রাম এসে

হাজির · তার ওপর রজত নেই যে একটা পরামর্শ দেয়। আমি আর পারি না।

বিশু চুপ ক'রে রইল। মিঃ ঘোষালের কাছে রজত ছাড়া অন্য পরামর্শদাতার যখন কোন মূল্য নেই তখন সে উপযাচক হয়ে নিশ্চয়ই কিছু বলবে না। কিন্তু টেলিগ্রামের মর্ম্মোদ্ধার করে সে এতটুকুও আশ্চর্য্য হয় নি। বরং কৌতুক বোধ করছিল। মিঃ ঘোষের উৎকণ্ঠিত হবার আসল কারণটা সে জানে। এ ব্যাপারটাও লিলির চিঠি আবিষ্কৃত হওয়ার অন্যতম ফল। লিলি পুষ্প যতদিন খুলনায় তাদের পিসির কাছে ছিল ততদিন মিঃ ঘোষের কোন উৎকণ্ঠা ছিল না। কারণ, সেখানে পিসি ছিলেন মেয়েদের অভিভাবিকা। কিন্তু গোকুলনগরের কর্ম্ম-বাড়িতে তো সে বালাই নেই। এখানে এসে, সুযোগ পেয়ে মেয়ে দুটো যদি স্বেচ্ছাচার আরম্ভ করে দেয়? লিলির চিঠি আবিষ্কৃত হওয়ার পরের দিনই যিনি পাত্রের সন্ধানে বাজারে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তাঁর মতো লোকের পক্ষে, এ হেন পরিস্থিতির কথা কল্পনা করে বিচলিত হ'য়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক।

—Morning shows the day—একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মিঃ ঘোষাল বললেন : আমি জানি দিনটা আজ খারাপ যাবে। দেখ না, ঘুম থেকে উঠেই খবর পেলাম চৌধুরী মশাই arrested হয়েছেন—

—চৌধুরী মশাই কে?

—পাশের গ্রামের জমিদার। অত্যন্ত ভাল লোক তিনি। অথচ তাঁরই সেরেস্তা থেকে নাকি আমাদের এষ্টেটের ছাপ-মারা খান কতক দশ টাকার নোট বেরিয়েছে।

—অর্থাৎ ? বিশু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল : এই খুনের সঙ্গে তাঁর......

—হ্যাঁ। যে সব টাকার তোড়া সেদিন সিন্দুক থেকে লুঠ্ হয়েছিল তারই একটাতে খানকতক ঘোষাল এষ্টেটের ছাপ-মারা দশটাকার নোট ছিল। এ নোটগুলো সেই গুলোই। কিন্তু চৌধুরী মশাইকে সন্দেহ করা...absurd। শুন্লুম ওঁদের এষ্টেটের উকীল বিভূতি মুখুজ্জে জামিনের দরখাস্ত করেছিল। কিন্তু না-মঞ্জুর হ'য়েছে।

শুনে বিশু একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এইটেই সেই রজতের ফেলা জাল নয় তো ? বিভূতি যখন ওঁদের এষ্টেটের উকীল তখন তার হাত দিয়ে দু'চারখানা খুচরো নোট সেরেস্তার তহবিলে চালান করে দেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়! কিন্তু রজতটা কী সর্ব্বনেশে লোক! এইভাবে নিরপরাধীদের অপরাধী প্রতিপন্ন করে, সে দেশোদ্ধারের অজুহাতে নিজে নিরাপদ হ'তে চায় ? আর তার প্রধান সহকারী হচ্ছে বিশু—মহাত্মাজীর ভূতপূর্ব্ব অনুগামী।

মিঃ ঘোষাল বললেন : খবরটা শুনে মনটা এমন খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল যে নিজেই বেরুচ্ছিলাম তাঁর সঙ্গে হাজতে দেখা করবার জন্যে। এমন সময় এল টেলিগ্রাম। আমার এখানে এসে লিলি পুষি অন্যায় করেছে ? What does he mean ? By Jove, উন্মাদটা বুঝতে পারলে না, একথা লিখে সে আমাকে অপমান করে ফেলেছে! উফ্...

বিশু একটু হেসে বলল : হয়তো তিনি অতখানি ভেবে টেলিগ্রাম করেন নি—

—হয়তো তাই। কিন্তু সে যখন টেলিগ্রাম করতে পেরেছে তখন ওদের আমি পাঠিয়ে দোবই। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, পাঠাই কার সঙ্গে ?

—কেন, ওদের ড্রাইভার ? রাজারাম তো খুব বিশ্বাসী লোক !

—সে ব্যাটা তো কাল থেকে জ্বরে কোঁ কোঁ করছে। আজ সকালেও তাকে দু'গ্রেণ কুইনিন্ দিয়েছি।

—আমি একটা প্রস্তাব করতে পারি। হঠাৎ সুকুমার বলে উঠল : আমাকে যদি একদিনের ছুটি দেন তাহলে আমি অফিসের কাজটাও সেরে আসতে পারি আর ওদের পৌঁছেও দিতে পারি……

—Oh no-no-no মিঃ ঘোষাল মাথা নেড়ে বললেন : তুমি একবার গেলে আর আসবে না।

—বিশ্বাস করুন। সত্যিই অফিসের একটা জরুরী payment আছে—

—কালই ফিরে আসবে তো ?

—কী আশ্চর্য্য। আমার গাড়ীতো এইখানেই থাকবে। আমাকে তো ওদের গাড়ী ড্রাইভ্ করে যেতে হবে—

—ঠিক্ আসবে তো ?

—Honour Bright।

—তাহলে সেই ব্যবস্থাই করো।

সুকুমার ব্যস্ত হ'য়ে প্রস্থান করল।

বিশু এতক্ষণ অবাক হয়ে সুকুমারের দিকে তাকিয়েছিল। সে চলে যেতেই বলল : শুনেছিলাম মিঃ সেন আজ সকালেই চলে যাবেন—

—আমাকেও তো তাই বলেছিল ও। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এসে আবার বললে : মিস্ ঘোষাল বড্ড অনুরোধ করছেন, তাই…আর, মিঃ ঘোষাল একটা হাসি চাপলেন।

—কিন্তু আমি ভাবছি, বিশু উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল : রজত তো আর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই এসে পড়বে,—তার সঙ্গে একটা পরামর্শ করে…

—এর আর পরামর্শ করার কী আছে। মিঃ ঘোষাল প্রস্থানোদ্যত হয়ে বললেন : ঘোষ যখন টেলিগ্রাম করতে পেরেছে তখন ও ঝঞ্ঝাট যত তাড়াতাড়ি মেটে .ততই ভাল। আচ্ছা, তুমি বসো। আমি দেখে আসি হবিষ্যিটা চড়ান হয়েছে কি না।

মিঃ ঘোষাল প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে বিশুও উঠে গেষ্ট-হাউসের দিকে চলল। সুকুমারের সঙ্গে এই মুহূর্ত্তেই তার একটা বোঝাপড়া করা দরকার। কী ভেবেছে সে! বিশু তার মৎলব বোঝে না? মিঃ ঘোষাল না হয় তার হেফাজতে লিলি পুষিকে একলা পাঠিয়ে দিয়ে ঝঞ্ঝাট্ মেটাতে চান! কিন্তু বিশু তো জানে সুকুমারকে। গতকাল লিলি তাকে জুতো-পেটা করেছিল। আজ সে সুযোগ্ পেয়ে, রক্ষকের ভূমিকা অভিনয় ক'রে যে ভক্ষক সাজবে না, তার নিশ্চয়তা কী?

হঠাৎ বিশু দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা অদ্ভুত মিষ্টি স্বর ভেসে এল তার কানে। কণ্ঠস্বর পুষ্পর!

অদূরেই ছিল ঘোষালদের খিড়কীর ঘাট্! ঘাটের চাতালের ওপর বসে পুষ্প একটা বছর দেড়েক্ বয়সের দামাল শিশুকে নিয়ে চট্‌কাচ্ছিল। ছেলেটা যেমন সুদর্শন তেমনি হৃষ্টপুষ্ট; সম্ভবতঃ ঘোষাল বাড়ীর কোন অভ্যাগতের সন্তান। পুষ্প তাকে চুমু খেয়ে খেয়ে অস্থির করে তুলেছিল।

পুষ্প ছোট ছেলে এত ভালবাসে! দৃশ্যটা বড় সুন্দর লাগল বিশুর। সে একটা রক্ত-করবী গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে ব্যাপারটা উপভোগ করতে লাগল।

পুষ্পর আদরে অস্থির হ'য়ে ছেলেটা হাত পা ছুঁড়ে, তার নিজস্ব দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কী সব বলতে আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে পুষ্প তাকে বুকে চেপে ধরল। তারপর—

ছেলেটাকে চাতালের ওপর বসিয়ে দিয়ে পুষ্প নিজে বসল তার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে। তারপর মৃদুস্বরে গান ধরল :

তোমার ভাষা,
বোঝার আশা,
দিয়েছি জলাঞ্জলি।

বিশ্বকবির কল্পনা যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে উঠল পুষ্পর কণ্ঠে। কিন্তু একি! বিশুর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। একি রূপ পুষ্পর! এ যে তার রমা-বৌদির কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে! বিস্মৃতির সাগর মন্থিত ক'রে উঁকি-ঝুঁকি মারছেন তার মা! বহু দিনকার ভুলে-যাওয়া সেই মুখ, সেই হাসি, স্নিগ্ধ কণ্ঠের সেই ডাক্ : বিশু, বাবা আমার, সাত-রাজার ধন মাণিক আমার! একি হ'লো! পুষ্পর এ রূপ কোথায় লুকোন ছিল এতদিন!

—এই পুষি! রাণার ওধার থেকে মিনতির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিমেষের হের-ফেরে বিশুর অবস্থাও হ'লো, কতকটা স্বর্গচ্যুত হতভাগ্যের মতো!

বিচিত্র মেয়ে এই মিনতি! সে সুকুমারকে একটা প্রথম শ্রেণীর লম্পট জেনেও ধরে রাখতে চায় আবার সুযোগ পেলে একলা গিয়ে বিশুরও ঘুম ভাঙ্গায়। সর্ব্বোপরি মেয়েটা মিথ্যেবাদী। সকাল বেলাকার কথাগুলো স্মরণ করে বিশুর মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল।

—বলি ও মশাই! কণ্ঠস্বর লিলির। সে মিনতির সঙ্গে ঘাটের রাণার ওপর বসে, গোটা কতক সঞ্চরণশীল পাতি হাঁসকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ছিল। বিশুকে গোঁ ভরে যেতে দেখে বলে উঠল: অত তাড়াতাড়ি যাওয়া হচ্ছে কোথায়! শুনুনই না—

বিশুকে থামতে হ'লো। তারপর পুষ্পর দিকে একটা কটাক্ষ হেনে সে বলল: এই যাচ্ছি…যাচ্ছি…ইয়ে…

—ইয়ের কথা পরে হবে। বিশুর কটাক্ষটা মিনতির দৃষ্টি এড়ায়নি। সে একটু মুচকে হেসে বলল: কিন্তু পুষুর সঙ্গে আপনার কী হয়েছে বলুন তো? ঝগড়া বুঝি?

—সেকি?

—কী তা আপনারাই জানেন! চোখ মট্‌কে মিনতি বলল: কাল থেকে তো দেখছি কথাবার্ত্তা একেবারে বন্ধ। হলো কী আপনাদের?

লিলি বলল: হুঁ:, ওটা যা গোমরা-মুখো, কে ওর সঙ্গে কথা কইবে?

—তুই থাম্! লিলিকে ধমক্ দিয়ে মিনতি আবার বলল: সত্যি, কী হয়েছে বলুন না! আমাকে বলতেও দোষ?

—এ সব কী হচ্ছে মিনু, ছি:…পুষ্প হঠাৎ বিরক্ত হয়ে মিনতিকে ধমক দিল। তারপর বিশুর উদ্দেশে সহজ গলায় বলল: আপনি যান তো। ওর পাগলামী শুন্‌বেন না—

পুষ্পর কণ্ঠস্বর শুনে বিশুর যেন সম্বিৎ ফিরে এল। সে তখন সোজা মিনতির দিকে তাকিয়ে বলল: আশ্চর্য্য! আপনি কাব্য-উপন্যাস লেখেন না কেন? এমন চমৎকার কল্পনা শক্তি আপনার—

বাকিটুকু বলা হলোনা। লিলি হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। পুষ্পও একটু হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল। হাসতে পারলনা শুধু মিনতি। তার মুখখানা তখন সিদুঁরের মতো টকটকে হয়ে উঠেছিল। লিলি পুষ্প সামনে, বিশুর কাছ থেকে এমন অভাবনীয়রূপে আঘাত পেয়ে চোখ দুটোও তার হয়ে উঠল অশ্রু-সজল। সে মিনিট খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেই, হঠাৎ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে চলে গেল।

—ওকি রে? লিলিও ব্যস্ত হয়ে মিনতির পেছনে গেল। বিশু আর পুষ্প সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল অবাক হয়ে।

কিছুক্ষণ পরে বিশুর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে পুষ্প বলল এ সব কী?

—আমি তো কই...কিছু বুঝতে পারছি না—

—জানি জানি, আমি সব জানতে পেরেছি। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, এমন করে আর ক'জনের সর্ব্বনাশ করেছেন? মিনতিকে নষ্ট করেছেন, আমাকেও নষ্ট করবার মৎলবে আছেন,—উঃ আপনি কী?

—তুমি এসব কী বলছো? আমি তো কই...

—থাক, যথেষ্ট হয়েছে! বলেই পুষ্প প্রস্থানোদ্যত হলো।

—দাঁড়াও। রূঢ়স্বরে বিশু বলল।

—কী? পুষ্পও সক্রোধে ফিরে দাঁড়াল।

—তুমি কি এখন থেকে এই লাইন ধরবে ঠিক্ করেছে?

—তার মানে? তীক্ষ্ণকণ্ঠে পুষ্প প্রশ্ন করল।

—তুমি মিনতির মতো একটা মেয়ের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে বদনাম রটাতে চাও? কিন্তু এ মিথ্যে রটানোর পরিণাম কী হবে তা জানো?

—মিথ্যে! পুষ্প সশ্লেষে বলে উঠল: কথাটা মিথ্যে বলেই বুঝি, যা কেউ জানতে পারলে না, তাই আপনি আগে থেকে জেনে বসে আছেন? লিলির চিঠির কথা আপনি কোত্থেকে শুনলেন, শুনি? বলেই, সে যেন ছিটকে চলে গেল।

যাকে বলে মোক্ষম জায়গায় ঘা-দেওয়া পুষ্প অনেকটা সেই রকমের একটা কাণ্ড করে প্রস্থান করল। কিন্তু কথাটা সত্য হলেও পুষ্পর সন্দেহটা যে একেবারেই মিথ্যে, এ সত্য বিশু প্রমাণ করবে কেমন করে। বিরূপ মন তার আরও বিরূপ হয়ে উঠল মিনতির ওপর। এ অঘটনের জন্য দায়ী তো ওই মেয়েটাই। ভাবতে ভাবতে বিতৃষ্ণাটা তার ক্রোধে পরিণত হলো। সে দ্রুত পদে অগ্রসর হ'লো গেষ্ট-হাউসের দিকে।

সুকুমার তখন নিজের ঘরে বসে যাত্রার আয়োজন করছিল। হঠাৎ দড়াম করে দরজা ঠেলে বিশু ঘরে ঢুকল।

—এর মানে? সুকুমার ভীষণভাবে চমকে উঠল। বস্তুতঃ বিশুর আবির্ভাবটা সত্যই অত্যন্ত আপত্তিকর, ভদ্রনীতি বিগর্হিত।

বিশু কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে গম্ভীরভাবে বলল: বলতে এলাম, লিলি পুষিকে কলকাতায় পৌছে দেবার মৎলব আপনাকে ছাড়তে হবে।

সুকুমার মিনিটখানেক ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। তারপর বলল: আপনার হুকুমে নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিশু সংযত স্বরেই বলল: কলকাতায় যেতে ইচ্ছে করেন, চলে যান। কিন্তু ওদের রক্ষক হবার মৎলব ছাড়ুন। নাহলে—

—নাহলে ?

—নাহলে, আপনাকে শাস্তি পেতে হ'বে।

—তাই নাকি। দাঁতে দাঁত চেপে সুকুমার বলল: শাস্তিটা সম্ভবতঃ আপনিই দেবেন!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আপনাকে এমনভাবে expose করবো, যে…সাবধান।—কথা বাড়াবার মতো মনের অবস্থা বিশুর তখন ছিলনা। সে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সুকুমার কয়েক মিনিট সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। বিশুকে বেশী কথা না বলে চলে যেতে দেখে তার একটা পুরোণ কথা নতুন করে মনে পড়ল,—যে কুকুর ডাকেনা, সে নির্ঘাৎ কামড়ায়। সুতরাং সে আস্তে আস্তে আবার বৈঠকখানায় গিয়ে মিঃ ঘোষালকে বল্ল: দেখুন, শরীরটা কেমন ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে। তাই ভাবছি……

মিঃ ঘোষাল দুঃখিত হ'লেন না। কিন্তু ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ এক গ্রেন কুইনিন আনিয়ে সুকুমারকে খেতে বাধ্য করলেন। তারপর বললেন: তোমার এখন কলকাতায় যাওয়া out of the question. কিন্তু ওদেরও তো তাড়াতাড়ি পাঠাতে হবে। কী করা যায়—

পুষ্পর সঙ্গে মিনতিও সেখানে ছিল। সে পিতাকে আশ্বস্ত ক'রে বলল: কেন এত ভাবছ? রজতদা তো আর একটু পরেই এসে পড়বে। তখন সব ব্যবস্থা ঠিক্ হ'য়ে যাবে'খন।

তাই হ'লো। রজত এসে সব শুনে ব্যবস্থা দিল: বিশুবাবু ওদের নিয়ে যাবেন।

—বিশু? মিঃ ঘোষাল আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন: সে মোটর ড্রাইভ করতে পারে নাকি?

—শুধু পারে নয়। রজত বলল: আমার চেয়েও বোধহয় ভাল পারে।

—তাই নাকি? জানতাম না তো। তা বেশ, তাহলে, বিশুই ওদের নিয়ে যাক্—

—কিন্তু,—রজত বলল: আজ আকাশের যা অবস্থা, তাতে risk করাটা উচিৎ হ'বে কী? তার চেয়ে বরং কাল সকালেই যাবে'খন!

—কিন্তু, বড় দেরি হ'য়ে যাবে যে। ঘোষ At once আর Immediately কথা দুটো কতবার লিখেছে, দেখেছো?

—দেখেছি। রজত একটু হেসে বলল: কিন্তু আপনারও তো একটা দায়িত্ব আছে।

—হুম্, তাহলে, কাল সকালেই যাবে।—বলে, মিঃ ঘোষাল বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলেন। সুকুমারও সঙ্গ নিল।

—দেখুন। আড়ালে এসে সুকুমার বলল: বিশুর সঙ্গে ওদের পাঠানোটা কি উচিৎ হবে? ও তো ঠিক্ আমাদের সমাজের লোক নয়। তার ওপর আবার young man—

—Young man তো তুমিও হে।—মিঃ ঘোষাল হেসে উঠলেন। বললেন: না হে না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। বিশু গরীব হ'তে পারে, কিন্তু অত্যন্ত সৎ চরিত্র। দেখনা, রজতের সঙ্গেই ওর বেশী ঘনিষ্টতা। রজতের মতো বিশুও যে অত্যন্ত চরিত্রবান্—

সুকুমার তখন মিঃ ঘোষালকে ছেড়ে আবার ছুটল বৈঠকখানার দিকে রজতের আশায়। লিলি পুষ্পর মতো দুটো মেয়েকে নিয়ে বিশু একলা যাবে কলকাতায়, এ চিন্তা তাকে যেন পাগল ক'রে তুলছিল। তার শেষ ভরসা রজত। রজত যদি নিজে ওদের নিয়ে যায় তবে চিন্তা করবার কিছু নেই। কিন্তু বিশু···অসহ্য!

কিন্তু—বৈঠকখানার দরজার কাছে এসে সে আবার থমকে দাঁড়াল। বিশুর বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাওয়ার ফলে রজতের বক্তব্যটা যে কী হ'বে সে কথা তো সে মিঃ ঘোষালের মন্তব্য থেকে পূর্ব্বেই জানতে পেরেছে। তবে আর চেষ্টা ক'রে লাভ কী?

অথচ চেষ্টা না করেই বা সে থাকে কী ক'রে? এ যে অসহ্য······

কিছুক্ষণ পরে একটা সুযোগ মিলল।

বৈকালিক জলযোগের বৈঠকে চারজনকে অনুপস্থিত দেখা গেল,— রমেশবাবু, শুভেন্দু, বিশু ও লিলি। এদের মধ্যে প্রথম দু'জনের অনুপস্থিতিটা কারুরই মনোযোগ আকর্ষণ করল না। কারণ, কাজের ধারা তাঁদের অনিয়মিত। প্রায়তঃই তাঁরা ঘরোয়া-বৈঠকে হাজিরা দিয়ে উঠতে পারতেন না। বিশু শুয়েছিল গেষ্ট-হাউসে, নিজের ঘরে। কিন্তু লিলি?

—সত্যিই তো, লিলি কোথায়?—মিনতি চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল: তাকে অনেকক্ষণ দেখিনি তো—

—দেখ দেখ, সে পাগলি আবার গেল কোথায়?

লিলিকে কিন্তু চট্ করে খুঁজে পাওয়া গেল না। বাড়ীতে সে ছিল না। বাগানের সর্ব্বত্র খুঁজেও পাওয়া গেল না তাকে। মিনতি উৎকন্ঠিত হয়ে উঠল।

—আচ্ছা, আয় তো দেখি ৷—লিলির গুটিকতক অদ্ভুত খেয়ালের সঙ্গে পুষ্পর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সে মিনতিকে নিয়ে আস্তাবলের দিকে অগ্রসর হ'লো।

সেখানে লিলিকে পাওয়া গেল। একটা এঁদো ঘরের মধ্যে পুষ্পদের বৃদ্ধ ড্রাইভার রাজারাম জ্বরের ঘোরে ছট্‌ফট্‌ করছিল। পাশে বসে লিলি জলপটি লাগচ্ছিল তার মাথায় আর ক্রমাগত ধমক্ দিয়ে দিয়ে তার ছট্‌ফটানি বন্ধ করবার চেষ্টা করছিল।

পুষ্প ডাকল: লিলি শোন—

—কী? লিলি খিঁচিয়ে উঠল। বলল: আমি এখন যাবনা, ভাগ্‌—

—শীগগির শুনে যা, ভীষণ কাণ্ড হয়েছে।

অগত্যা কোমরে কাপড় জড়াতে জড়াতে লিলি বৈঠকখানায় এসে ঢুকল। কিন্তু ভাল করে চা খাওয়া তার হলো না। কলকাতায় যাবার প্রস্তাব শুনেই সে সবেগে মাথা নেড়ে উঠে পড়ল।

—সেকি! মিঃ ঘোষাল সবিস্ময়ে বললেন: তোমার বাবা যে টেলিগ্রাম করেছেন।

—করুক্ গে। লিলি সাফ জবাব দিল: আমি আর কখ্‌খোন বাবার বাড়ীতে যাব না—

—ইস্ যাবেন না! পুষ্প চাপা গলায় ধমক দিল: তোর ঘাড়্‌ যাবে—

—জোর? লিলি প্রথমে চোখ দুটো কুঞ্চিত করল। তারপর

চিৎকার করে উঠল: আমায় জোর করে নিয়ে যাবি? তুই তো তুই, বাবার ক্ষমতা আছে আমার ওপর জোর করবার? জানিস্ আমার বয়স কত? কী করতে পারিস তোরা? আমি যাবনা... যাবনা...যাবনা।—বলেই, সে দম্‌কা হাওয়ার মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—ওর হলো কী।—ঘরের সকলেই বিমূঢ়ভাবে মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল।

লিলির ব্যাপার দেখে পুষ্পও ভীত হয়ে পড়েছিল। সেই চিঠি আবিষ্কারের দিন পিতার কাছে ভৎসিত হয়ে লিলি জোর করে চলে গিয়েছিল খুলনায়। অবশ্য, সেদিন তার রাগ করবার কারণ ছিল। আবাল্য অতিরিক্ত স্নেহের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে অকস্মাৎ পিতার কাছে ভৎসিত হলে ও-বয়সের কোন্ মেয়েরই বা রাগ না হয়! কিন্তু, লিলির মতো মেয়েও যে সেদিনকার সেই অভিমান আজও মনে পুষে রেখেছে, এ কথা কে ভাবতে পেরেছিল? বিশুর সঙ্গে কলকাতায় যাওয়ার কথা শুনে অবধি পুষ্পর মনে অশান্তির সীমা ছিল না; কিন্তু এবার সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল মিঃ ঘোষালের কথা ভেবে। ভদ্রলোক টেলিগ্রামটা পেয়ে যে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'য়েছেন সেটা আর গোপন নেই। সুতরাং লিলি পুষ্পকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যথাস্থানে পাঠিয়ে দিতে তিনি যে বদ্ধপরিকর, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু লিলির ওপর জোর করার ফলে, সে যদি ক্রোধের বশে সেদিনকার সেই অবাঞ্ছিত ঘটনাটা সবিস্তারে বল্‌তে আরম্ভ করে? তা হলে তো অনেক কিছু অপ্রকাশ্য ব্যাপারই প্রকাশিত হয়ে পড়বে!

—ও পাগলকে আর ক্ষেপিয়ে লাভ নেই কাকাবাবু। পুষ্প বলল : তার চেয়ে—

—কিন্তু, তোমার বাবা যখন টেলিগ্রাম করে এখানে থাকতে বারণ করেছে, তখন আমিই বা তোমাদের কী করে রাখি বল ?

—বেশ তো,—মুখ চোখ লাল ক'রে পুষ্প উঠে দাঁড়াল। বলল : ও আবার না হয় খুলনাতেই ফিরে যাবে।

—কিন্তু……

—আপনি ভাববেন না, বাবাকে আমি জানি। বলে, পুষ্প আর দাঁড়াল না, বাগানের দিকে চলে গেল।

মিঃ ঘোষাল আবার বললেন : কিন্তু……

—আপনি কেন এত ভাবছেন।—মিঃ ঘোষালের বাড়াবাড়ি দেখে রজতও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। বলল : পুষু একলা গেলেই যথেষ্ট হবে। বলে, সেও পুষ্পর অনুসরণ করল।

সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারও উঠল। পুষ্প বিশুর সঙ্গে কলকাতায় যাবে একলা ? সে আর সামলাতে না পেরে ছুটে গিয়ে রজতকে বলল : কাজটা কি উচিত হবে ?

রজত তীব্রদৃষ্টিতে সুকুমারের দিকে তাকাল। তারপর বলল : পুষু ছেলেমানুষ নয়। উচিত অনুচিত সম্বন্ধে সে তোমার চেয়েও ভাল বোঝে।

শুনে, সুকুমারের আশা ভরসা লোপ পাবার উপক্রম করল। কুণ্ঠিতভাবে বলল : তার চেয়ে তুই ওকে নিজে নিয়ে গেলে ভাল হতো না ?

—আমি মানুষ, মেসিন নই। আমি আজই কলকাতা থেকে ফিরেছি—

—কিন্তু, বলছিলুম কি,—একটা ঢোক গিলে সুকুমার আবার বলল : বিশুবাবুকে তো আমরা ঠিক...মানে...ভাল করে...

রজত দৃঢ়স্বরে বলল : আমি তাঁকে ভাল করেই জানি।

—ওঃ তবে আর ভয় কি—

—তুই কি এখন গেষ্ট-হাউসের দিকে যাচ্ছিস্? তাহলে, গিয়েই বিশুবাবুকে এখানে পাঠিয়ে দিবি। বল্‌বি, আমি ডাকছি।

সুকুমারকে বিদায় করে রজত পুষ্পর উদ্দেশ্যে বাগানের দিকে অগ্রসর হলো। মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল সে। অবশ্য এই কলকাতায় যাওয়ার ব্যাপারটা মধ্যে তার একটা মৎলব আছে। পুষ্প গৌণ। আসলে বিশুকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়াটাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু তার জন্যে এদের এত মাথাব্যথা কেন? পুষ্প কি পল্লীগ্রামের লজ্জাবতী লতা যে, তার একলা যাওয়ার মধ্যে নিরাপত্তার প্রশ্ন ওঠে।

কিন্তু, সুকুমারের মতো পুষ্পও যখন ওই একই অজুহাত তুলল তখন তার বিরক্তিটা ক্রোধের পরিবর্ত্তে বিস্ময়ে পরিণত হ'লো। সুকুমার না হয় নিজের রুচি-প্রবৃত্তির মাপকাঠিতে আর সকলকে বিচার ক'রে। কিন্তু এই মেয়ে জাতটা কী? এত বয়স হ'য়েছে, এত লেখাপড়া শিখেছ অথচ মানুষ চেনবার ক্ষমতা নেই এতটুকুও? নাহলে বিশুর মতো ছেলের চরিত্র সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগে এদের মনে?

পুষ্প বলল : তুমি কী? আমি কি তোমার খেলার পুতুল? সব জেনে শুনেও তুমি ওই লোকটার সঙ্গে আমাকে পাঠাতে চাও?

রজত সত্যিই ভড়কে গেল। জিজ্ঞাসা করল: তুমি কি বিশু-বাবুর কথা বলছো?

অত্যন্ত অসহায়ের মতো পুষ্প বলল: হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কী দেখেছ তুমি ওর মধ্যে? কেন তুমি ওকে অত বিশ্বাস করছো? ও যে তোমার কতবড় সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টা করছে, বুঝতে পারছো না? তার চেয়ে তুমি নিজে চল না।

রজত হাসল। তারপর স্নিগ্ধস্বরে বলল: আমি এখন যাই কী ক'রে বল? রমেশ চৌধুরী আর শুভেন্দু যতক্ষণ এখানে রয়েছে, ততক্ষণ আমার এক পা-ও কি নড়া চলে? বিশুর সঙ্গে না গেলে, তোমাকে হয় স্নকুমার না হয় আর কারুর সঙ্গে যেতে হ'বে। কিন্তু তাও তো তুমি পছন্দ করবে না।

—না। কিন্তু বিশু লোকটাকেও যে আমার ভাল লাগে না।

—ও কথা তো অনেকবার শুনেছি। রজত এবার একটু বিরক্ত হয়েই বলল: কিন্তু, কেন ওঁকে ভাল লাগে না, তার কোন কারণও তো তুমি আজ পর্য্যন্ত আমাকে দেখাতে পার নি। আমি তোমাকে আবার বলছি পুষু, বিশুবাবুকে তুমি চিন্‌তে শেখ,—শ্রদ্ধা করতে শেখ। একবার ভেবে দেখো তো, ভদ্রলোক সঙ্ঘের মেম্বর হয়েছেন আজ মাত্র সাত আট মাস, কিন্তু এই ক' মাসেই উনি যে কাজ দেখিয়েছেন, সঙ্ঘের অন্য কোন পুরোন মেম্বরের পক্ষে তো তা সম্ভব হয়নি। তুমি কোন-দিনই ওঁকে চেনবার চেষ্টা করেনি। কিন্তু, আমি প্রথম দিনই বুঝেছিলাম উনি কতবড় লোক—

—উঃ বড় লোক!—পুষ্প এতক্ষণ অসন্তুষ্ট মুখে রজতের বক্তৃতা

শুনছিল; কিন্তু আর সামলাতে পারল না। ফস্ করে বলে ফেলল: কী আমার বড়লোক রে—

—চুপ করো। রজত অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে বলল: আমি তোমার মতো অকৃতজ্ঞ নই। যিনি আজ আমাদের সঙ্ঘকে বড়লোক করেছেন—আমাদের হাতে প্রায় লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছেন আমি তাঁকে বড়লোক বলেই মনে করি। তোমারও মনে করা উচিৎ। সঙ্ঘের সভ্য যখন তুমি হয়েছ, তখন ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধের কথা তোমাকে একবারে ভুলে যেতে হবে। তুমি জাননা, কিন্তু আমি জানি, বিশুবাবু একটি সত্যিকারের বারুদের স্তূপ্। যেদিন উনি তোমার মনের আসল পরিচয় জানতে পারবেন, সেদিন দপ্ করে জ্বলে উঠবেন—

—তুমি থাম। পুষ্পও বিরক্ত হয়ে উঠল। বলল: ওকে আর অকারণ বাড়িয়ো না। বারুদের স্তূপ! ও যদি সত্যিই বারুদের স্তূপ হ'ত তাহলে সকলের আগে কাকে ধ্বংস করতো জান?—তোমাকে!

—দলপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বাঙ্গালীর চরিত্রে নতুন নয়। কিন্তু বিশুবাবুর দ্বারা এ কাজ কিছুতেই সম্ভব হবে না। কেন জান?—রজতের প্রতিবাদীকে যুক্তি দেখিয়ে স্বপক্ষে আনবার অধ্যবসায় ছিল অপরিসীম। সে অধৈর্য্য না হয়ে পুষ্পকে বোঝাবার চেষ্টা করল: তিনি দীর্ঘকাল কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন। তুমি জান, কংগ্রেস বলতে আসলে বোঝায় Half a dozen লোককে। High Command-এর এই ছ'জন Dictator-এর অনেক দোষ আছে। কিন্তু নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখতে গিয়ে তাঁরা পরোক্ষে যে একটা ভাল কাজও করে ফেলেছেন, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

—কী কাজ ?

—গদিতে সপ্রতিষ্ঠ থাকতে হলে, বুদ্ধিমান মাত্রেই যে কাজ করে থাকেন তাই। বক্তৃতা করে করে তাঁরা কংগ্রেস-ভক্তদের মনে গেঁথে দিয়েছেন : দেশকে স্বাধীন করতে হ'লে প্রথমেই প্রয়োজন কর্ম্মীদের নিয়মতান্ত্রিকতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা করা। ফলে, কর্ম্মীদের কাছে দেশের সত্যকার মঙ্গলটা গৌণ হয়ে গেল, মুখ্য হয়ে উঠল নির্ব্বিচারে নেতাদের কথায় পোঁ ধরাটা। আমাদের বিশুবাবুর অবস্থাটাও তাই। কংগ্রেস ছাড়লেও, নির্ব্বিবাদে দলপতির আদেশ পালন করার সংস্কার থেকে আজও তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। তাই বলছি, ভয় আমার বিশুবাবুকে নয়, তোমাকে—

—আমাকে ?

—হ্যাঁ। তোমার মনে রাখা উচিৎ, মানুষকে বিরক্ত করবার একটা সীমা আছে।

—তোমার বন্ধুপ্রীতি অপূর্ব্ব রজতদা! স্খলিতস্বরে এই কথা বলে পুষ্প প্রস্থানোদ্যত হ'লো। কিন্তু, অদূরে বিশুকে আসতে দেখে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

—ব্যাপার কী বিশুবাবু ? রজত সহাস্যমুখে বলল : অবেলায় ঘরের মধ্যে বসে ছিলেন কেন, শরীর খারাপ হয়নি তো ?

—না! পুষ্পর দিকে একটা কটাক্ষ ক'রে বিশু গম্ভীরভাবে বলল ; ব্যাপার কী ? ডাকছিলেন কেন ?

রজত কারণটা বলল।

—Sorry, মাফ করবেন! প্রস্তাব শুনেই বিশু মাথা নাড়ল।

—কেন? রজত ভ্রুকুঞ্চিত করল।

—কেন? বিশু আবার একবার আড়চোখে পুষ্পর দিকে চেয়ে নিল। তারপর ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল: বুঝতে পারছেন না? ওই unwilling horse নিয়ে আমি কি শেষে ফ্যাসাদে পড়ব মশাই!

কথাগুলো চাপাস্বরে বলা হ'লেও পুষ্পর কান এড়ায়নি। তার মুখ লাল হ'য়ে উঠল।

বিশুর কথার ভঙ্গিতে রজতও হেসে ফেলেছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলল: horse যে unwilling সে কথা কে বলেছে আপনাকে?

—বলবে আবার কে? বিশু তাচ্ছিল্যভরে বলল: আমি জানি।

—না আপনি জানেন না।

রজতের কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা হঠাৎ সচেতন ক'রে তুলল বিশুকে। সে এবার ভাল ক'রে তাকাল তার দিকে। রজতের মুখের ভাব অবিচলিতই ছিল; কিন্তু দৃষ্টির মধ্যে যেন প্রতিফলিত হচ্ছিল নিদারুণ ভর্ৎসনা: বার বার তিনবার! মূর্খ, আর ভুল করোনা! সাবধান—

—আচ্ছা! বিশু কুণ্ঠিতভাবে বলল: তাই হ'বে।

শেষ পর্য্যন্ত দলপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছাটাই জয়ী হ'লো। কিন্তু এই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে উপলক্ষ্য করেই সে রাত্রিতে মুক্তি-সঙ্ঘের তিনটি সভ্যের কেউই ঘুমোতে পারলনা। তিনজনের চিন্তাধারাই ছিল ত্রিমুখী। কিন্তু তার মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য ছিল। ব্যাপারটাকে একটা সামান্য ঘটনা বলে ওরা যতই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিল ততই একটা বড় রকমের কেন-র সমস্যা অশান্তির সৃষ্টি করছিল ঘুরে ফিরে।

বিশুর মতো ছেলের সঙ্গে পুষ্পর মতো মেয়ে যাবে কলকাতায়! এর মধ্যে কোন রকম কিন্তুর প্রশ্নই উঠতে পারেনা। কিন্তু কেন এই ধারাবাহিক বাধার উৎপত্তি? ভিত্তিহীন অশান্তির সৃষ্টি? অর্থহীন অনর্থের আশঙ্কা?

কেন?—সত্যই কি এটা একটা অমঙ্গলের পূর্ব্বাভাষ! সেই জন্যেই কি এই অতি সাধারণ ব্যাপারটাকে অসাধারণ ব'লে মনে হ'চ্ছে?

কিন্তু কেন?

ত্রিশ

যাত্রার ব্যবস্থা হ'য়েছিল খুব ভোরে।

পুষ্পকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে মিঃ ঘোষাল বললেন : আর মাস খানেক পরেই তো কাজ, তুমি যত তাড়াতাড়ি পার বাবাকে নিয়ে চলে এসো মা।—রাত্রিতে সুনিদ্রার ফলে, গত কল্যকার উত্তেজনাটা তাঁর ক্ষীণ হ'য়ে এসেছিল। তিনি সশব্দে হেসে উঠে আবার বললেন : তারপর তোমার বাবার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে।

পুষ্পকে বিদায় দিতে মিনতিও এসেছিল। কিন্তু বিশুর সঙ্গে চোখা-চোখি হ'য়ে যাওয়ার ভয়ে সে অন্যদিকে চেয়ে অন্যমনস্কের মতো দাঁড়িয়েছিল। তার ভাব দেখে মিঃ ঘোষাল আবার বললেন : শীগ্‌গীরই এসো মা। দেখছ তো, মিনু এর মধ্যেই কী রকম মন-মরা হ'য়ে পড়েছে।

পুষ্প সম্মতি জানিয়ে হাসিমুখে নমস্কার করল সকলকে। বিশুও বিদায় নিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল।

গোকুলনগর থেকে কলকাতায় আসতে হ'লে একমাত্র যশোর রোড ছাড়া অন্য কোন রাস্তা ছিল না। কিন্তু বিশু যশোর রোড পেছনে ফেলে নির্ব্বিকারভাবে গোবিন্দপুরের দিকে এগিয়ে চলল।

পুষ্প এতক্ষণ গম্ভীরমুখে রাস্তার দিকে চেয়েছিল। কিন্তু গাড়ী যশোর রোড্ অতিক্রম করতেই সে শঙ্কিত হ'য়ে উঠল। বলল: ওকি, রাস্তা ভুলে গেলেন নাকি?

বিশু গম্ভীরভাবেই উত্তর দিল: না।

সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনে পুষ্পর বুক এবার কেঁপে উঠল। একলা পেয়ে বিশু তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে! সভয়ে আবার সে প্রশ্ন করল: কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?

পুর্ব্বের মতোই জলদ-গম্ভীরস্বরে বিশু উত্তর দিল: গেলেই দেখতে পাবেন।

শুনে, পুষ্পর মুখ-চোখের অবস্থা আরও শোচনীয় হ'য়ে উঠল। সে আর কোন প্রশ্ন করতে ভরসা করল না।

কয়েক মিনিট্ পরেই গাড়ী এসে গোবিন্দপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের ধারে পৌছল। বিশু একটা নির্জ্জন জায়গায় গাড়ীটা রেখে নেমে পড়ল। পুষ্পকে বলল: আমি জানি, আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে হচ্ছে বলে আপনার মনে অস্বস্তির আর সীমা নেই! আর ঘণ্টাখানেক পরেই একটা ট্রেণ আছে। টিকিট্ কিনে দিচ্ছি, আপনি চলে যান। আমি গাড়ী নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, ঠিক সময় শেয়ালদা'য়ে হাজির থাকব।

বিশুর মৎলব শুনে পুষ্পর মুখ আরও শুখিয়ে গেল। এক সঙ্গে একই উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে হঠাৎ ভিন্ন ভিন্ন পথে যাওয়ার অর্থ অবশ্যই রজতের কাছে গোপন থাকবে না। কথাটা হয়তো সকলেই জানতে পারবে; তখন কী কৈফিয়ৎ দেবে সে? বিশেষতঃ রজতকে সে কী বলে বোঝাবে। পুষ্প বিমূঢ়ভাবে বিশুর দিকে তাকাল।

বিশু ইতিমধ্যেই ষ্টেশনের দিকে পা বাড়িয়েছিল। পুষ্প উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ডাকল: শুনুন্ শুনুন্, বিশুবাবু—

বিশু দাঁড়াল না। সোজা বুকিং অফিসের দিকে চলে গেল। কিন্তু টিকিট্ কেনা তার হ'লোনা। শুনল, টিকিট-ঘরের জানালা খোলা হয় ট্রেণ আসবার ঠিক্ বিশ মিনিট্ আগে। অগত্যা সে গিয়ে ঢুকল কেলনারের রিফ্রেস্‌মেণ্ট-রুমে। সেখানে একটা ছোটা হাজ্‌রীর অর্ডার দিয়ে ফিরে এল গাড়ীতে।

পুষ্প ঠিক তেমনি উৎকণ্ঠিত ভাবেই তাকিয়েছিল। বিশু নিজের আসনে এসে বসে বলল: ভয় নেই, টিকিট্ এনে দিচ্ছি। ট্রেণের এখনও অনেক দেরি।

পুষ্প একটু আশ্বস্ত হ'লো। কিন্তু ভাবতে লাগল কী ক'রে বিশুর মৎলব নষ্ট করা যায়। কিছুক্ষণ পরেই প্রকাণ্ড একটা ট্রে-র ওপর ছোটা-হাজ্‌রী সাজিয়ে কেলনারের একটা খিদ্‌মদ্‌গার এসে উপস্থিত হ'লো। বিশু সাগ্রহে ট্রে-টা নিজের কোলের ওপর নিয়ে তাকে বকশীষ দিয়ে বিদায় করল। তারপর একটা টোষ্ট নিয়ে তাড়াতাড়ি মুখে পুরতে গিয়েই—

তার নজর পড়ল পুষ্পর দিকে।

সকাল বেলায় উঠে সকলেরই খিদে পায়। বিশুরও পেয়েছিল। তাই সে প্রথম সুযোগেই চেষ্টা করেছিল ক্ষুধা নিবৃত্তি করবার। কিন্তু সংসারে বাস করতে হ'লে নিরঙ্কুশ আত্ম-চিন্তাটাই তো সব নয়। তাই পুষ্পর দিকে নজর পড়তে সে সত্যই অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ল। বলল: আপনার ধারণাই ঠিক্। আমি সত্যিই একটা ইতর লোক!

পুষ্প হাসল। এক অপূর্ব্ব ধরণের দ্বিধা-বিমিশ্রিত হাসি হেসে সে বলল : ওঃ! আপনি তখন যা ভয় দেখিয়েছিলেন। ভাবলাম, সত্যিই বুঝি টিকিট্ কিন্‌তে গেলেন······

—টিকিটের জন্যে ভাবনা নেই। ট্রেণের এখনও অনেক দেরি আছে······

পুষ্প আবার হাসল। বলল: ইস্, বাবুর রাগ দেখছি এখনও পড়েনি······

—না রাগ কিসের! বলেই, বিশু ট্রে-টা নিজের কোল থেকে তুলে পুষ্পর কোলের ওপর রেখে দিল।

—একি?

—দয়া ক'রে কিছু খেয়ে নিন, কলকাতায় পৌঁছতে অনেক বেলা হ'য়ে যাবে। সকাল থেকে তো পেটে কিছু পড়েনি।

পুষ্প অবাক হ'য়ে মিনিট্‌খানেক বিশুর দিকে চেয়ে রইল। তারপর ভ্রূভঙ্গি ক'রে বলল : এ সব গিন্নীপনা শেখালে কে? মিনু বুঝি?

—গিন্নীপনা আবার কিসের? কলকাতায় পৌঁছতে বেলা হ'য়ে যাবে, তাই বলা।—বলে, মুখ ঘুরিয়ে বিশু রাস্তার দিকে তাকাল।

পুষ্প আবার কিছুক্ষণ বিশুর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। তারপর বলল : বিশুবাবু, খেয়ে নিন্। আপনার সত্যিই খিদে পেয়েছে—

—খিদে সব মানুষেরই পায়। আমার জন্যে ভাবনা নেই। ওটা দয়া করে আপনি খেয়ে নিন্।

—কিন্তু, আমি তো এখন খেতে পারব না।

—ওঃ! বুঝতে পেরেছি। আমার মতো একটা লোকের পাশে বসে খেতে ঘেন্না হওয়াই স্বাভাবিক। বিশু তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে প্রস্থানোদ্যত হ'লো।

—আঃ! কী হচ্ছে। পুষ্প এবার ধমক দিল: শীগ্‌গীর উঠে বসুন—

—এখন আর বসে কী হবে? আপনাকে ট্রেণে তুলে দিয়ে তারপর···

বাধা দিয়ে পুষ্প বলল: আচ্ছা, কেন আমাকে এমন করে কষ্ট দিচ্ছেন বলুন তো। দোব এক্ষুনি সব রাস্তায় ফেলে। আঃ! উঠুন না গাড়ীতে শীগ্‌গীর—

বিশু একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর মুখ ভারি করে নিজের জায়গায় উঠে বসল। পুষ্প তখন ট্রে-টা তার কোলের ওপর রেখে দিতে দিতে বলল: এবার লক্ষ্মী-ছেলের মতো এগুলো খেয়ে নিন্ দেখি।

বিশু মাথা নেড়ে বলল: আমার জন্যে কারুর দরদ দেখাতে হবে না। ওগুলো আপনি খেয়ে নিন্।

একটু মুখ টিপে হেসে পুষ্প বলল: ওমা, আমি আবার আপনি হলাম কখন?

ষ্টেয়ারীং-এর ওপর একটা সজোর চপেটাঘাত করে উত্তেজিতস্বরে বিশু বলল: আপনি আমার কে যে তুমি বলে ডাকব! আপনার সঙ্গে আমার এমন কোন সম্পর্ক নেই, যাতে তুমি বলা যেতে পারে।—বলেই সে আবার রাস্তার দিকে মুখ ফেরাল।

মিনিট খানেক নীরবে কাটল। তারপর কী ভেবে পুষ্প বিশুর বাহুমূল ধরে নাড়া দিল।

বিশু ভ্রূকুঞ্চিত করে মুখ ফেরাল। তখন, চোখের ইঙ্গিতে ট্রে-টা দেখিয়ে দিয়ে পুষ্প বলল : ওগুলো কি আপনি নিজে খেতে পারবেন, না—একটা ঢোক্ গিলল পুষ্প। বলল : খাইয়ে দিতে হ'বে! খোকাবাবুর যে রকম অভিমান হ'য়েছে, তাতে তো…

—আচ্ছা, কী হ'চ্ছে বলতো?—বিশু রাগতে গিয়েও সামলে নিল। বলল : দেখছ না, আমি এখন সত্যিই ভীষণ রেগে রইছি……

পুষ্প তৎক্ষণাৎ বিশুর হাতে একখানা টোষ্ট ধরিয়ে দিল। বলল : সেই জন্যেই তো বলছি, তাড়াতাড়ি কিছু পেটে দিন্। সকলেই কি খিদে সহ্য করতে পারে?

—তার মানে?

পুষ্প জবাব দেবার পূর্ব্বেই একখানা আপ্-ট্রেণ হুড়্মুড়্ করে ষ্টেশনে এসে থামল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যাত্রীদের কোলাহলে স্থানটা সচকিত হয়ে উঠল। বিশুও অন্যমনস্ক হ'য়ে যাত্রীদের ওঠা-নামা দেখ্তে দেখ্তে টোষ্ট-এ কামড় দিল।

কয়েক মিনিট্ পরে ট্রেণটা আবার বিকট আওয়াজ করতে করতে চলে গেল। পুষ্প তখন বলল : ট্রেণ চলে গেল, আমি এখন যাব কী ক'রে?—বলেই সে হেসে ফেলল।

বিশু তখন তিনখানা টোষ্ট শেষ ক'রে চতুর্থখানাতে মনোযোগ দিয়েছিল, পুষ্পর কথা শুনে কট্মট্ ক'রে তার দিকে তাকাল।

পুষ্প তখন ভাল মানুষের মতো চায়ের কেট্লী থেকে পেয়ালাতে লিকার ঢাল্তে আরম্ভ করল। বলল : কী ভাগ্যি যে চা-টা এখনও গরম রয়েছে। চট্ করে খেয়ে নিন্ দেখি!

—সেকি! বিশু আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: আমি কি চা খাই? ওরা ওদের নিয়মমত কোর্স সাজিয়ে দিয়েছে, তা বলে, আমি খেতে যাব কেন?

মুখ নীচু ক'রে পেয়ালার মধ্যে চামচ নাড়তে নাড়তে পুষ্প বলল: আহা, কেউ তো আর দেখতে আসছে না! জানব তো শুধু আমি আর আপনি—

—আরে না না। বিশু ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল।

—না না কেন? বাধা দিয়ে পুষ্প বলল: সেদিন মিনুর কথায় খেতে পেরেছিলেন, আর আমার বেলাতেই বুঝি যত দোষ!

অবাক কাণ্ড! সেদিনের ঘটনাটা পুষ্প জানল কেমন করে? পরক্ষণেই কথাটা যে নিতান্তই পুষ্পর অনুমান বুঝতে পেরে বিশু ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠল। বলল: দেখ, তোমাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আমার কাছে ও সব নাম করোনা! কে মিনতি? আমি তাকে চিনি না.......

পেয়ালাটা বিশুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে পুষ্প বলল: প্রকাশ্যে অবশ্য না চেনাই ভাল, তাতে গোপন মাধুর্য্য নষ্ট হ'য়ে যায়!

বিশু এবার হাল্ ছেড়ে দিল। বলল: ছিঃ! ছিঃ! এ সব কী বলছ তুমি? মিনতি ভদ্রমহিলা, তোমার বন্ধু,—তাকে নিয়ে এ রকম খারাপ রসিকতা করা তোমার সাজে না।

—চা-টা খেয়ে নিন্। ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে!

—খাচ্ছি। কিন্তু, কাল তোমার কথা শুনে সত্যিই বড় কষ্ট হয়েছিল। মিনতি যে কেন আমার সামান্য রহস্যটা সহ্য করতে

পারল না, তাও বুঝলাম না। আর, তুমিও যে অমন মিথ্যে একটা সন্দেহের বশীভূত হ'য়ে কেন আমাকে অপমান করলে, তাও বুঝলাম্ না। সত্যি, তোমাদের, মানে, মেয়েদের চিন্‌তে হ'লে অনেক কাঠ-খড়্ পোড়ান দরকার।

পুষ্প রাস্তার দিকে চেয়েছিল। সেইদিকে চেয়েই বলল : কিন্তু, আমার সন্দেহ তো মিথ্যে নয়।

—তার মানে, তুমি বলতে চাও, মিনতি আমাকে ইয়ে করে ?

—হ্যাঁ।

—বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। আমি সুকুমারের মতো বড়-লোকও নই, রজতবাবুর মতো মহাপুরুষও নই। আমার মতো একটা হতভাগাকে সে ভালবাসতে যাবে কী দুঃখে ?

পুষ্প মৃদুস্বরে বলল : মেয়েরা যদি বিচার ক'রে ভালবাসতে পারত, তাহলে এত দুঃখ পেতে হ'তো না তাদের। মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নেই।

চায়ের পেয়ালাটা ঠক্ ক'রে ট্রের ওপর রেখে বিশু উত্তেজিত হয়ে বলল : না, নিজেদের সম্বন্ধেই তোমাদের কোন ধারণা নেই। মিনতি জানে, আমি তোমাকে...মানে...ইয়ে করি! তুমি কি বল্‌তে চাও, সব জেনে-শুনেও সে আমাকে ভালবাসবে ? এ দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে গাড়োল্ বরং আমরা, মানে পুরুষরা! আমি জানি তুমি আমাকে পছন্দ করোনা, আর একজনকে ভাল্‌বাস ; কিন্তু মজা হ'চ্ছে এই যে, তবুও আশা ছাড়তে পারি না।

পুষ্প একটু হেসে মুখ ফেরাল। বলল : আলোচনাটা বড্ড ব্যক্তিগত

হ'য়ে পড়ছে না? আর, ওগুলো কতক্ষণ কোলে করে বসে থাকবেন, বয়টাকে ডাকুন না।

বিশু হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে পড়ল। বলল: ইস্, দেখেছ, নিজের পেট্‌ ভরে গেছে বলে, তোমার কথা আর মনেই নেই......

—ওটা বোধহয় ভালবাসার একটা লক্ষণ—বলে ফেলেই দারুণ লজ্জায় পুষ্প মুখ ফিরিয়ে নিল।

—কী বললে? বিশু যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

—কিছু না, বয়টাকে ডাকুন।

বিশুর এবার একটু সাহস বাড়ল। অত্যন্ত পুলকিত হ'য়ে বার কতক হর্ণটা বাজিয়ে সে হঠাৎ পুষ্পর হাতদুটো মুঠো ক'রে ধরল। বলল: কী বললে, বলবে না!

পুষ্প আর বিশুর দিকে চাইতে পারল না। আরক্ত মুখে হাতদুটো মুক্ত করে নিতে নিতে চাপা গলায় বলল: কী করছেন! আঃ, কেউ দেখতে পাবে যে......

বিশু হাত ছেড়ে দিয়ে স্থির হ'য়ে বসল। পরমুহূর্ত্তেই পূর্ব্বদৃষ্ট খিদ্‌মদ্‌গারটি এসে তার কোলের ওপর থেকে ট্রে-টা তুলে নিল।

—আউর একঠো ছোটা-হাজ্‌রী ল্যাও,—ট্রের ওপর ঝনাৎ করে একটা টাকা ফেলে দিয়ে বিশু বলল: জল্‌দি ল্যাও......

—আচ্ছা, কী পাগলামী হ'চ্ছে বলুন তো? পুষ্প ব্যস্ত হ'য়ে বলল: স্নান না করে কোনদিন কিছু খেতে দেখেছেন আমায়? এই তুম্ যাও, কুচ্ ল্যানে নেহি হোগা......

খিদ্‌মদ্‌গার সেলাম করে চলে গেল।

—এ তোমাদের অত্যন্ত অন্যায়। এদিকে তো এত লেখাপড়া শিখেছ, অথচ কুসংস্কারগুলো তো ছাড়তে পারলে না?

বিশুর রাগ দেখে পুষ্প হাসল। তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল: সত্যি বলছি, ঘুম থেকে উঠেই স্নান করা আমার চিরকালের অভ্যাস! স্নান না ক'রে কিছু খেলে, সত্যিই আমার কি রকম গা ঘিন্ ঘিন্ করে।

বিশু আরও উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। বলল: গা ঘিন্ ঘিন্ করে? কিছু খেলে? তার চেয়ে বল না কেন, আমার পাশে বসে খেতে হ'বে বলেই গা ঘিন্ ঘিন্ করছে।

পুষ্প এবার অসহায়ের মতো বিশুর একটা হাত ধরল। পরক্ষণেই আবার ছেড়ে দিয়ে বলল: আপনি সত্যিই বড় ছেলেমানুষ! এত অভিমানী আপনি, অথচ আপনিই সেদিন নিজের হাতে দুটো খুন করেছেন? সত্যি, আপনাকে যত দেখছি, ততই অবাক হ'য়ে যাচ্ছি—

বিশু পুষ্পর কথা শুনছিল কি না সন্দেহ। চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সে বলল: বেশ, চল আমরা ডাক্-বাংলোয় যাই! সেখানে গিয়ে স্নানাহার ক'রে, সমস্ত দুপুরটা দুজনে আমরা একলা থাকব। তারপর চারটে নাগাৎ বেরিয়ে পড়লে, সন্ধ্যের সময় বাড়ী পৌঁছে যাব।

পুষ্প অবাক হয়ে বিশুর দিকে তাকাল। বলল: সেকি! মিনুরা যদি জান্‌তে পারে? তাছাড়া বাবাকে গিয়ে কী বলবো?

—বাঃ, বাবা জানবে কী করে? আমরা বলবো বিকেল বেলাতেই রওনা হয়েছি……

শঙ্কিত মুখে পুষ্প আবার বলল: সে কী ক'রে হয়! না না লক্ষ্মীটি……

—ওরে বাবা হয় হয়! গাড়ীতে ষ্টার্ট্ দিতে দিতে বিশু বলল: একবার পেয়েছি যখন, আর তোমায় ছাড়ি—

গাড়ী গোবিন্দপুর ডাক্-বাংলোর দিকে ছুটে চলল।

একত্রিশ

রাত্রি প্রায় ন'টার সময় পুষ্পরা বাড়ী পৌছল। মিঃ ঘোষ বাইরের ঘরেই ছিলেন, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললেন: ব্যাপার কী তোমাদের? ওখান থেকে বেরিয়েছ সকালে, আর এখানে এসে পৌছলে রাত্তিরে?

পুষ্পর মুখ শুকিয়ে গেল। সে সভয়ে বিশুর দিকে তাকাল।

বিশু কিন্তু বেশ সপ্রতিভভাবেই জিজ্ঞাসা করল: আমরা যে সকালে বেরিয়েছিলাম, জানলেন কী করে?

—আমি যে প্রি-পেড্ টেলিগ্রাম করেছিলাম। কাল রাত্তিরে ঘোষালের উত্তর পেলাম—Starting at dawn, অথচ আজ বেলা দশটার মধ্যেও তোমরা এসে পৌছলে না। তখন আবার আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করলাম। ফলে, শুভেন্দু ছুটে এল—

—শুভেন্দু? এখানে এসেছিল?

—হ্যাঁ। এই মাত্তর তো বাড়ী চলে গেল। তার মুখ থেকেই তো সব শুনলাম। তোমরা ছিলে কোথায় এতক্ষণ?

একটু হাস্‌বার চেষ্টা ক'রে বিশু বলল: সে দুঃখের কথা আর বলেন কেন! গোবিন্দপুর থেকে প্রায় মাইল দশেক আস্‌বার পর হঠাৎ

গাড়ী অচল হ'লো। নেমে দেখি একটা পিষ্টন ভেঙ্গে গেছে। কী করি, ফাঁকা মাঠের মাঝখানে হা-পিত্তেশ করে বসে না থেকে, তিন চার মাইল হেঁটে গিয়ে, একটা গ্রাম থেকে জন আষ্টেক লোক জোগাড় ক'রে আনলাম। তারপর তাদের দিয়ে গাড়ী ঠেলিয়ে আবার ফিরে গেলাম গোবিন্দপুরে। তারপর সেখানকার কারখানা থেকে গাড়ী সারিয়ে যখন বেরুলাম, বেলা তখন গড়িয়ে গেছে—

কৈফিয়ৎ শুনে মিঃ ঘোষ সন্তুষ্ট হ'লেন বলে মনে হ'লো না। অপ্রসন্ন মুখে বললেন: সেই যদি গোবিন্দপুরেই গেলে, কারখানায় গাড়ী রেখে আবার ঘোষালদের ওখানেই গেলে না কেন?

—আমি তো বলেছিলাম,—পুষ্পর দিকে একটা কটাক্ষ ক'রে বিশু বলল: কিন্তু, আপনার মেয়ে রাজি হ'লেন না যে! বললেন, বাবা অসন্তুষ্ট হবেন—

—কী বুদ্ধি তোমাদের! মিঃ ঘোষ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন: শুভেন্দুও বললে, আমার টেলিগ্রাম পেয়ে ঘোষাল নাকি ভয়ানক চটে গেছে! আমার নাকি ইচ্ছে নয়, মেয়েরা ওর কাছে থাকে। কিন্তু একেবারেই তা নয়। আমার এখানে একলা থাকতে কষ্ট হচ্ছিল বলেই টেলিগ্রাম করেছিলাম। আর ও কিনা ভাবলে... ইস্, এই বুদ্ধি নিয়ে ও ব্যারিষ্টারী করে! যাক্‌গে, তুমি তো এখন হোষ্টেলেই ফিরবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! বিশু অগত্যা প্রস্থান করল। কিন্তু মিঃ ঘোষের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলো সে। সে যে এত কষ্ট করে পুষ্পকে পৌঁছে দিল, তার জন্যে ধন্যবাদ দেওয়া তো দূরের কথা, উল্টে ভদ্রলোক

তার ওপর অসন্তুষ্ট হ'লেন। ভদ্রতার খাতিরেও একবার জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না, তার খাওয়া হয়েছে কিনা! এত রাগের কারণ,—পুষ্প তার সঙ্গে একলা এসেছে। কিন্তু কই, লিলির কথা তো ভদ্রলোক ভুলেও একবার জিজ্ঞাসা করলেন না! এর কারণ কী? উফ্, লোকটা এদিকে পাগল সেজে বেড়ায়, কিন্তু কী ভীষণ সন্দিগ্ধ-মনা!

সমস্ত রাত বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করল সে।

কিন্তু সকালে উঠে, পিতার অভদ্রতার কথা আর তার মনে রইল না;—কন্যার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে সে উন্মুখ হয়ে উঠল—

একদিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে, সে যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। কিন্তু মনোস্কামনা তার পূর্ণ হয় নি। যে পাওয়ার মধ্যে নিবিড়তা নেই, নারীর ধরা দেওয়াটা সেখানে কেবলমাত্র পুরুষের করুণা-ভিক্ষা ও ক্ষণিক সুযোগ-সুবিধা খোঁজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেখানে আকাঙ্খা তো মেটেই না বরং আরও বেড়ে যায়! বিশু বোঝে সবই, তবুও আশা ছাড়তে পারে না। গোবিন্দপুরের ডাক্-বাংলোর স্মৃতিটা জ্বল্ জ্বল্ ক'রে ওঠে তার মনের মধ্যে। সেদিন পুষ্প ধরা দিয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার জন্য তাকে সে একান্তভাবেই পেয়েছিল। সেদিন তার ধারণা হয়েছিল, ভালবাসার একাগ্রতা বুঝি নারী মাত্রকেই আপন করার! কিন্তু কল্পনা বিলাস তার সময়ের গতির সঙ্গে তাল রেখে চলল না।

অশিক্ষিতা-কুশিক্ষিতাদের মনের কথা উপলব্ধি করবার মতো সুযোগ তার কখনও হয় নি। কিন্তু সে শুনেছে, তারা আত্মনিবেদনের প্রতিদান দেয় আত্মবিস্মৃত হয়েই। অনেকে সাময়িক উন্মত্ততাকে

অকৃত্রিম মনে ক'রে ভুলও করে। তখন নিজেদের বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখবার জন্যে দুঃসাহসেরও অন্ত থাকে না তাদের। প্রেমাস্পদের জন্যে তারা নিঃশঙ্কচিত্তে কুলত্যাগ পর্য্যন্ত করে। কিন্তু বিশুর সমস্যা তো তা নয়।

ভুল মানুষ মাত্রেই ক'রে। তারপর ভুল ভাঙ্গলে জ্বলে-পুড়েও মরে স্মৃতির দংশনে। তবুও তাদের সান্ত্বনা থাকে,—বিগত দিনের স্মৃতি এবং তার তীব্র দংশন শেষ পর্য্যন্ত নিবৃত্তিতেই গিয়ে শেষ হয়। কিন্তু বিশুর জীবনে সে সান্ত্বনা কই? পুষ্প তাকে ধরা দিতে চায় না। কিন্তু বিদায়ও তো দেয় না। প্রতিদিন সে তাকে হাসি মুখেই অভ্যর্থনা ক'রে। কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। নিজের চারপাশে একটা দুর্ব্বোধ্য কাল্‌চারের গণ্ডী টেনে রেখে সে নিজেকে এমনই দুর্লভ ক'রে তোলে যে বিশুর অশান্তির আর সীমা থাকে না। শুধু কথা আর বড় বড় আলোচনা! এ নিয়ে বিশু কী করবে! দেহকে বঞ্চিত ক'রে শুধু মনের খোরাক নিয়েই যদি মানুষ বেঁচে থাকতে পারত, তাহলে সৃষ্টি-রহস্যের রথচক্র তো সেই উপনিষদের যুগেই থেমে যেত! কিন্তু মুস্কিল হ'চ্ছে এই যে, যে-মেয়ে ধরা দিতে চায় না অথচ জোর ক'রে ধরলে,—আঃ কী হচ্ছে বা কেউ দেখে ফেলবে,—এই অজুহাতে ছট্‌ফট্ করে প্রকারান্তরে লোভই জাগিয়ে তোলে, তাকে নিয়ে বিশু কী করবে। সে তো সুযোগবাদী ভদ্রলোক নয় যে, ওইটুকু পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে।

একলা থাকলে বিশু ভাববার চেষ্টা করে: এ কী করছে সে! যে ধরা দিতে চায় না, তাকেই আপন করবার বৃথা চেষ্টায় সে একে একে সব দিক দিয়েই দেউলে হ'য়ে পড়ছে। দেশোদ্ধারের

সমস্যা তো দূরের কথা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তা করবার অবসরও আজ তার নেই। সে জানে গোবিন্দপুরে বসে রজত তারই রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করছে আকুল আগ্রহে। তার এই রিপোর্টের ওপরেই নির্ভর করছে মুক্তি-সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সে সঙ্ঘের একজন সভ্যর সঙ্গেও দেখা ক'রে উঠতে পারেনি। সে জানে, শুভেন্দু কেন তার পিছন পিছন ছুটে এসেছে কলকাতায়। অথচ এতটুকুও সাবধানতা অবলম্বন করবার মতো ধৈর্য্য আজ তার নেই। এখন তার সমস্ত চিন্তাশক্তি পুষ্পর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই নিয়োজিত, অবসর কোথায়!

নির্জ্জনে বসে সে প্রতিবিধানের পথ খোঁজে। কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। আন্তরিকতার অভাবে বেশীদূর অগ্রসর হ'তে সে পারে না। পাঁড় নেশা-খোর যেমন প্রতিদিন নেশা করবার পূর্ব্বে, মুহূর্ত্তের জন্যেও একবার ক'রে অনুতাপ ক'রে নিজের দুর্ব্বলতার জন্যে, বিশুর অবস্থাও তদ্রূপ। নিজের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু লোভও সামলাতে পারে না। বাধা যত প্রবল হয়, গোবিন্দপুর ডাক্-বাংলোর স্মৃতিটা তাকে ততই উন্মত্ত ক'রে তোলে। তখন সে সহজ মানুষের মতোই উপলব্ধি করতে পারে এই আকর্ষণের তাৎপর্য্য,—অনুভব করতে পারে তার স্নায়ুমণ্ডলীর তীব্র কণ্ডুয়ন। কিন্তু নেশাচ্ছন্ন আশা-মুগ্ধ মন তার স্বেচ্ছায় বিরত হয় এই ক্রম-বর্দ্ধমান ব্যাধির প্রতিষেধক খুঁজতে। দিন পনের পরে ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা একেবারে চরমে দাঁড়িয়ে গেল।

প্রতিদিনকার মতো সেদিন সকালেও সে পুষ্পর কাছে গিয়েছিল। গিয়ে দেখল, ড্রইংরুমে বসে শুভেন্দু পিতাপুত্রীর সঙ্গে গল্প করছে।

—আসুন। শুভেন্দু সহাস্যমুখে বলল : সেদিন নাকি ভয়ানক বিপদে পড়েছিলেন ?

বিশুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে কোন রকমে বলল : হ্যাঁ। আপনি হঠাৎ—

—এই এলাম একবার—

—তোমার চাকুরী-বাকুরী কিছু হ'লো ?—বিশুকে দেখেই মিঃ ঘোষ গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করেছিলেন। বললেন :—না, কেবল আড্ডাই মেরে যাচ্ছ ?

মিঃ ঘোষকে দেখে বিশুও প্রমাদ গণেছিল। মুখে না বললেও, মিঃ ঘোষ তাকে আভাষে ইঙ্গিতে অনেকবারই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তার এ বাড়ীতে আসা-যাওয়া করাটা তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। অপর পক্ষে তিনি যদি সব সময় নিজেকে দোতলার লাইব্রেরী ঘরে আবদ্ধ ক'রে না রাখতেন, তাহলে বিশুর পক্ষেও প্রতিদিন এ বাড়ীতে ঢোকা সম্ভব হ'তো কি না সন্দেহ। অস্বস্তিকর হ'লেও, লুকোচুরীটা এতদিন সে চালিয়ে এসেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা শুভেন্দুর কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়বার লক্ষণ দেখেই সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। মুখভারি করে সংক্ষেপে সে বলল : ব্যস্ত হ'বেন না, সে সব হ'চ্ছে—

—হুম্। মিঃ ঘোষ নিজের ইচ্ছাটা আরো স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই যেন তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলেন।

—তারপর!—মিঃ ঘোষ চলে যেতেই শুভেন্দু সস্মিতমুখে বার কয়েক পুষ্প ও বিশুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল : সেদিনটা ডাক্-বাংলোয় কাটল কেমন ?

শুনে, পুষ্পর মুখ সাদা হ'য়ে গেল। বিশুও বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইল শুভেন্দুর দিকে।

—বড্ড আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন, না? আমি কিন্তু সব জানি।

—সে তো বুঝতেই পারছি! একটু হাসবার চেষ্টা করে বিশু বলল: কিন্তু জানলেন কী করে? ডাকাতী কেসের তদারক করতে গিয়ে শেষে আমাদের পেছনেই গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করে দিলেন নাকি?

বিশুর কথা শুনে শুভেন্দুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সে উত্তর না দিয়ে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

এবার বিশু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। বলল: কী ব্যাপার শুভেন্দুবাবু, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—

—আপনি যেন বড্ড বেশী ভয় পাচ্ছেন বিশুবাবু। শুভেন্দু মুচ্‌কে হেসে বলল: ঘাবড়াচ্ছেন কেন? সেদিন আপনাদেরকে অনেকক্ষণ ধরে ষ্টেশনের ধারে বসে থাকতে দেখে আমাদের Informer-এর সন্দেহ হয়। তাই সে আপনাদের ওপর একটু নজর রেখেছিল।

—ওঃ তাই বলুন। বিশু যেন একটু ভরসা পেল। বলল: আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি ওদিকে কিছু সুবিধে করতে না পেরে শেষে, বন্ধু-বান্ধবদের পেচনে গোয়েন্দাগিরি করেই চাক্‌রী বজায় রাখবার চেষ্টা করছেন।

শুভেন্দু পূর্ব্বের মতোই হাসিমুখে বলল: ও বদ্‌নাম পুলিশের আছে কি না জানি না, তবে অনবরত culprit ঘেঁটে বেড়ানোর জন্তে আমরা যে একটু সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ি, এ কথা সত্যি। এই দেখুন না, সেদিন

আমাদের Informer-এর Informationটা যাচাই করবার জন্যে যখন নিজে ডাক-বাংলোয় গিয়ে উপস্থিত হলাম, তখন সেখানকার খিদ্‌মদ্‌গারটার কাছ থেকে এমন একটা কথা শুনলাম্‌, যাতে মনটা সত্যিই সন্দিগ্ধ হ'য়ে ওঠে। শুন্‌লাম সেদিন ছাড়াও আর একদিন আপনারা ওখানে বসে প্রেমালাপ করেছিলেন—

—প্রেমালাপ করেছিলাম?

—আহা চট্‌ছেন কেন? ওটা খিদ্‌মদ্‌গার ব্যাটার বেয়াদপি! আপনি যে অত্যন্ত সরল মনেই পুষ্প দেবীকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, ব্যাটা সেটা বুঝতে পারেনি! তার ধারণা, ওটা প্রেমালাপেরই অঙ্গ…

—মিঃ রায়! অবনতমুখী পুষ্পর দিকে একবার চেয়ে নিয়েই বিশু সক্রোধে বলল: আপনার জানা উচিত, পরের বাড়ীতে ঢুকে পরকে অপমান করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়।

শুভেন্দু এবার হেসে ফেলল। বলল: আপনার বুদ্ধি-শুদ্ধি বড্ড কাঁচা বিশুবাবু! নাহলে, বুঝতেন, বিপদ ঘনিয়ে আসছে,—আমার নয়, আপনারই—

যেন জোঁকের মুখে নুন্‌ পড়ল। সভয়ে একটা ঢোক গিলে বিশু বলল: বিপদ—

—হ্যাঁ। সেদিন ছাড়াও আপনারা আর একদিন ডাক্‌-বাংলোয় ছিলেন। কিন্তু সে দিনটা কবে জানেন? গোকুলনগরে যেদিন ডাকাতি হয় ঠিক তার পরের দিন। অথচ, সেইদিনই বিকেল বেলায় ষ্টেশনে যখন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হ'লো, তখন আপনি বলেছিলেন যে আপনিও সেই ট্রেণেই কলকাতা থেকে আসছেন—

—মিঃ রায়, please, ওর কথায় কিছু মনে করবেন না—পুষ্প এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, কিন্তু আর প্যারল না। বিশুর কণ্ঠস্বরে আতঙ্কের আভাস পেয়েই সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল—বিশুর জন্যে নয়, সঙ্ঘের জন্য। বিশুকে সে যতটুকু বুঝেছিল, তাতে তার ধারণা হয়েছিল : লোকটা আসলে অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির। এবং এই দুর্ব্বলতাটাকে গোপন করবার জন্যেই সে সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি করে। বর্ণচোরা আমের মতো স্নায়ুযন্ত্র যাদের ঘুণ-ধরা, তাদের সাহসও যেমন আতিশয্য-পুষ্ট, ভয়ও তেমনি অতি-দোষ-দুষ্ট। তাই সে শুভেন্দুকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তাড়াতাড়ি বলল : আপনি যা শুনেছেন, সবই সত্যি—

শুভেন্দু ও বিশু দুজনেই অবাক হয়ে গেল।

—আপনি বিশ্বাস করুন,—স্খলিত স্বরে পুষ্প আবার বলল : সেদিন যে আমরা গোবিন্দপুর ডাক্-বাংলোয় গিয়ে পড়েছিলাম, সেটা নিতান্তই একটা accident—

—কী রকম?

—আমরা পূর্ব্বে থেকেই ঠিক্ ক'রে রেখেছিলাম খুলনায় যাবার অজুহাতে কিছুক্ষণ দুজনে একলা থাকব···তাই···

—কিছু বুঝতে পারছি না,—শুভেন্দু জড়িতস্বরে বলল : আপনারা কী Engaged? সত্যি?

পুষ্প প্রথমে মুখ নীচু করল। তারপর একটা নিঃশ্বাস চেপে অস্পষ্ট-স্বরে বলল : হ্যাঁ—

—ওঃ...আচ্ছা...Wish you good luck—শুভেন্দু অভিভূতের

মতো কিছুক্ষণ পুষ্পর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অন্যমনস্কের মতো আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে বিশুও ছুটে গিয়ে পুষ্পকে জড়িয়ে ধরল।—তার পা লেগে একটা কোচ্ উল্টে গেল সশব্দে।

বিশুকে সজোরে ঠেলে দিয়ে পুষ্প তৎক্ষণাৎ নিজেকে মুক্ত করে নিল। তারপর একটা ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করে দ্রুতপদে গিয়ে ঢুকল পাশের ছোট ঘরটায়।

বিশুও একটু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ল। পুষ্পর প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি শুনে সে আনন্দে স্থান-কাল বিস্মৃত হ'য়েছিল। কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র। চট্ করে একবার ঘরের সর্ব্বত্র চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেও ছুটে গিয়ে ঢুকল পাশের ঘরে।

—কী?—অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে পুষ্প বলল: আঃ! যাও না এখান থেকে—

—যাচ্ছি যাচ্ছি, আগে একটা—

—আঃ,—দু' পা পেছিয়ে গিয়ে পুষ্প আবার বলল: কেউ এসে পড়বে...যাও না...

—এসে পড়লেই বা!—পুষ্পর হাত দুটো মুঠো ক'রে ধরে, তাকে জোর ক'রে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে করতে বিশু বলল: তুমি তো আমার বৌ—

—আচ্ছা আচ্ছা, এখন যাও। আঃ—যাও না—

—আচ্ছা, কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ বলতো। পুষ্পকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে বিশু জোর করে তার কামনা চরিতার্থ করতে গেল,

সঙ্গে সঙ্গে নাকের ওপর একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে ছিটকে পড়ল পাঁচ হাত দূরে।

পুষ্প কোন রকমে নিজের একটা হাত মুক্ত ক'রে নিতে পেরেছিল। বিশুকে ধাক্কা দিয়ে সে আর দাঁড়াল না; ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিশুরও তখন কাণ্ডজ্ঞান বলতে আর কিছুই রইল না। এক হাত দিয়ে নাক্ চেপে ধরে সেও উন্মাদের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর আর একটা হাত বাড়িয়ে পুষ্পর বিনুনীটা ধরতে গিয়েই তার নজর পড়ল সামনের দরজাটার দিকে—

সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন মিঃ ঘোষ। কৌচ্ ওল্টানোর শব্দ শুনেই তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসেছিলেন।

বত্রিশ

একটা অর্থহীন আক্রোশে বিশুর বুকের ভেতরটা গুমরে গুমরে উঠ্‌ছিল। যে কাণ্ড আজ হয়ে গেল তার জন্যে দায়ী কে? পুষ্প নিশ্চয়ই।

অথচ আজ তার তরফে অন্যায় ছিলনা কিছুমাত্র। প্রতিদিনকার মতো আজও সে তার পাওনা আদায় করতে গিয়েছিল পুষ্পর কাছে। পুষ্পও বাধা দিয়েছে প্রতিদিন; কিন্তু আজকের মতো বাড়াবাড়ি তো সে কোনোদিন করেনি। শুভেন্দুর কাছে আজই সে স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছে নিজের engagement-এর কথা। আজই বরং তার উচিত ছিল বিশুর কাছে ধরা দেওয়া, যেমন সে দিয়েছিল গোবিন্দপুর ডাক্‌-বাংলোয় নিঃশঙ্কচিত্তে। অথচ, আজই সে করল সব চাইতে বেশী বাড়াবাড়ি। ফলে, ও-বাড়ীতে ঢোকার পথ তার চিরকালের মতোই বন্ধ হয়ে গেল।

ও বাড়ীতে ঢুক্‌তেও আর চায় না সে। পুষ্পরও মুখদর্শন সে আর কখনও করবে না। কিন্তু মেয়েটাকে জানিয়ে দিতে হবে, সে চ্যাংড়া ছোঁড়া নয়। পাড়ার প্যাঁকাটি-মার্কা ছেলেগুলো যে কারণে ছোঁক্‌ ছোঁক ক'রে বেড়ায় পাড়াতুতো ভগ্নিদের পেছনে,—ঠিক্‌ সে রকম

কোন মৎলব বিশুর ছিল না। পুষ্পকে সে গৃহলক্ষ্মী করতেই চেয়েছিল। তার আজকেকার স্বীকৃতিটাও বিশুরই অবিরাম অনুরোধ-উপরোধেরই পরোক্ষ প্রকাশ। তবুও, সে নিজেকে দুর্লভ করে তুলে দাম বাড়াতে চায় বিশুর কাছে।

দাম বিশু আজ ভাল করেই দিয়ে এসেছে। ভবিষ্যতে মিঃ ঘোষের মুখ থেকে সকলেই জানতে পারবে, বিশু একটা নিম্নস্তরের চরিত্রহীন ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় করে, ইজ্জত হারিয়ে, চিরদিনের মতো সমাজের বাইরে চলে যাবে সে, যে কোন দোষে দোষী নয়। আর আসল অপরাধিনী যে, সে নিরাপদে বেঁচে থেকে বিংশ শতাব্দীর নারী সমাজকে মহিমান্বিত করে তুলবে, আপন সংযমের আদর্শ দেখিয়ে।

ব্যক্তিগত সংযম! এ দম্ভ আর যারই শোভা পাক্ পুষ্পর আর করবার উপায় নেই,—তার সাক্ষী সে নিজে।

আজ থেকে ঠিক পনের দিন পূর্ব্বে, গোবিন্দপুর ডাক্-বাংলোয় বসে সে-ই প্রথম উপলব্ধি করেছিল রজতের ব্যক্তিত্বের প্রভাব কী প্রচণ্ড। যে যুগের শিক্ষা-দীক্ষা জাতিকে নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করা সম্বন্ধে এতটুকুও নির্দ্দেশ দেয় না; যে জাতি ধার-করা সভ্যতার আভিজাত্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে নির্ব্বিচারে কাম চর্চ্চা করে যায় স্বর্গীয় প্রেমের দোহাই পেড়ে; সর্ব্ব রকমের স্বেচ্ছাচারকে স্বাধীনতার সত্বায় সম্মানিত করে যে সমাজ আজ নিজেরই সত্ত্বা হারিয়ে বসে আছে, পুষ্প হচ্ছে সেই সম্প্রদায়েরই একজন নাম-করা মেয়ে। সে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার পরম শত্রু। যা কিছু সনাতন, তাই তার কাছে ঘৃণ্য। ধর্ম্মকে সে

মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রতিবন্ধক স্বরূপ একটা ক্ষতিকর সংস্কার ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। অথচ ব্যক্তিগত জীবনের যৌন-পবিত্রতাকে সে সেদিন পর্য্যন্তও আঁকড়ে ধরেছিল অত্যজ্য ধর্ম্মের মতোই, শুধু রজতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়েই। কিন্তু তারপর—

সেদিন গোবিন্দপুর থেকে ফেরবার পথে পুষ্পর সে কী কান্না! কিন্তু সে কান্না দেখে বিশু ক্রুদ্ধ হ'তে পারেনি,—হয়েছিল বিচলিত। কারণ, যার জন্যে সে ধর্ম্ম রেখেছিল তার প্রতিও তার অনুযোগ ছিল না, যার জন্যে তার ধর্ম্ম গেল তাকেও সে দোষ দেয়নি সেদিন। সেদিন সে অনুতাপ করেছিল শুধু নিজেরই কথা ভেবে। বিশুর তাড়নায় পুষ্প সেদিন স্বীকার করেছিল—

এ অঘটন ঘটিয়েছে তারই দুর্ব্বলতা। তারই কুমারী জীবনের আত-পোষিত কৌতূহল,—অজানাকে জানতে পাওয়ার পরম বিস্ময়,—প্রকৃতিগত বিষক্রিয়ার দুর্দ্দমনীয় কণ্ডুয়ন।

এইটুকুই বিশুর শাস্তি। সেদিন সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে গ্রহণ করেনি। কিন্তু আজ কেন তার এই ছলনা? লোভ দেখিয়ে নিজের দাম বাড়াবার কুৎসিত প্রচেষ্টা? কি ভাবে সে বিশুকে? পুষ্প ছাড়া কি পৃথিবীতে মেয়ে নেই?

আজ যদি সে মিনতিকে ভালবাসতে পারত। কাদার ঢেলার মতই নরম মেয়ে এই মিনতি। আজ যদি সে কলকাতায় থাকত···

বিশু কোন উদ্দেশ্য চালিত হ'য়ে পথ চলতে আরম্ভ করেনি; চিন্তার ধারাও তার সংলগ্ন ছিলনা। তবুও, প্রচণ্ড রৌদ্র মাথায় ক'রে ভবানীপুর থেকে পার্ক সার্কাস পর্য্যন্ত সে কী ক'রে যে হেঁটে এল, সে চিন্তা তাকে

যত না চঞ্চল করে তুলল, তার চাইতে বেশী কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ল সে আত্মপ্রকাশের আশঙ্কায়।

মিনতিদের বাড়ীর বন্ধ দরজা জান্‌লাগুলোর দিকে তাকিয়ে সে যে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, জানেনা। হঠাৎ খেয়াল হতেই তাড়াতাড়ি ফিরে চলল।

কিন্তু হোষ্টেলে ফিরেই বা সে কী করবে। পুষ্পর চিন্তাকে আর সে আমল দেবে না; মুক্তি-সঙ্ঘের নীরস কর্ত্তব্যর কথা স্মরণ করতেই মন ঝিমিয়ে আসে; মিনতিও এখানে নেই যে, তার সাহচর্য্যে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকবে সে। তবে সে করবে কী? শান্তির আশায় এমনি করেই সে দিনের পর দিন পথে পথে ছুটে বেড়াবে!

পরিচিত মহলে সম্ভবতঃ ইতিমধ্যেই তার প্রবেশ নিষেধ হয়ে গেছে। হওয়াই স্বাভাবিক। ব্যাপারটা যখন নারী-ঘটিত এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ নিজে সে যখন পুরুষ, তখন প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তার বিচারের প্রশ্ন অবান্তর। নর-নারীর সমান অধিকারের দাবী যাঁরা যত বেশী যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁরাই তত বেশী সম্মান দেখান নারীকে। বড্ড বেশী যুক্তিবাদী বলেই বোধহয় এ ক্ষেত্রে সমান অধিকারের প্রশ্নটা তাঁদের মনে পড়ে না; একহাতে তালি বাজার যুক্তিটাও বিস্মৃত হন তাঁরা। কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট। যে কারণে মেয়েদের অপরাধ করার কথাটা তাঁদের মনে পড়ে না, ঠিক সেই কারণেই তাঁরা পুরুষ ছাড়া আর কাউকেই অপরাধী ভাবতে পারেন না। শিক্ষা, সভ্যতা ও ঔদার্য্যের মুখোষ পরে নিজেদের অপরাধ করার পথটি তাঁরা চমৎকারভাবেই খোলা রেখে দেন। চমৎকার.....

আরও চমৎকার এই সমাজের মেয়েগুলো। এদের বিদ্যাও যেমন বুদ্ধিও তেমনি। গোলদীঘির ধারে যে কেরাণী-manufacturing Institution-টা আছে তার কর্ণধারদের কৃপায় এরা আর কিছু অর্জ্জন করতে না পারুক, স্বকীয় মর্য্যাদা জ্ঞানকে নিঃশেষে বিসর্জ্জন দেবার বিদ্যাটা শিখে আসে ভাল করেই। নাহলে, পুরুষ-স্তাবকদের প্রশংসা শুনে এরা গলায় দড়ি না দিয়ে আনন্দে গলে পড়ে! জানতে পারে না, ওটা আদৌ অভিনন্দন নয়, নিতান্তই অপমান! একটা ভিত্তিহীন সামাজিক অগ্রগতির দম্ভে এরা এমনই আত্মবিস্মৃত যে ভাবতেই পারে না,—প্রগতি কথাটা আসলে তাদের একটা কল্পনা-বিলাস! বুঝতে পারে না,—এই অস্তিত্বহীন সমাজের সমাজপতিরাও আসলে পুরুষ এবং তারা তাদের হাতের খেলার পুতুলমাত্র!

কিন্তু, এ-সমাজ যদি তাকে বিনা দোষে দোষী সাব্যস্ত করে, তাহলে সে-ই বা সে-সমাজের মুখ চেয়ে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখবে কেন!

বাঘের বাচ্ছাকে একদিনের জন্যে রক্তের আস্বাদ দিয়ে, তারপর নিছক মজা দেখবার অজুহাতে যে তাকে উপবাসী থাকতে বাধ্য করেছে, তার মনুষত্বের বালাই নিয়ে প্রগতিশীল শিক্ষিত সমাজ ধন্য হোক, বিশু তাদের একজন হতে চায় না। বরং একদিন এই সমাজের জীব ছিল বলেই আজ সে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ অসামাজিকতার চরম করে ছাড়বে।

তার পরিণতি দেখে সমাজের ধুরন্ধরেরা অবশ্যই হাসবেন। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও তো অন্ততঃ বুঝতে পারবে,—কার জন্যে তলিয়ে গেছে সে রসাতলের অতলে!

কিন্তু তাও সম্ভব হয় না বিশুর পক্ষে। ব্যাপারটা ভাবতেই তার গা

ঘিন্ ঘিন্ ক'রে! একটা পুরোণ স্মৃতিও মনে পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কলেজে পড়বার সময়, সহপাঠীদের দেখাদেখি সেও একদিন ঢুকেছিল জান্‌বাজারের একটা গলির মধ্যে। কিন্তু সে গিয়েছিল কলেজ পালিয়ে দুপুর বেলায়। ফলে, আর বেশীদূর সে অগ্রসর হতে পারেনি। প্রকাশ্য দিবালোকের মধ্যে ঐ পল্লীর অধিবাসিনীদের যে কুৎসিত রূপ সে দেখেছিল···উঃ......

কিন্তু এও যদি তার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে সে বেঁচে থাকবে কী করে!

জীবন তার নিঃসঙ্গ, মস্তিষ্কও অলস। আলস্যের কারখানায় উদ্ভব হয় নিত্য-নূতন মৎলবের। সেও প্রতিদিন বেরিয়ে পড়ে উৎসাহিত হয়ে,—একটা কিছু উপলক্ষ তো তার মিলেছে! কিন্তু লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার মধ্যপথ থেকেই বুদ্ধি তার ঘুলোতে আরম্ভ ক'রে। সাহসও যায় হারিয়ে। তারপর উদ্দেশ্যহীনের মতো সমস্ত দিনটা পথে পথে ঘুরে রাত্রির অন্ধকারে এক সময় এসে আশ্রয় নেয় হোষ্টেলে। এমনি ক'রে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সন্ধ্যের সময় সে গিয়ে হাজির হলো সর্ট ষ্ট্রীটে।

ফটকে পূর্ব্বের মতো আর গুর্খা পাহারা ছিল না। সুতরাং বিনা বাধায় সে এগিয়ে চলল ড্রইংরুমের দিকে। কিন্তু দরজার বাইরেই তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'লো। মোটা পর্দ্দার ও-পাশ থেকে ভেসে এল বন্দনার কণ্ঠস্বর: Oh no...no...no! তোমার সঙ্গে সবশুদ্ধ আমি পাঁচদিন ক্যাসানোভায় গিয়েছি and it is too much...

—And you are tired of me—উত্তর হ'লো পুরুষ কণ্ঠে।

—ইস্, ছেলের গাল টিপলে দুধ বেরোয়,—রাগ দেখ না।

—নাঃ রাগ কিসের। অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উত্তর হলো : বেশ, আমি তাহলে চললুম্—

—আবার ওঠে! বন্দনা ধমক দিল : বসো বলছি—

—আর বসে কী হ'বে? তুমি তো যাবে না—

—না, তোমার সঙ্গে ক্যাসানোভায় ঢুকলে আমার আর ছবি দেখা হ'বে না।

—ছবি? কী ছবি? কোথায়?

—কিস্‌মেৎ। Picture Palace-এ হ'চ্ছে। আজ শেষ দিন, যাবে?

—কিন্তু তার আগে একবার ক্যাসানোভায় ঢুকলে দোষ কী?

—না, ওখানে আর যেতে হ'বে না। তার চেয়ে বরং বাড়ীতে Beer আছে, তাই একটু খেয়ে নাও—

—Beer। নির্জ্জলা তাড়ি? আমি উঠলুম……

বিশু আর দাঁড়াতে ভরসা করল না, নিঃশব্দে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে। কিন্তু নিজের অন্যমনস্কতার কথা ভেবে নিজেই সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। অন্যমনস্ক থাকবার আশাতেই সে হন্যে কুকুরের মতো পথে পথে ছুটে বেড়াচ্ছে;—লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে আজ সে বন্দনার মতো মেয়েরও দ্বারস্থ হতে গিয়েছিল, অথচ সিনেমা দেখে সময় কাটাবার কথা তার মনেই পড়েনি এতদিন।

কিন্তু কিস্‌মেৎ পদার্থটা কী। Elphinstone Picture Palace-এর Show Case-এ আঁটা ছবিগুলো দেখে কথাটার অর্থ সে উপলব্ধি করতে পারল না বটে কিন্তু দেখার ইচ্ছেটা অদম্য হ'য়ে উঠল। সে এগিয়ে গেল Booking-Counter-এর দিকে।

রাত্রি ন'টার প্রদর্শনী আরম্ভ হতে অনেক বিলম্ব ছিল তখনও। কিন্তু টিকিট ইতিমধ্যেই প্রায় সব বিক্রী হ'য়ে গিয়েছিল। বিশুর প্রশ্নের উত্তরে Counter-এর মেম্-সাহেব মারাত্মক রকমের একটা হাসি হেসে বলল: দুঃখিত! 1st class-এর নীচে আর কিছু নেই। দোব একখানা?

একটা ঢোক গিলে বিশু সরে এল। অবশ্য পকেটে তার একখানা দশ টাকার নোট আছে। কিন্তু অত দাম দিয়ে ছবি দেখা কি তার উচিৎ হ'বে! বর্ত্তমানে উপার্জ্জন তার এক পয়সাও নেই। যৎসামান্য সঞ্চয় তার যা আছে, তাই ভেঙ্গে তাকে হোষ্টেলের বিল্ মেটাতে হ'বে। এ অবস্থায়...কী করা যায়! ভাবতে ভাবতে সে হগ্-মার্কেটে গিয়ে ঢুকল।

তার সমস্যা ছিল, বেশী দাম দিয়ে ছবি দেখা উচিৎ কিনা। কিন্তু কিছুক্ষণ ধরে স্বাস্থ্যবতী মেম্-সাহেবদের বাজার-করা লক্ষ্য করবার পর তার সমস্যাটা আর আর্থিক হিসাব-নিকাশের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ রইল না। সে তখন উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠল,—1st Class-এর টিকিটগুলোও যদি ইতিমধ্যে বিক্রী হয়ে গিয়ে থাকে। সে তাড়াতাড়ি ফিরে চলল।

রাস্তায় বেরুতেই আর একটা ব্যাপার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ভিড়ের মধ্যে গোটা কতক লুঙ্গীপরা মুসলমান অল্প মূল্যের টিকিট দর্শনার্থীদের কাছে বেশী দামে বিক্রী করছে। দেখে, বিশু অত্যন্ত আশ্বস্ত হ'লো। সঙ্গে সঙ্গেই একটা লুঙ্গীপরা প্রৌঢ় লোক তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে গেল: থাড্ কিলাশ বাবু বার আনা। সিকিন্ কিলাশ্ দেড় রুপেয়া......

লোকটার মুখের দিকে চেয়ে বিশু একটু বিস্মিত হ'লো। কোথায় যেন দেখেছে সে লোকটাকে। পরমুহূর্ত্তেই মনে পড়ল, এ সেই ঠাকুর দাস পালিত লেনের মেসে দেখা পোষ্ট-অফিস্। ভদ্র লোকের অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হ'লো বিশুর। অর্থোপার্জ্জনের জন্য ভদ্রলোককে শেষে লুঙ্গী পরে গুণ্ডাদের সঙ্গে ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দীতায় নামতে হয়েছে!—সে পোষ্ট-অফিসের কাছ থেকেই টিকিট কেনবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি এগোতে গেল। কিন্তু তার পূর্ব্বেই চোখাচোখী হয়ে গেল বন্দনার সঙ্গে। সে অশোকের সঙ্গে Counter-এর দিকেই যাচ্ছিল।

বিশুর বুকটা যেন চড়াৎ করে উঠল। (সমাজে বন্দনার প্রসাধনের খ্যাতি থাকলেও রূপের মূল্য তেমন কিছু ছিল না।) বরং তার ফ্যাকাশে রঙ্ দেখে অনেকেই মন্তব্য করত, বর্ণটা Low Doze-এ Arsenic খাওয়ার প্রতিক্রিয়া। কিন্তু আজ বিশুর কাছে সে সব মন্তব্য মিথ্যে হয়ে গেল। সঁাচ্চার কাজ করা হাল্কা সবুজ রঙের শাড়ীটার ফাঁক দিয়ে তার দেহের যেটুকু অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, সেটার বর্ণ ফ্যাকাসে কি না সে চিন্তা তাকে এতটুকুও বিচলিত করল না। তাকে চঞ্চল করে তুলল বন্দনার মেদহীন দেহলতার অপূর্ব্ব ঋজু-শ্রী। প্রসাধনের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। কজ্জল-কলঙ্কিত চটুল চক্ষের শৃঙ্গারোদ্দীপক কটাক্ষ। হাই-হিল জুতো পরে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহেরও স্থানে স্থানে তরঙ্গিত হচ্ছিল লাস্য গতির নৃত্য-চাঞ্চল্য। সে তরঙ্গ গিয়ে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করল ক্ষুব্ধ বিশুর লুব্ধ বুকে।

—বিশুদা' যে! ছবি দেখতে নাকি?—বিশুকে হন্তদন্ত হ'য়ে পাশে

এসে দাঁড়াতে দেখে অশোক তবু নীরস স্বরে একটু ভদ্রতা করবার চেষ্টা করল; কিন্তু বন্দনা ফিরেও চাইল না। সে গম্ভীরভাবে টিকিট্ কিনে অডিটোরিয়ামের দিকে চলে গেল।

বিশুও সঙ্গে সঙ্গে তার দশ টাকার নোট্খানা বার করল। তার আসনের নম্বর পড়ল বন্দনার ঠিক পাশেই।

কিস্‌মেৎ ছবিখানার মতো অমন কামোদ্দীপক ছবি বিশু জীবনে কখনও দেখেনি। লস্-এঞ্জেলের সুন্দরী তরুণীদের অর্দ্ধনগ্ন দেহলতা, তাদের সম্পূর্ণ নগ্ন সুগঠিত উরুদেশের অশ্লীল নৃত্য-ভঙ্গিমা প্রভৃতি দেখে তার শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে উঠল; কণ্ঠ শুকিয়ে যেতে লাগল মুহুঃমুহুঃ। উজীর হারেমের অসংখ্য রূপসীর দৈহিক কামনাপূর্ণ অপরূপ লাস্য নৃত্য দেখে বুকের মধ্যে তার এক সঙ্গে যেন একাধিক রুদ্র তাণ্ডব সুরু করে দিল। সে ঘন ঘন বন্দনার দিকে তাকাতে আরম্ভ করল। সম্মুখস্থ পর্দ্দাটি থেকে যেটুকু আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল, তাতে তার মুখ বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু সে মুখের ভাব দেখে বিশু কথা কইতে ভরসা করল না।

—মসলাদার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে। অশোক অনেকক্ষণ থেকেই উস্‌খুস্ করছিল, ইন্‌টারভ্যাল্ হ'তেই সে উঠে পড়ল। বলে গেল: দেখি চ্যানাচুর পাওয়া যায় কি না।

অশোক চলে যেতেই বিশু সুযোগ বুঝে বন্দনার দিকে একটু ঘেঁসে বসল। তারপর করযোড়ে, কম্পিতকণ্ঠে বলল: আমায় ক্ষমা করতে হবে—

বন্দনা ভ্রূকুঞ্চিত করল।

বিশু বলে চলল: জানি আমার অপরাধের সীমা নেই...still... ক্ষমা আপনাকে করতেই হবে...at any cost...

বন্দনা কথা কইল না, শুধু একটু সরে বসল।

Please—বিশু আরও ঝুঁকে পড়ল। স্খলিতস্বরে আবার সে বলল: Please···আমি আপনার পায়ে ধরছি...please...

হঠাৎ আলো নিভে গিয়ে পর্দ্দায় বিজ্ঞাপন দেখানো সুরু হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে বন্দনা অনুভব করল, একটা হাত তার পায়ের ডিম্ স্পর্শ করছে। সে স্পর্শ অর্থহীনও নয়, অনুতপ্তেরও নয়। সে উত্তপ্ত অনুভূতির গতি উর্দ্ধগামী।

—কী হচ্ছে,—সরে বসুন—

—না আগে বলুন,—বিশু এবার উত্তেজিতভাবে বন্দনার হাত ধরতে গেল কিন্তু তার পূর্ব্বেই অশোক এসে আসন গ্রহণ করল।

আবার আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটের হের-ফেরে বন্দনার যা ভাবান্তর দেখা গেল তা সত্যই অভাবনীয়। সে হঠাৎ অতি ঘনিষ্ঠের মতো বিশুকে বলল: চলুন বিশুবাবু, অন্য কোথাও যাওয়া যাক্। মেগেঃ! কী বিশ্রী ছবি—

—Exactly! ও পাশ থেকে অশোক বলে উঠল।

কিন্তু বিশু জবাব দিতে পারল না। সাধারণ ভদ্রতা বিস্মৃত হয়ে, আরক্ত নেত্রে, এমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো যে, মেয়েটি বন্দনা না হ'য়ে অন্য কেউ হ'লে আপত্তির কথা উঠত।

—কী ভাবছেন এত? বিশুর বাহুমূল ধরে নাড়া দিয়ে বন্দনা আবার বলল: যাবেন?

বিশু একটা ঢোক গিলে বলল: আপনি হুকুম করলে, অবশ্য... কিন্তু, পয়সা খরচ করে এলাম, সবটা দেখব না?

—পয়সা? —অশোক এবার উঠে দাঁড়াল। বলল: পয়সা খরচ করে এই ছবি দেখতে হবে? তবুও যদি Technicolour-এ হতো—ফুঃ—বলেই, সে দরজার দিকে অগ্রসর হ'লো। সহজ মানুষের মতো হাঁটবার অবস্থা তখন আর তার ছিল না; কিন্তু মস্তিষ্ক কিছুটা পরিষ্কার ছিল তখনও। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে আস্তে আস্তে পা ফেলে চলে গেল।

—ওকি! বিশু আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: ও যে সত্যিই চলে গেল?

—যাক্ না। বিশুর জানুর ওপর একটা চিম্‌টি কেটে বন্দনা বলল: ভালই তো হ'লো—

—কিন্তু ওর অবস্থা যে—

—ভাববেন না। ক্যাসানোভার পথ ও ঠিক চিনে যেতে পারবে!

সিনেমা দেখে বন্দনার সঙ্গে বিশু সূর্ট ষ্ট্রীটেই ফিরল। কাণ্ডজ্ঞান বলতে তখন আর তার কিছুই ছিল না। তবুও, বন্দনা যখন দরজা খোলাবার উদ্দেশ্যে কলিং-বেল্ টিপল তখন মুহূর্ত্তের জন্য একবার সে সঙ্কোচ বোধ করল। রাত্রি একটার সময় তাকে বন্দনার সঙ্গে ফিরতে দেখে বংশী কী ভাব্‌বে।

দরজা খুলে দিল একটা নেপালী চাকর। তার ভাব-লেশহীন্ মুখের দিকে তাকিয়ে বিশু কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হ'লো; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার বিচলিত হ'য়ে পড়ল একটা আওয়াজ্ শুনে—

—কৌন্ হ্যায় রে?—আওয়াজটা এল যেন রমেশবাবুর অফিস ঘরের দিক্ থেকে।

—মেম্ সাহাব। নেপালীটা খন্‌খনে গলায় উত্তর দিল।

কণ্ঠস্বরটা বিশুর অপরিচিত নয়; সে সভয়ে বন্দনার হাত চেপে ধরল।

—ভয় কি। দাদা কিছু টের পাবে না, আসুন।—বিশুর হাত ধরে বন্দনা নিজের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপর আলোটা জ্বেলে দিয়ে বলল: একটু বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি।—বলে সে বাইরে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করল।

—ওকি! দরজা বন্ধ করছো কেন?

দরজা খুলে বন্দনা এবার শুধু নিজের মুখটি বাড়াল। মুচ্‌কে হেসে বলল: সেদিনকার মতো যদি পালিয়ে যান্।—বলেই, দরজার হুড়কো টেনে দিয়ে প্রস্থান করল।

বন্দনার ব্যবহারে সন্দিগ্ধ না হলেও, বিশুর অস্বস্তিরও সীমা রইল না। ঘড়ির দিকে চেয়ে সময় দেখবার মতো অবস্থা তখন আর তার ছিল না; সে শুধু শুনছিল তার নিজেরই হৃদ্‌পিণ্ডের ধুক্ ধুক্ ধ্বনি।—তাকে একলা বসিয়ে রেখে কী করছে বন্দনা এতক্ষণ ধরে!

হঠাৎ খুট্ ক'রে একটা শব্দ হ'লো পিছন দিকে। বিশু চম্‌কে উঠে ফিরে তাকাবার পূর্ব্বেই—

শুভেন্দু এসে বজ্র মুষ্টিতে তার একটা হাত চেপে ধরল। তারপর

তাকে টেনে নিয়ে চলল, সে যে পথে এসেছিল সেই পথেই। বাথ-রুমের পাশেই ছিল কমোড্-শোভিত পায়খানা। পায়খানার পেছনে ছিল আর একটা ক্ষুদ্র দরজা। দরজা খুলতেই দেখা গেল মেথরদের যাতায়াতের উদ্দেশ্যে রক্ষিত একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি। বিশুকে টানতে টানতে শুভেন্দু তর্‌তর্‌ করে সেই সিঁড়ি ধরে নেমে এল। তারপর অতি ক্ষুদ্র একটা এঁদো গলি অতিক্রম করে এসে পৌঁছল রাস্তায়।

রাস্তায় এসে শুভেন্দু চট্ করে একবার বিশুর জামা-কাপড় তল্লাস করে নিল। তারপর কিছু না পেয়ে বলল: এইবার পালান। শীগ্‌গীর,—পুলিশ এসে পড়ল বলে···

—এঁ্যা!

—শীগ্‌গীর পালান। ফোন পেয়ে তারা এসে পড়ল বলে।

বিশু নড়ল না। আচম্‌কা আঘাতে মোহজাল তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছিল; কিন্তু বুদ্ধির জড়তা তখনও কাটেনি। শুভেন্দুর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে সে বলল: আপনি আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন? কেন?

—কেন?—শুভেন্দু একবার অস্থিরভাবে চতুর্দ্দিকে তাকাল। তারপর আবার বিশুর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল।

রাস্তাটা কিছুদূরে গিয়েই মোড়্ ফিরেছিল একটা জায়গায়। সেই পর্য্যন্ত এসে শুভেন্দু বিশুর হাত ছেড়ে দিল। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল: আপনি একটি গবেট্। শীগ্‌গীর সরে পড়ুন—

—আপনি···অভিভূতের মতো বিশু আবার বলল: আপনি আমায় ছেড়ে দিচ্ছেন?

—হ্যাঁ। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ আমি করিনা।

বিশু তবুও নড়ল না।

—অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি! শুভেন্দু আবার বলল: আপনার অতি বুদ্ধিমান দলপতিটিকে বলবেন,—বুদ্ধির খেলায় আর একটু বেশী বুদ্ধি খরচ করতে। নিন্, এবার পালান।

—না।

—না?

বিশু একবার কেঁপে উঠল। তারপর হঠাৎ শুভেন্দুর একটা হাত চেপে ধরে বলে উঠল: না, আমি চাইনা,—আমি পারিনা...

—কী মুস্কিল। শুভেন্দু জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিল।

—আমি আর পারি না। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বিশু আবার আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল: এ ভাবে বাঁচতে আর আমি পারিনা...এর চেয়ে আমার জেলই ভাল...

ব্যাপার দেখে, শুভেন্দু অগত্যা নিজেই পালিয়ে গেল।

বাকী রাতটুকু পথে পথে ঘুরে, বিশু ভোরবেলায় গিয়ে ঢুকল উড্‌বর্ণ পার্কে। নিদারুণ শ্রান্তিতে শরীর যেন তার ভেঙ্গে পড়ছিল। পেটেও কিছু ছিল না। গতকাল সকাল সাড়ে নটার সময় দুটি ভাত খেয়ে সে হোষ্টেল থেকে বেরিয়েছিল। তারপর থেকে পেটে আর কিছু পড়েনি। অথচ পথ চলার জন্যে পরিশ্রমও হ'য়েছে প্রচুর। সে অবসন্নের মতো একটা বেঞ্চের ওপর দেহ এলিয়ে দিল।

কিন্তু শরীর তার ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়লেও, মনের গ্লানি তখন তার কিছু ছিল কি না সন্দেহ। বন্দনা তার ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছিল! তাকে বাড়ীতে ভুলিয়ে এনে, শোবার ঘরে বন্ধ করে, সে পুলিশে ফোন করেছিল তাকে লোকসমাজে অপদস্থ করবার জন্যে! অথচ, শুভেন্দু তো ওই ইতর স্ত্রীলোকটারই সহোদর। কিন্তু কত মহৎ সে! গত রাত্রে শুভেন্দুর সঙ্গে তার কী কী কথা হ'য়েছিল সঠিকভাবে মনে না পড়লেও, একটা কথা তার স্পষ্ট মনে পড়েছিল। শুভেন্দু তাকে হাতে পেয়েও ধরেনি। ধরবেও না কখনও। সে বুদ্ধির খেলায় রজতকে পরাস্ত করতে চায়, কিন্তু বিশুকে ধরবে না। কারণ—

শুভেন্দু ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবে না।

কথাটা অবশ্য অত্যন্ত আপত্তিকর। কারণ কথাটা বলে শুভেন্দু শুধু দম্ভই প্রকাশ করেনি, সঙ্গে সঙ্গে বিশুকেও জানিয়ে দিয়েছে, রজতের তুলনায় সে একটা কিস্যু নয়। তবুও, কেবলমাত্র ওই কথাটিকেই তো তার বড় করে দেখলে চলবে না। গত রাত্রে কিসের জন্যে সে বন্দনার শোবার ঘরে ঢুকেছিল, সে কথা আর কেউ না জানুক সে নিজে তো ভাল করেই জানে। কিন্তু শুভেন্দুর সন্দেহ, তার মৎলব ছিল রমেশদার গোপনীয় কাগজ-পত্র চুরী করা। এই সন্দেহের দ্বারাই শুভেন্দু প্রমাণ করেছে, বুদ্ধির দম্ভটা তার কত অসার। তবুও, সে দম্ভ প্রকাশ করেছিল বলেই তো বিশু আজ এত নিশ্চিন্ত বোধ করছে।

বিগত দিনের কত স্মৃতি, কত কথা ঘোরাফেরা করতে লাগল তার মনের মধ্যে। বিশেষ ক'রে মনে পড়ল তার দুটি দিনের কথা। গোকুল নগরে পৌঁছবার পর এবং সেখান থেকে ফেরবার পর,—দুদিনই

শুভেন্দুর সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়েছিল। শুভেন্দুর সন্দেহটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্যে এই দুদিনই সে তাকে অনেক রূঢ় কথা, অনেক মিথ্যা কথা বলেছিল। কিন্তু তখন কি সে জানত,—বিশুকে ক্ষেপিয়ে আসলে রজতেরই ধৈর্য্য নষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল সে। শুভেন্দুর প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় মন তার ভরে উঠল।

দিনের আলো ক্রমেই প্রখর হ'য়ে উঠছিল। রাস্তায় যান-বাহনের চলাচলও বাড়তে লাগল আস্তে আস্তে। হঠাৎ বিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল অদূরস্থ একটি অট্টালিকা। বাড়ীটার সামনে গাড়ীর ভিড় ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

এই জনতার কারণও সে জানে। ঐ বাড়ীর একটি যুবক অত্যন্ত অসুস্থ, তাই এই জনতা। বিশু উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠল ভিড়ের বহর দেখে।

এই যুবকটিকে সে জানে। অবশ্য তাঁকে জানে সারা পৃথিবীর লোক; কিন্তু সে জানে ব্যক্তিগত ভাবে। তাই, তাঁর ব্যাধির কারণটাও তার অজানা নেই।

সাগর পারের শত্রুরা তাদের ভারত-সাম্রাজ্যের এই একটি মাত্র লোককে বারুদের স্তূপ বলে মনে মনে ভয় করে। এবং শাসক কর্তৃক বাঙ্গলা দেশের এই বারুদের স্তূপটিকে গুঁড়িয়ে ছাতুর পর্ব্বতে পরিণত করতে না পারবারই পরিণাম, যুবকের উদরের এই মারাত্মক ব্যাধি!

বিদেশের শত্রুদের কথা ভাবতে ভাবতে স্বদেশের বন্ধুদের কথাও মনে পড়ে যায় তার। সঙ্গে সঙ্গে মনটাও একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ে! তার লজ্জা, সেও একদিন এই স্বদেশী বন্ধুদেরই একজন বিশ্বস্ত সেবক

ছিল এবং তাই সে জানে, অবাঙ্গালী অধ্যুসিত এই বিরাট প্রদেশের একমাত্র দীপশিখা, এই জিতেন্দ্রিয় বাঙ্গালীটিকে তাঁরা ঠিক কী পরিমাণ সুনজরে দেখেন! সম্ভবতঃ তাঁদের আশঙ্কা, পরশ-পাথরের ছোঁয়া লেগে হঠাৎ যদি এই অনুকরণপ্রিয় আত্মবিস্মৃত জাতি সচেতন হ'য়ে ওঠে! Slogan-এর উচ্ছ্বাস থামিয়ে যদি তারা হঠাৎ হিসাব-নিকাশ করতে আরম্ভ করে দেয়! মন যদি তাদের আপোষ বিরোধী হয়ে ওঠে!—তাহলে তো তাঁদের এতদিনকার সাধনার ফল সবই বৃথা হ'য়ে যাবে!

আপোষ-প্রয়াসীর সাধ্য-সাধনা! ভিক্ষা ক'রে এরা দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে চায়। অগ্রগতির চমৎকার উদাহরণ! আরও চমৎকার এঁদের নিয়মতান্ত্রিকতার অজুহাত। এই আদর্শবাদের আড়ালে থেকে নিজেদের কায়েমী গদিগুলোকে চমৎকার ভাবেই বাঁচিয়ে রাখা যায় পুত্র প্র-পৌত্রদের জন্য। এ আদর্শবাদের বনিয়াদ এত দৃঢ় যে দেশবন্ধুর মতো প্রতিভাও একদিন—

—আরে বিশুদা, আপনি এখানে? আর আমি ওদিকে—

বিশু চমকে উঠে ফিরে দেখল মণ্টু,—আঠার বছরের যে ছেলেটি গোকুলনগর action-এর সময় তার সহকারী হয়েছিল।

মণ্টু আবার বলে উঠল: আপনি তো ঢুকলেন সদর দিয়ে, কিন্তু বেরুলেন কোথা দিয়ে বলুন তো? গণেশদা'কে দেখেছেন?—বলেই, হঠাৎ সে জিব্ কেটে থেমে গেল।

বিশু একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে বলল: তুমি কি আমাকে follow করছিলে মণ্টু?

মণ্টু উত্তর না দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করল।

বিশু তার হাত ধরে নিরস্ত করল। বলল: আমার কথার উত্তর দাও মণ্টু!

—বাঃ আমার কী দোষ! অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে মণ্টু বলল: আপনি কেন meeting attend করেন না—

—মিটিং-এর কথা তো আমায় কেউ বলেনি!

—আপনাকে পাবে কোথায় যে বলবে।—হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে মণ্টু বলল: আপনি তো দিন রাত পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।—বলেই সে ছুটে পালিয়ে গেল! বিশু লক্ষ্য করল, সে গিয়ে থামল অদূরস্থ অট্টালিকাটির সামনে। তারপর একটি লোককে কী একটা কথা জিজ্ঞাসা করেই আবার চলে গেল অন্যদিকে।

বিশুও আবার পথ চলতে সুরু করল। মাত্র কয়েক মিনিট পূর্ব্বে সে শুভেন্দুর কথা স্মরণ করে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। কিন্তু নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে দৃঢ়-নিশ্চয় হবার পর পাঁচ মিনিটও কাটল না, মণ্টু এসে তার সব স্বপ্ন চুরমার করে দিয়ে গেল ...শেষে, তার মতো লোক-কেও সন্দেহ করল রজত।

বিশু নাকি দুর্ব্বল! এই অজুহাতে প্রথমে সে কেড়ে নিল তার যন্তরটি। তারপরই তাকে বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন করবার জন্যে চর লেলিয়ে দিল। কি মনোবৃত্তি রজতের।...আজ যদি রিভলবারটাও তার অধিকারে থাকত!

কিন্তু তা হলেই বা কী হতো। হাঁসপাতালে আশ্রয় নেবার পূর্ব্বে যদি নরেন গোঁসাই আত্মহত্যা করতো তাহলে, সত্যেনের ফাঁসীট

হয়তো নাও হ'তে পারতো; কিন্তু তা সত্ত্বেও নরেনের অপরাধটা কি অপ্রকাশিত থাকত।

কিন্তু,—বিশু হঠাৎ ভীষণ ভাবে চমকে উঠল। এ সব কী সে ভাবছে! সে তো আর সত্যিই নরেনের মতো নয়। তবে তার কিসের ভয়! সে আজই যাবে গোকুলনগরে। সেখানে গিয়ে সে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বোঝাপড়া করবে রজতের সঙ্গে।

পনের মিনিটের রাস্তা দেড় ঘণ্টায় অতিক্রম করে বিশু হোষ্টেলে ফিরল: সিঁড়ির পথে দেখা হলো, Y. M. C. A.-এর Assistant Secretary গিলু বাবুর সঙ্গে। বিশুকে দেখেই তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন: আরে মশাই আপনি ছিলেন কোথায়—

—কেন? বিশু ভ্রুকুটি করল।

গিলুবাবু কিন্তু ভড়কালেন না। একগাল হেসে বললেন: এক ভদ্র মহিলা যে আপনাকে গরু-খোঁজা করছেন কাল থেকে—কথাটা শেষ করবার পূর্ব্বেই অফিস-ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল।

গিলুবাবু ছুটে গিয়ে ফোন ধরলেন: হ্যালো! ও:, হ্যাঁ, এই মাত্তর ফিরলেন। মেজাজ বড্ড গরম...... দোব তাঁকে...

—বিশুবাবু! গিলুবাবু হাঁক দিলেন: পুষ্প দেবী আপনাকে ডাকছেন।

—Sorry, ও-নামে আমি কাউকে চিনি না।—বলেই, বিশু তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গেল।

পুষ্প তাকে নিজে থেকে ডাকছে। কিন্তু এতদিন পরে আবার কেন? তাকে নিয়ে বাঁদর নাচানোর সাধ কি এখনও মেটেনি তার!—

ঘরময় বার কতক পায়চারী করে বিশু একটা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। পাশের দেওয়ালেই টাঙ্গান ছিল একটা দেওয়ালপঞ্জী। সেইদিকে নজর পড়তেই দেখল, গত মাসের পাতাখানা এখনও ছেঁড়া হয় নি।

পাতা ছিঁড়তে গিয়েই তার আবার নতুন করে মনে পড়ল গোবিন্দপুরের কথা। আজ থেকে একমাস পূর্ব্বে...না, ঠিক উনত্রিশ দিন পূর্ব্বে পুষ্প তাকে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছিল। কিন্তু সেদিনকার সেই স্মৃতি আজও কেন জ্বালা ধরিয়ে দেয় রক্তে।—বিশু আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সেদিনকার কত কথাই যে মনে পড়ে! আজকে সে হন্যে কুকুরের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু সেদিন সে ছিল যেন সম্রাট। তাকে সুখী করবার জন্যে সেদিন যেন সমস্ত পৃথিবীটা উন্মুখ [illegible] উঠেছিল।...কল্পাতীত কালের যে সাধনার ধন, সেই দুর্লভ নারীরত্নও সেদিন তাকে আত্মসমর্পণ করেছিল। সেদিনও সে শুয়েছিল এমনি আচ্ছন্নের মতো মুদ্রিত চক্ষে আর তার শিয়রে বসে সেবা করছিল পুষ্প। চাঁপার কলির মতো আঙ্গুলগুলো দিয়ে বিশুর চুল টেনে দিতে দিতে সে বলছিল: ওগো শুনছো...

বিশুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কালের ব্যবধানে সে স্বর এতটুকুও অস্পষ্ট হয়ে যায় নি, একটুও ম্লান হয় নি সে স্মৃতি। সেদিনকার পুষ্পর সেই স্নিগ্ধকণ্ঠের ডাক্ তার দেহের প্রতি তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হলো: ওগো শুনছো...

রোমাঞ্চিত কলেবরে, মুদ্রিত চক্ষেই বিশু নিজের মাথায় হাত দিল।

স্পর্শ পেল সেদিনকার মতোই ক্ষুদ্র একটি কোমল করপল্লবের। এও স্মৃতি—এও স্বপ্ন!

বিশু ধড়মড় করে উঠে বসল। কিন্তু ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে তার আরও কয়েক মিনিট কেটে গেল।

—তুমি? এখানে?

—কী করি বল! একটু হাসবার চেষ্টা করে পুষ্প বলল: খোকাবাবুর মেজাজ্ যে এখন বড্ড গরম। তাই নিজেই এলাম—

তার মান ভাঙ্গাতে পুষ্প সব কিছু তুচ্ছ করে ছুটে এসেছে এই পুরুষ অধ্যুসিত হোষ্টেলে? কথাটা ভাবতেই বিশুর বুকখানা দশহাত হয়ে গেল। মান-অভিমানের পালা আর বেশীক্ষণ চলল না।

—আচ্ছা, তুমি কি লোক বলতো! সেদিন ওই কাণ্ড ক'রে চলে এলে, তারপর একবার খোঁজও নিলে না, কী অবস্থায় আমার দিন কাটছে?

—কী অবস্থায় দিন কাটছে তোমার? বিশু বিস্মিত হলো।

পুষ্প অন্যদিকে মুখ ফেরাল। তারপর আস্তে আস্তে বলল: বাবা আমার সঙ্গে কথা কয় না। বাড়ীর বাইরে যাবারও হুকুম নেই আমার—

—কিন্তু তোমার দোষ কী। বিশু উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বলল: তিনি তো স্বচক্ষেই দেখেছিলেন, আমিই জোর করে তোমায়···তুমি আমার ঘাড়ে দোষ চাপালে না কেন?

পুষ্প চুপ করে রইল।

—কী হ'লো? কথা বলছো না যে?

—বাবা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল—মুখ না ফিরিয়েই পুষ্প বলল : বলেছিল, তোমায় পুলিশে দেবে—

ব্যাপারটা বিশু অনুমান করে নিল। পুষ্প সেদিন স্বেচ্ছায় বিশুর অপরাধের অংশ গ্রহণ করে নিয়েছিল বলেই, বোধ হয়, মিঃ ঘোষ আর পুলিশ-কেশ আনতে ভরসা করেন নি।

—বাড়ী থেকে তো তোমার বেরুনো বারণ। আজ এলে কী করে? সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছ নাকি?

—যদি তাই হয়? পুষ্প একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল : কী করবে তুমি?

বিশুও হাসল। বলল : তা'হলে, এক্ষুনি একটা বাড়ীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হবে। এ হোষ্টেলে তো আর বৌ নিয়ে থাকতে দেবে না—

—তবু ভাল। পুষ্প একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর মুখ চোখ লাল ক'রে বলে ফেলল : কিন্তু তার আগে, আগের ব্যবস্থাটা করো।

—ব্যবস্থা আমি এই মুহূর্ত্তেই করতে পারি।

—তাহলে তাই করো। আজই একটা Notice দিয়ে দাও Registrar-কে

—Registrar? বিশু আশ্চর্য্য হয়ে বলল : তুমি কি Marriage Registrar-এর কথা বলছো?

—হ্যাঁ! পুষ্প উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠল। বলল : কেন?

—বল কি তুমি? হিঁদুর ছেলে হয়ে বিয়ে করবো খৃষ্টানদের

বাঁধানো খাতায় নাম লিখিয়ে? একটা বিয়ে করবার জন্যে আমায় বলতে হবে,—আমি হিন্দু নই?

পুষ্প এবার রীতিমত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। বলল: কিন্তু তাহলে যে বড্ড দেরী হয়ে যাবে। ভাদ্দর, আশ্বিন, কার্ত্তিক, এ তিন মাসে তো হিন্দুর বিয়ে হয় না।

পুষ্পর উৎকণ্ঠা দেখে বিশু হেসে উঠল! তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে বলল: ওগো না গো না! তোমাকে আমি আর তিন দিনও বাপের বাড়ীতে ফেলে রাখব না। হিঁদু আইনেরও অনেক ফাঁক আছে—

—আঃ,—খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে পুষ্প তাড়াতাড়ি উঠে বসতে গেল।

বিশু তাকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরল। বলল: ঘাবড়াচ্ছ কেন? হোষ্টেলে এখন কেউ নেই, সব অফিস চলে গেছে—

—আঃ,—ওদিকে যে লাঞ্চের দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।—পুষ্প জোর ক'রে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে একেবারে উঠে দাঁড়াল।

—লাঞ্চ? কিসের লাঞ্চ?

—মিঃ রায় যে আজ লাঞ্চ দিচ্ছেন গ্রেট্ ইষ্টার্ণে। সেই সুযোগেই তো তোমার কাছে আস্তে পারলুম—

—শুভেন্দু লাঞ্চ দিচ্ছে? হঠাৎ?

—প্রণতির সঙ্গে ওঁর বিয়ের যে সব ঠিক হয়ে গেল।

—প্রণতি? বিশু অবাক হ'য়ে গেল। বলল: সেই ব্যাটাছেলে-মার্কা বে-প্যাটার্ণ মেয়েটাকে শুভেন্দু বিয়ে করবে?

—হ্যাঁ। আমি আসি, কেমন?

—আঃ দাঁড়াও না। আজ আবার কখন দেখা হবে বলে যাও?

—আজ তো আর হবে না। লাঞ্চ থেকে ফিরেই যে আবার গোকুলনগর রওনা হতে হবে। কালই মিনুদের লোক খাওয়ান কিনা—

—গোকুলনগরে যাবে! বিশু যেন দমে গেল। তারপরই হঠাৎ আবার বলে উঠল: তবে আমিও যাব তোমার সঙ্গে—

—ছি,—বিশুর কপালে হাত বুলোতে বুলোতে পুষ্প বলল: গাড়ীতে বাবা থাকবে, মিঃ রায়ও থাকবেন... তাছাড়া মিনুরা যখন তোমায় নেমন্তন্ন করে নি, তখন তোমার কি সেখানে যাওয়া উচিৎ। লক্ষ্মীটি, তুমি এদিককার ব্যবস্থা করো, আমি ওখানে একদিন থেকেই চলে আসব—

—মশায় এইটেই কি আটাশ নম্বর ঘর? একটি লোক একেবারে ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হ'লো। প্রথম দর্শনেই বোঝা গেল, আগন্তুক একজন খাঁটি পাড়া-গেঁয়ে লোক। গায়ে তার একটি অদ্ভুত দর্শন গলা-বন্ধ আল্‌পাকার কোট; পরণে খাট ঝুলের অতি মলিন থান এবং পায়ে শতচ্ছিন্ন ক্যাম্বিসের জুতো। লোকটি কুঞ্চিত চক্ষে বিশুর দিকে চাইতে চাইতে বলল: তাই তো, বিশু বাবাজী তো বটে!

বিশু আড়ষ্টভাবে একটা প্রণাম করেই রূঢ়স্বরে বলল: তুমি? এখানে হঠাৎ?

পুষ্পর বিস্ময় এবার সঙ্কোচে পরিণত হ'লো। সে তাড়াতাড়ি লোকটির পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

লোকটি বিশুর মেজকাকা রমানাথ বোস। তিনি ভাইপোকে আশীর্ব্বাদ করতে ভুলে গিয়ে তাকিয়ে রইলেন পুষ্পর গমন পথের দিকে। বললেন : মা লক্ষ্মীটি কে বাবাজী?

বিশুও অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল। বলল : মা লক্ষ্মীর কথা থাক, এখন খবর কী বল?

—ওঃ, ঘুরে ঘুরে কী কষ্টে যে তোমার ঠিকানা জোগাড় করেছি তা একমাত্র নারায়ণই জানেন! ভাগ্যিস্, বংশীটার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল—

—আঃ! আসল কথাটা কী বল না? এখানে এসেছ কেন?

—বলছি বাবা। একটু জল খাওয়াতে পারো?

বিশু জল এনে দিল। তারপর বলল : এইবার বল।

—বলছি। ইয়ে, এখানে তামাক-টামাকের ব্যবস্থা নেই বোধহয়·····

—না। সিগারেট হলে চলবে?

—ও সব কি আমাদের পোষায় বাবাজী। রমানাথবাবু ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে বললেন : গলায় ধোঁয়া গেলে টেরই পাই না। তার চেয়ে বরং একটা বিঁড়ি ধরাই, কী বল?

—তাই ধরাও। কিন্তু ব্যাপার কী বল?

—এই যে বলি,—বিঁড়ি ধরিয়ে রমানাথবাবু আরম্ভ করলেন : ভয়ানক ব্যাপার হ'য়েছে বাবাজী! সেদিন তোমার বন্ধুরা তো মোটর হাঁকিয়ে আমাদের পুকুরে মাছ ধরতে গেল; কিন্তু তারা কী করেছে জান?

বিশু একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল। কোন রকমে বলল : কী ?

—অবশ্য, চিঠিতে তুমি তোমার ঘরটাই খুলে দিতে বলেছিলে ; কিন্তু আক্কেলের মাথা খেয়ে আমি তাদের থাকতে দিয়েছিলাম আমারই পশ্চিম্-পোতার নতুন ঘরটায়। তোমার কাকী বললে কি না, বিশু আমাদের সহুরে লোক, তার বন্ধুদের কি ওই পোড়ো ঘরে থাকতে দেওয়া যায়—

—আঃ! বিশু অধৈর্য্য হয়ে বলল : তারা কী করেছে তাই আগে বল না ?

—আরে যাঃ! রমানাথবাবুও এবার বিরক্ত হ'য়ে উঠলেন বললেন : তুমি তো আচ্ছা ব্যস্তবাগীশ হে। আগে সবটা শোন। তোমার বন্ধুরা তো পরের দিনই চলে গেল। তারপর আমি ঘরে ঢুকে কী দেখলাম জান ? হারামজাদারা আমার সমস্ত ঘরটা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে গেছে!...এমন কি, চালের বাতাগুলোর মধ্যেও শাবল চালিয়ে গেছে হে!...শুধু তাই নয় বাবাজী, তোমার রান্নাঘর আর আমার গোয়ালের মাঝখানে যে ছোট পাঁচিলটা ছিল, গত বর্ষায় তার খানিকটা ভেঙ্গে গিয়েছিল ; সেই জায়গাটায়,—কিছু মনে করোনা বাবাজী, তোমরা স্বীকার না করলেও, নারায়ণ জানেন, জায়গাটা আমার—সেইখানে, বল্লভপুরের মোড়লদের কাছ থেকে, নগদ পয়সা খরচ করে, অনেক সাধ্য সাধনা ক'রে, একটা প্রায় দেড় হাত লম্বা ল্যাংড়ার চারা এনে বসিয়েছিলাম। রোজ তার গোড়ায় জল দিতুম, মাটি আঁকড়ে দিতুম, শালারা আমার অমন চারাটা উপড়ে দিয়ে গেছে

হে !···আমি তো প্রথমে বুঝতেই পারিনি। ভেবেছিলুম, এ নিশ্চয়ই আমার কইলে বাছুরটার কাণ্ড। কী করি, দিলুম রাখাল ছোঁড়াটাকে ঘা কতক কষিয়ে। তারপর নজরে পড়ল, উঠোনের যেখানে যত চারা গাছ ছিল, সবগুলোই উপ্‌ড়ে বসানো······

—আমার লেখা সেই চিঠিখানা সঙ্গে আছে নাকি ?—বিশু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

—আছে বইকি বাবাজী। রমানাথবাবু তাড়াতাড়ি একখানা মলিন পোষ্টকার্ড বার ক'রে দিলেন।

বিশুর ধারণা ছিল, গোকুলনগরে থাকতে রমেশদার অনুরোধে সে যে কার্ডখানা লিখেছিল, ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার পূর্ব্বে সেটা সে নিজের হাতেই নষ্ট ক'রে দিয়ে এসেছিল। কিন্তু রমানাথ বাবু যা প্রমাণ বার করলেন তার ওপর আর সন্দেহ করবার কিছু রইল না। লেখাটা তারই নিঃসন্দেহ, তবে ঠিকানাটা অপর হাতের লেখা !

—সেইজন্যেই তো আমি নিজে এলাম বাবাজী। রমানাথ বাবু বলে চলেছিলেন : তুমি একবার নিজে সেখানে চল। গেলেই বুঝতে পারবে, অন্ততপক্ষে পাঁচশো টাকার ক্ষতি তারা আমার করে গেছে।

রমানাথবাবুর সব কথা বিশুর কানে যাচ্ছিল কি না সন্দেহ। সে হঠাৎ বলল : আচ্ছা, তুমি বসো, আমি আসছি···

—সেকি বাবাজী—

—আঃ! বিশু প্রচণ্ডস্বরে ধমক দিল : ভয় পাচ্ছ কেন ? আমি আজই তোমার সঙ্গে বাড়ী যাব। তোমার যা ক্ষতি হয়েছে, সব আমার কাছ থেকেই পাবে।

রাস্তায় বেরিয়ে বিশু একটা ট্যাক্সী ধরল। মাথা ঠাণ্ডা ক'রে কোন কিছু ভাববার মতো ক্ষমতা তখন আর তার ছিল না। সব চিন্তা ছাপিয়ে কেবল একটি মাত্র কথাই তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল ছিল: সে এখন ঘরে-বাইরে শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এদিকে রজত তার পেছনে চর লাগিয়েছে। ওদিকে রমেশদা,—এ ব্যাপারে শুভেন্দুকে জড়াতে তার প্রবৃত্তি হ'লো না,—আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তাকে ফাঁসিয়ে চাকরী ফিরে পাবার জন্যে। রমেশদার ব্যবস্থা সে পরে করবে। কিন্তু তার পূর্ব্বে একবার রজতের সঙ্গে বোঝাপড়া করা দরকার। আজই সে দেশে যাবে। তারপর সেখানকার ব্যাপার দেখে শুনে ফিরবে গোকুলনগরে। কিন্তু খবরটা পুষ্পকে জানিয়ে যাওয়া দরকার। বিশু না যাওয়া পর্য্যন্ত সে যেন গোকুলনগরেই অপেক্ষা করে। তা ছাড়া রজতের সন্দেহের কথাটাও তখন তাকে বলতে ভুল হ'য়ে গিয়েছিল; সে খবরটাও দেওয়া দরকার। দু'দিন পরেই সে যখন তার সহধর্ম্মিনী হবে.........

গ্রেট্ ইষ্টার্ণে পৌঁছে ট্যাক্সী ভাড়া দিতে গিয়ে বিশুর মুখ শুকিয়ে গেল। পকেট একেবারে শূন্য!

—আচ্ছা, তুম্ ঠাড়ো! বিশু অসহায়ের মত একবার চারিদিকে তাকাল; তারপর এগিয়ে চলল।

—আরে বিশ্বাবাবু! হোটেলের ফটকের ওপর যে খসখসের পর্দাটা ঝুলছিল তারই আড়ালে দাঁড়িয়ে পুষ্পদের বৃদ্ধ সোফার রাজারাম কথা কইছিল একটা বয়-এর সঙ্গে। বিশুকে দেখে সে সহাস্যমুখে এগিয়ে এল।

—রাজারাম যে! গোকুলনগর থেকে ফিরলে কবে?—বিশুও একটু ভরসা পেল।

—এই দো-চার রোজ্ হলো। এখুন, আপনার কী খোবর বলুন? দিদিমণীর মোলাকাৎ চাই কী?—রাজারামের হাসিটা রহস্যময় হয়ে উঠল।

বিশুও একটু বিস্মিত হ'লো। তার সঙ্গে পুষ্পর আসল সম্পর্কটা বৃদ্ধ কিছু আন্দাজ্ করতে পেরেছে নাকি? সম্ভবতঃ তাই। নাহলে হোটেলে আসবার পথে পুষ্প তার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পেল কী করে।—সে একটু লজ্জিতভাবেই বলল:একটু খবর দিতে পার কোন রকমে—

—এঁহি বাৎ। রাজারাম তার সঙ্গীর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ ভেতরে ঢুকে গেল। বিশুও একটু সরে গিয়ে দাঁড়াল নিউ-ম্যানের শো-কেসের সুমুখে।

পুষ্প এল মিনিট পাঁচেক পরে। দ্রুতপদে নিকটে এসে সে সক্রোধে বলল: তুমি কি আমার মুখ দেখবারও উপায় রাখবে না—

—আহা, আগেই চটছো কেন। এদিকে যে ভীষণ কাণ্ড হয়েছে…

—ঘোঁড়ার ডিম্ হয়েছে। যেমনি একটু হেসে কথা কয়েছি অমনি… ওদিকে চল…

পুষ্পই এগিয়ে গিয়ে পাশের রাণী মুদিনীর গলিটার ভেতর ঢুকল। বলল: এক্ষুনি হয়তো ওরা উঁকি মারবে। এখন বল, কী তোমার ভীষণ কাণ্ড।

বিশু প্রথমে বলল তার মেজকাকার আবির্ভাবের কারণটা; তারপর রজতের সন্দেহের কথাটাও বলল।

—রজতদা spy লাগিয়েছে তোমার পেছনে?—পুষ্প সত্যই চিন্তিত হ'লো। বলল: আচ্ছা, সে কথা পরে হ'বে। কিন্তু, এখন আর দেশে গিয়ে লাভ কী তোমার? যা হবার তা তো হয়ে গেছে...

—তুমি বল কী। তারা যদি সেখানে একটা রিভল্‌বার পুঁতে রেখে এসে থাকে—

—তাহলে, এ' ক'দিনের মধ্যে আরও একবার সার্চ্চ্‌ হ'য়ে যেত সেখানে।

—কিছু বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আমি একবার ঘুরে আসি। কি বল?

—কিন্তু,...ফিরবে কবে...পুষ্প একটা ঢোক গিলল।

—ওই তো বললাম। বাড়ী থেকে আমি একবারে গোকুলনগরেই যাব। তারপর...

—আচ্ছা। বলেই, পুষ্প তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বিশু একবার ইতস্ততঃ করল, ট্যাক্সী ভাড়াটা পুষ্পর কাছে ধার চাইব নাকি।...কিন্তু, ছি, কী ভাববে পুষ্প। সে আবার সেই ট্যাক্সী চড়েই হোষ্টেলে ফিরল।

তেত্রিশ

রজতের সঙ্গে একবার নির্জ্জনে মিলিত হবার জন্যে পুষ্পর আগ্রহের আর সীমা ছিল না। কিন্তু গোকুলনগরে ফিরে সে সুযোগ সে চট্ করে পেল না। জনার্দ্দনবাবুর মৃত্যুটাকে উপলক্ষ্য ক'রে বাড়ীর সকলে এমনই উৎসব-আনন্দে মেতে উঠেছিল যে, তার মধ্য থেকে রজতকে ডেকে এনে গোপনে কথা কইবার প্রচেষ্টা, শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, অসম্ভব বলেই মনে হলো তার। তাছাড়া, নির্জ্জনে বসে কথা কইবার মতো কোনও স্থানও তার চোখে পড়ল না। বাড়ীরও সর্ব্বত্র কর্ম্মব্যস্ত আত্মীয়-স্বজনের জনতা; বাগানের মধ্যেও একদল মজুর ছড়িয়ে পড়ে আগাছা সাফ্ করছিল আগামী দিনের কাঙ্গালী ভোজনের জন্য।— কিন্তু, বিশুর সম্বন্ধে রজতের সঙ্গে একবার পরামর্শ করা যে তার নিতান্তই প্রয়োজন!

—মেম্ সাহেব, ভাল আছেন। কুশল প্রশ্ন করল গোবিন্দপুরের সেই শিখ্ ট্যাক্সী ড্রাইভারটা।

লোকটাকে দেখে পুষ্প যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করল। বলল: তুমি এখানে যে?

—বাবুদের সঙ্গে আমার দিন রাতের চুক্তি হ'য়েছে। হর্‌ঘড়ি াকজন আসছে কি না—

—ওঃ।

পুষ্প ঘুরতে ঘুরতে বাগানের দিকেই অগ্রসর হ'লো। শুধু মনের ৎকণ্ঠাই নয়, দীর্ঘ মোটর ভ্রমণের ফলে শরীরও তার অত্যন্ত ক্লান্ত 'য়ে পড়ছিল। এ অবস্থায় ভাল ক'রে একবার গা ধুতে পারলে, সে কটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারতো। কিন্তু কর্ম্মবাড়ীর ভিড়ের মধ্যে দ সম্ভাবনা নেই। অগত্যা, একটু বিশ্রামের আশায় সে একটা বেঞ্চ দখতে পেয়ে বসে পড়ল।

অদূরে লণ্ঠন জ্বেলে একজোড়া সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ জমি সাফ্‌ রছিল। তাদের কাছে কাছে একটি দামাল শিশুও ঘুর ঘুর ক'রে বড়াচ্ছিল। খোকাটা বোধ হয় ওদেরই। ওরা বোধহয় স্বামী স্ত্রী। পুষ্প বসে বসে তাদের কাজ দেখতে লাগল।

এরা স্বামী স্ত্রী খেটে খায়। পরিশ্রমের তুলনায় অবশ্যই এরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না। তবুও কত সুখী এরা। কর্ম্মব্যস্ত নীরস জীবনের আড়ালে এদের আরও একটা রূপ, আরও একটা পরিচয় আছে। সেখানে ওই সন্তানটিকে ঘিরে ওরা প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করে জীবন ধারণের সার্থকতা, উপভোগ করে সৃষ্টির আনন্দ,—রচনা ক'রে স্বর্গ......তার নাম সংসার......

সংসার একদিন তার নিজেরও হ'বে। কিন্তু কী আশ্চর্য্য। রজত রায়ের হাতে গড়া মেয়ে সে, অগ্নিমন্ত্রের উপাসিকা, সে যে কোনদিন কাউকে বিয়ে ক'রে তার খোকা-খুকুদের মা হবে,—এ কথা সে

নিজে কোনদিন কল্পনা করতে পেরেছিলো! অথচ তার জীবনের এ রূপান্তর আর সম্ভাবনার অপেক্ষা রাখে না; এ অবশ্যম্ভাবী।... অদৃষ্টের এই অভাবনীয় পরিণতির চিন্তা রোমাঞ্চিত ক'রে তুলল তাকে। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল ছোট একটি সংসারের মধ্যে গৃহিণীর বিরাট গাম্ভীর্য্য নিয়ে সে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, আর তার পেছনে পেছনে অসন্তুষ্ট মুখে, খুঁত খুঁত করে বেড়াচ্ছে গৌরবর্ণের একটি দামাল শিশু।—মাথায় তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। ফুলো ফুলো ঠোঁট দুটি তার রাঙ্গা টুকটুকে। ডাগর ডাগর চোখ দুটিতে তার দুষ্টুমীর বিদ্যুৎ। পুষ্প যেন তাকে ধমক দিয়ে বলল: দুষ্টুমী করোনা খোকা! সঙ্গে সঙ্গে খোকনও অমনি পা ছড়িয়ে বসে কেঁদে উঠল তীক্ষ্ণ

কান্নার শব্দে পুষ্প যেন ফিরে তাকায়। কিন্তু একি! এতো তার খোকন নয়।...এযে ক্ষুদ্র শিশুর স্থান অধিকার করেছে তারই সৃষ্টিকর্ত্তা...

অনুকম্পা এসে মিতালী পাতায় বাৎসল্যের সঙ্গে। পুষ্পও দিশেহারা হ'য়ে যায়, কিন্তু রাগ করতে পারে না। জন্মান্তরের পুঞ্জিত অভিমান নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এ পাগল! এর ওপর কি রাগ করা যায়! শিশু যুক্তি বোঝে না কিন্তু ধমক শোনে। কিন্তু এ যে যুক্তিও বোঝে না, ধমকও শোনে না! অথচ মেজাজটি আছে ষোল আনার ওপর আঠার আনা। ছোট্ট একটা ঘটনাও মনে পড়ে যায় তার! গোবিন্দপুর ডাক্-বাংলোয় বসে হঠাৎ সে একবার রজতদার নামটা মুখে এনে ফেলেছিল। বিশু তখন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছিল;

কিন্তু নামটা শুনেই যেন একেবারে ক্ষেপে গেল। তার অনুযোগ : রজতের পাল্লায় পড়েছিল বলেই আজ তার নিশ্চিন্ত হয়ে কিছু করবার উপায় নেই, সংসার পাতা তো দূরের কথা। শুনে পুষ্পও হেসে উঠে বলেছিল : তুমি তো আচ্ছা হিংসুটে! রজতদার নামটাও আজ সহ্য করতে পারছো না; কিন্তু তার পাল্লায় না পড়লে আজ আমাকে কোত্থেকে পেতে শুনি? উত্তরে বিশু সগর্জ্জনে বলেছিল :.......

—তোমার যন্তরটা আমাকে দাও।

পুষ্প ভীষণ ভাবে চমকে উঠল। সন্ধ্যা বহুক্ষণ পূর্ব্বেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু আবছা অন্ধকারের মধ্যেও লোকটিকে চিনতে তার কষ্ট হলো না।

রজত আবার বলল : তোমার যন্তরটা ফেরত চাই আমি।

—কেন রজতদা? পুষ্প বিমূঢ়ভাবে বলল : কী হয়েছে?

—জানবার দরকার নেই। রজত অবিচলিত স্বরেই বলল।

পুষ্প এবার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। একটু রাগও হ'লো তার। ইতিমধ্যে এমন কী ঘটল যার জন্যে রজত তার প্রতি আজ এত বিরূপ! বলল : ওটা যদি ফেরতই নেবে,—দিয়েছিল কেন? বিপদের দিনে আত্মহত্যা করবো কি করে?

—আত্মহত্যা করবে! রজত চিবিয়ে চিবিয়ে বলল : কী দুঃখে? তুমি মরলে বিশুকে দেখবে কে?

ব্যাপারটা এতক্ষণ পরে বোঝা গেল। সম্ভবতঃ শুভেন্দুর কাছ থেকে তাদের বাক্‌দানের খবরটা শুনেই রজত তাকে অপমান করতে এসেছে। কিন্তু পুষ্প যদি কাউকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হ'য়েই থাকে,

তার জন্যে রজতের এত গায়ের জ্বালা কেন। সঙ্ঘে যোগ দিয়েছে বলে তার কি বিবাহ করবারও অধিকার নেই? সভ্যারা কি দলপতির ক্রীতদাসী?

কিন্তু রজতকে উত্তেজিত ক'রে তার অধিকারের সীমা সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করবারও উপযুক্ত সময় এটা নয়। পুষ্প তাকে ঠাণ্ডা করবার উদ্দেশ্যই বলল: এতদিন পরে আমাকে ভুল বুঝলে রজতদা।

—না। এতদিন পরে ভুল ভাঙ্গল আমার। তুমি নিতান্তই একটা সাধারণ মেয়ে। সুতরাং প্রেমে পড়াই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক।

প্রেম! বিশুর মতো একটা অপদার্থকে সে ভালবেসেছে! এই কথা বলে রজত তাকে অপমান করতে চায়? রজতেরই হাতে-গড়া মেয়ে সে, সে তাকে চেনে না? পুষ্প তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। কিন্তু প্রতিবাদ করতেও সাহস করলো না। মুহূর্তের একটা ভুলের জন্যে, সে যে আজ কতবড় শাস্তি গ্রহণ করতে উদ্যত হ'য়েছে, সে দুঃখের কথা রজত কী বুঝবে!

পুষ্পর চাঞ্চল্যটা রজতও লক্ষ্য করল। তবুও বলল: মেয়ে হ'য়ে জন্মেছ যখন প্রেমে তো তখন তোমায় পড়তেই হবে! এবং প্রেমাস্পদটি যত নিম্নস্তরের লম্পটই হোক না কেন—

—লম্পট! পুষ্প এবার আর চুপ করে থাকতে পারল না। উত্তেজিতস্বরে বলল: বিশুবাবুর মতো লোক লম্পট? কথাটা বলতে মুখে আটকাল না তোমার? এত ছোট হয়ে গেছ তুমি? অথচ, তুমিই সকলের চাইতে ভাল করে জান, এ কথা কতবড় মিথ্যে!

—কথাটা যে কতবড় সত্যি সেটা আমার চাইতেও ভাল করে জানে, আরও দুজন লোক।

রজতের অবিচলিত ভাব দেখে পুষ্প বিস্মিত যত না হলো বিচলিত হ'লো তার চাইতেও বেশী। হঠাৎ বুকের ভেতরটা তার কেমন যেন ক'রে উঠল। সে সভয়ে রজতের একটা হাত মুঠো করে ধরে বলল: তুমি রাগ করোনা রজতদা। কী হয়েছে বল, আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না···

—কিন্তু ছোটলোকের কথায় কি বিশ্বাস করতে পারবে!—হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে রজত বলল্‌: তার চাইতে যথা সময়, সাক্ষীর মুখেই সব শুনো—

এ ইঙ্গিতের অর্থ সুস্পষ্ট। স্খলিতস্বরে পুষ্প আবার বলল: তোমার পায় পড়ি রজতদা, বল তুমি বল, কী করেছে সে?

—তা হয় না। traitor-এর সহধর্ম্মিনীকে সে কথা বলা যায় না।

—রজতদা! পুষ্পর চোখে এবার জল এল। রুদ্ধকণ্ঠে বলল: তুমি...তুমি এই কথা বলতে পারলে আমাকে?...তুমি...তুমি...

এইবার মুস্কিলে পড়ল রজত। নির্ব্বিকারচিত্তে পুষ্পর মতো মেয়ের কান্না সহ্য করবার মতো স্নায়ুর দৃঢ়তা তার ছিল না।

পুষ্প আবার বলল: তুমি···বলতে পারলে আমাকে এই কথা···

কঠিন পাষাণের চিড়-খাওয়া অভ্যন্তরে, প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের মুখাপেক্ষী ক্ষয়িষ্ণু তুষার স্তূপের মতো যে বিরাট বাসনা এতদিন সুপ্ত ছিল রজতের মনের গহনে, সেটা শুধু সাময়িকভাবে জমাট বেঁধে গিয়েছিল পুষ্পর জীবনে বিশুর একাধিপত্যের ঈর্ষায়। কিন্তু কল্পনার

তীব্র সংঘাতে সেটা হিংসার স্ফুলিঙ্গ ছড়ালেও, তার যে আর একটা দিক ছিল, পুষ্প সেইখানেই ঘা মারল। সে পুষ্পর সব অপরাধ বিস্মৃত হ'লো। এমন কি, সঙ্ঘগুরুর মন্ত্রগুপ্তি ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠাও তার ভেসে গেল। সে তখন চরের মুখে শোনা বিশুর বন্দনা-বিলাসের কথাটা সবিস্তারে বর্ণনা করল।

— কিন্তু,—একটু কুণ্ঠিতভাবেই পুষ্প বলল : হয়তো তিনি কাগজ-পত্র সরাবার জন্যেই ঢুকেছিলেন।

—না, শুভেন্দু তাহলে তাকে খিড়কীর দরজা দিয়ে লুকিয়ে বার ক'রে দিত না।

সংবাদটা অদ্ভুত! পুষ্প সবিস্ময়ে বলল : মিঃ রায় তাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলেন? কেন?

—এই সামান্য কথাটাও বুঝতে পারলে না? বন্দনা বিশুকে পুলিশে দেবার মৎলব করেছিল। কিন্তু কোর্টে কেস্ উঠ্‌লে, বন্দনার চরিত্রের কথাটাও তো আর চাপা থাকত না। তাই, বন্দনাকে বাঁচাবার জন্যেই বিশুকে সরিয়ে দিয়েছিল শুভেন্দু।

—তা হবে। কিন্তু, শুধু এইটুকুর উপর নির্ভর করেই তুমি তার পেছনে spy লাগালে!

পুষ্পর কথার ভঙ্গিতে রজত আবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। বলল : তার পেছনে চর্ লাগিয়েছিলাম বলেই তো আমার সন্দেহ আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। শুনবে তোমার বিশুবাবুর কীর্ত্তি? শুভেন্দু তাকে পালবার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু সে পালাতে চায় নি। শুভেন্দুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলেছিল : আমি পালাতে চাই না আমার জেলই ভাল।—

এ সব কথার মানে বোঝো?—রাজার সাক্ষী হয়ে, দিন কতক জেল খেটেই সে প্রাণে বাঁচতে চায়!

খবরটা যতই অবাঞ্ছিত হোক না কেন, পুষ্পর দৃঢ় ধারণা জন্মাল, ব্যাপারটার মধ্যে কিছু গোলযোগ অবশ্যই আছে। বলল: ঘটনাটা তো ঘটেছে মাত্র কাল রাত্তিরে। এর মধ্যে এত খবর তুমি পেলে কী করে?

রজত এবার চাপাগলায় গর্জ্জন করে উঠল: আমার চরেরা গ্রেট ইষ্টার্ণে লাঞ্চ খেয়ে সময় নষ্ট করে না। তোমার আগেই তারা এখানে এসে পৌঁচেছে। তোমার বিশুবাবুর বড় বুদ্ধি না? তিনি ভেবেছিলেন, কেবল মণ্টুই বুঝি তার ওপর নজর রেখেছিল। কিন্তু গণেশ যে বন্দনার বাড়ীর পেছনে ওৎ পেতে বসেছিল······

—আমায় ক্ষমা করো রজতদা!—রজতের মেজাজ দেখে তাকে স্পষ্ট ভাষায় ভ্রান্ত বলতে পুষ্পর সাহস হ'লো না। একটু ইতস্ততঃ করে, সঙ্কুচিতভাবে সে বলল: ভুল তো মানুষ মাত্রেরই হয়···

—হুম্। রজত মিনিট খানেক চুপ করে রইল। তারপর বলল: আচ্ছা, তোমার এবারকার অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম। কিন্তু···ও লোকটার বাইরের জৌলুস্ দেখে একবার যখন তুমি ভুল করেছ, তখন আবার যে করবে না, তার প্রমাণ কী?—সে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

কিন্তু পুষ্প একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। তার বক্তব্যকে এমনই উল্টো করে বুঝলো রজত!

—হুম্। তোমাকে বাঁচাতে হলে তাকে সরানো দরকার। আচ্ছা তুমি ভেব না, আমি নিজেই তার ব্যবস্থা করছি।—পুষ্পকে ভরসা দিয়ে রজত প্রস্থান করল।

ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পুষ্পর একটুও বিলম্ব হ'লোনা। সে একবার শিউরে উঠল। তারপর উঠে বাড়ীর দিকে চলল তাড়াতাড়ি।

রজতের মনের ভাব সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে। পুষ্পর প্রেমাস্পদকে সে কিছুতেই সহ্য করবে না। এমন কি তার মুক্তি-সঙ্ঘের নিরাপত্তাকে পণ্য করেও সে তার হিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবেই! কিন্তু বিশুকে বাঁচাবার উপায় কী! তার জীবনের মেয়াদের সঙ্গে পুষ্পর ভবিষ্যৎ যে একান্তভাবেই জড়িত!......অন্ততঃ সাতটা দিনের জন্যও তাকে রজতের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে হবে। নাহলে,—নিজের সমাধি নিজের হাতেই রচনা করতে হ'বে পুষ্পকে।

কিন্তু বিশুকে সাবধান করবে সে কেমন করে? তার দেশের বাড়ীর ঠিকানা সে সঠিক অবগত নয়! সে শুধু জানে, আজই রাত্রিতে কোন সময় বাগেরহাট ষ্টেশনে নেমে বিশু ষ্টীমার ধরবে। সুতরাং এই সুযোগটি যদি সে কোনও রকমে গ্রহণ করতে পারে তবেই রক্ষা, নাহ'লে সবই বৃথা হবে। কিন্তু এই রাত্রে তার পক্ষে বাগেরহাটে যাওয়া কী করে সম্ভব! অবশ্য রাজারাম মারফৎ সে চিঠি পাঠাতে পারে। কিন্তু গাড়ী বার করতে গেলেই তো প্রশ্ন উঠবে।

চিন্তাক্লিষ্ট মুখে কর্ম্মবাড়ীর ভিড়ের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেই শিখ ট্যাক্সী ড্রাইভারটা! একটু আশার আলো দেখতে পেল সে। লোকটাকে ডেকে, একটু আড়ালে গিয়ে সে বলল: গোটা পঞ্চাশ টাকা রোজগার করবে?

—মেম সাহাব মেহেরবান্—

পুষ্প তার কাজ বুঝিয়ে দিল। লোকটিও সম্মত হ'য়ে বলল: বেশ, দিন চিঠি।

ভরসা পেয়ে পুষ্প তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে। তারপর খোলা দরজাটার দিকে নজর রেখে চিঠি লিখতে বসল। উৎকণ্ঠার আতিশয্যে কলমটা তার থর থর করে কাঁপছিল! তবুও, যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় সে বিশুকে তার বিপদের কথা জানিয়ে পত্র শেষ করল।

থুতু দিয়ে খাম এঁটে পুষ্প অতঃপর স্যুটকেশের মধ্যে হাত চালিয়ে দিল টাকার সন্ধানে। সঙ্গে সঙ্গে একটা নিদারুণ আতঙ্কে বুকের রক্ত তার হিম হয়ে গেল। কাপড় চোপড়ের তলায় টাকাগুলো তার ঠিকই আছে; কিন্তু ওখানে যে আরও একটা জিনিষ থাকবার কথা? সেটা গেল কোথায়?—স্যুটকেশের তালাটাও ভাঙ্গা নয়!. কাগজ কলম বার করবার সময় তাকেও চাবী ব্যবহার করতে হয়েছিল।—তবে?

অবশ্য, স্যুটকেশের চাবী জোগাড় করা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। কিন্তু তাকে ভরসা দিয়েও রজতদা আবার চুরি করল যন্তরটা।

কিন্তু সত্যিই কি একাজ রজতদার?—সাধারণত অস্ত্র তো সে কখনও কাছ ছাড়া করে না! তবে, রজতদা জানল কী করে, রিভল্‌বারটা তার স্যুটকেশেই আছে? পুষ্প ভাববার চেষ্টা করল: এখানে ফিরে সে গা-ধোবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু খিড়্‌কীর ঘাটে যদি কোন সঙ্গিনী জুটে যায়,—এই আশঙ্কায় যন্তরটা সে আগে থাকতেই স্যুট্‌কেসের তলায় রেখে গিয়েছিল। কিন্তু সে সময় ঘরে তো কেউ ছিল না—তবে? অবশ্য পাশের খাটটায় লিলি শুয়েছিল; কিন্তু সে পাগলী তো তখন ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমোচ্ছিল! তবে?

নিজের অসাবধানতার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নিজের হাতের দিকে লক্ষ্য পড়ল তার। সে আরও একবার শিউরে উঠল। এ কী করতে যাচ্ছিল সে? এ চিঠি যদি বিশু ছাড়াও আর কেউ পড়বার সুযোগ পায়! পুষ্প আবার বসে পড়ল। অবশ্য, সাঙ্কেতিক ভাষায় পত্র লেখা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু কথাটা একবার যখন তার মনে পড়েছে তখন সময়-সংক্ষেপের অজুহাতে উপেক্ষা করে কী করে! পূর্ব্ব পত্রখানি ছিঁড়ে ফেলে সে আবার নতুন করে লিখতে আরম্ভ করল।

বক্তব্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তবুও চিঠি শেষ করতে সময় লাগল তার প্রায় ঘণ্টাখানেক। ওদিকে শিখ যুবকটিও চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। পুষ্প নিকটে আসতেই সে উৎকণ্ঠিতভাবে বলল: এত দেরি করলেন? চিঠি এনেছেন নাকি! ট্রেণ ধরতে পারলে হয়—

—এই যে—

যুবক তাড়াতাড়ি পকেটস্থ করল চিঠিখানা। তারপর আর বাক্য ব্যয় না ক'রে গাড়ীতে ষ্টার্ট্ দিয়ে উঠে বসল।

—টাকা নেবে না?

ঝড়্ ঝড়ে গাড়ীর বিকট গর্জ্জনে যুবক পুষ্পর কথাটা শুনতে পেল কি না সন্দেহ! গাড়ী সবেগে বেরিয়ে গেল।

লোকটার হ'লো কী! বকশীসের লোভে তৎপর হয়ে আসল জিনিষটা নিতেই ভুলে গেল! পুষ্প মনে মনে হাসল: এ তৎপরতার কারণ বোধহয় ফিরে এসে ডবল বকশীস্ আদায়ের ফন্দী। তা হোক্, দেবে সে ডবল বকশীস্। লোকটা সত্যিই কাজের লোক; spy হবার

মতো অনেক গুণই আছে লোকটার। সেবারে বিভূতির বাড়ী থেকে খুব চালাকী ক'রে বার করে এনেছিল বিশুকে! বিশু সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হয়েই পুষ্প বাড়ীর দিকে ফিরে চলল।

পথে দেখা হ'লো লিলির সঙ্গে। এবারে এখানে ফেরা অবধি সে একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছে মেয়েটার মধ্যে। সে চাঞ্চল্য নেই, পাগলামী নেই, মেয়েটা যেন অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে উঠেছে এই ক' দিনের মধ্যে। অবশ্য, লিলির বয়সের পক্ষে এই রকম গাম্ভীর্য্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পরিবর্ত্তনটা বড্ড চোখে লাগে যে।

—তোর কী হয়েছে রে লিলি? পুষ্প ডেকে জিজ্ঞাসা করল।

—কী হ'য়েছে! লিলি যেন চম্‌কে উঠে পুষ্পর দিকে তাকাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল: কিছু হয়নি তো।

লিলি প্রস্থানোদ্যত হতেই পুষ্প আবার বলল: রজতদাকে দেখেছিস এদিকে?

—ওই তো বৈঠকখানায় রয়েছে।—লিলি প্রস্থানোদ্যত হ'য়েও আবার ফিরে এল। হঠাৎ বলল: হ্যাঁরে, পুনি আজ কী করছে দেখলি রে? বিয়ের নামে খুব আনন্দ হয়েছে তার, নয়? খুব হাসছে বুঝি?

—হাসবে না তো কি কাঁদবে? প্রণতি তো আর তোর মতো পাগল নয়।—বলতে বলতে পুষ্প বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হ'লো।

বৈঠকখানাতে তখন রজত ও রমেশ চৌধুরী ছাড়া আর কেউ ছিল না। পুষ্প বাইরে থেকে ডাকল: রজতদা, বাবা তোমায় একবার ডাকছে।

—ওঃ! রজত তৎক্ষনাৎ বাইরে এল। রমেশবাবুকে বলে এল: পালাবেন না যেন, এক্ষুনি আসছি।

—তুমি আমার যন্তর চুরি করেছ কেন?—একটু আড়ালে এসে পুষ্প সোজা প্রশ্ন করল: কী তোমার মৎলব?

—তোমার যন্তর!—রজত অভিভূতের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ যেন সচেতন হ'য়ে বলল: হয়েছে......

—কী হ'য়েছে?

—বুঝেছি!—দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রজত মুহূর্ত্তের জন্য কী যেন ভাবল। তারপর বলল: পুষু, রমেশবাবুকে কিছুক্ষণ আট্‌কে রাখতে পার? আমি তাহলে চট্ করে একবার গেষ্ট-হাউস্ থেকে ঘুরে আসি—

—কিন্তু হ'য়েছে কী? পুষ্প সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

—By jove...বুঝতেই পারিনি এতক্ষণ।—কপালের ঘাম্ মুছতে মুছতে রজত সন্ত্রস্তভাবে বলল: লোকটা আমায় নজর-বন্দী করেছে পুষু!......

—সেকি?

—হ্যাঁ...নিশ্চয়ই...শুভেন্দু বেরিয়ে যাবার পর থেকেই ও আমার সঙ্গে গল্প ফেঁদেছে—

—শুভেন্দুও বেরিয়ে গেছে? কখন গেল?—পুষ্পর আতঙ্কের আর সীমা রইল না।

—এই তো মিনিট কুড়ি হ'লো। হঠাৎ দেখলুম, সুকুমারের গাড়ীটা ক'রে বেরিয়ে গেল!...কাজের বাড়ীতে কে কী দরকারে বাইরে যাচ্ছে

তাই, ব্যাপারটা তখন অত খেয়াল করিনি! কিন্তু এখন মনে হ'চ্ছে... যাক্‌গে, তুমি ও লোকটাকে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কয়ে আট্‌কে রাখ, আমি আসছি।

—আর দেখ, কয়েক পা এগিয়ে গিয়েও রজত আবার ফিরে এল। বলল: বৈঠকখানার টেবিলের ওপর একটা ব্র্যাড্‌শ' পড়ে আছে দেখবে,—সেটা কোন রকমে হাত সাফাই করে, আমাকে দিও...

—তুমি কী সব বলছো?—পুষ্প যেন একেবারে দিশেহারা হ'য়ে গিয়েছিল। তার একটু ভরসা হয়েছিল, শুভেন্দু শিখ যুবকটি রওনা হ'বার পূর্ব্বেই প্রস্থান করেছে শুনে। কিন্তু হঠাৎ ব্র্যাড্‌শ'র কথা ওঠে কেন? ভরাডুবি কি আসন্ন! রজতদার মতো লোকও কি তাই আজ এত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে! বলল: শুধু সন্দেহের ওপর নির্ভর করেই তুমি পালাবে রজতদা? তাতে যে ওরা সুবিধেই পাবে—

—তুমি ক্ষেপেছ? অত বোকা আমি নই। তবুও, সাবধান হ'তে দোষ কী! এই ভিড়ের মাঝখানে কে যে মিনুদের আত্মীয় আর কে যে পুলিশের ইন্‌ফর্‌মার আমি ঠিক্ বুঝে উঠতে পারছি না!—আচ্ছা, আমি আসছি টাকাগুলো নিয়ে। তুমি ওদিকে দেখ—

রজত প্রস্থান করবার পর, নিজেকে একটু সামলে নিয়ে পুষ্প বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকল।

কিন্তু ঘরে তখন রমেশবাবুও ছিলেন না, কোন ব্র্যাডশ'ও ছিল না টেবিলের ওপর।

সেই রাত্রেই—

যথা সময়, অর্থাৎ যথা সময়ের প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বিশুর ট্রেণ এসে ষ্টেশনে পৌছল। সুদীর্ঘ ছ' বছর পরে, অতি-পরিচিত এই ষ্টেশনটাতে পা দিয়ে সে যেন কেমন একটা সুড়সুড়ি অনুভব করল সারা অঙ্গে। একই সঙ্গে আশা, আনন্দ আর উৎকণ্ঠার সমন্বয়ে বুকের ভেতরটা যেন তার তোলপাড় করছিল; হৃদ্‌পিণ্ডের গতিও গিয়েছিল বেড়ে; রোমাঞ্চও হচ্ছিল ঘন ঘন।

রমানাথবাবু পোঁট্‌লা পুঁটলি নিয়ে পেছনে আসছিলেন। হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নিদ্রালসকণ্ঠে বললেন: নাঃ, শরীর আর বয় না! খুচরো পয়সা থাকে তো দুটো দাও দেখি বাবাজী। একটু চা খেয়ে নি—

—চা খাবে? বিশু উৎসাহিত হ'য়ে উঠল। বলল: চলো মেজ্‌কা, আমিও আজ চা খাব—

রাত্রি গভীর হলেও ষ্টেশনে যাত্রার ভিড়্‌ বড় অল্প ছিল না। জনতার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে প্ল্যাট্‌ফরমের বাইরে এল। সামনেই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা। রাস্তার অপর দিকে ছিল সারি সারি ছ্যাঁচা-বেড়ার ঘর। এই ঘরের কোনটা বা পাইস্‌-হোটেল, কোনটা বা তথাকথিত রেস্তোঁরা। এমনই একটা চায়ের দোকানের উদ্দেশ্যে বিশু পা বাড়াল—

কিন্তু চা খাওয়া তার হ'লো না। জনতার মধ্যে থেকে হঠাৎ সেই শিখ ড্রাইভারটা এগিয়ে এসে বিশুকে সেলাম করল।

—তুমি সেই কর্তার সিং না? বিশু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল: তুমি এখানে?

কর্ত্তার সিং পুষ্পর চিঠিখানা বার করে দিয়ে বলল : জরুরী চিঠি আছে—

চিঠি গ্রহণ করে বিশু একবার আলোর সন্ধানে চতুর্দ্দিকে তাকাল।

—এদিকে সরে আসুন বিশু বাবু, আমাদের কাছে আলো আছে। কণ্ঠস্বর শুভেন্দুর।

বিশুর হাতের চিঠি হাতেই রইল। স্তম্ভিতবিস্ময়ে এতক্ষণ পরে সে লক্ষ্য করল, শুভেন্দুর অধিনায়কত্বে অসংখ্য রেলওয়ে পুলিশ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিশুকে ফ্যাল্ ফ্যাল করে চেয়ে থাক্‌তে দেখে শুভেন্দু প্রথমে তার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে নিল। তারপর বলল : শেষ পর্য্যন্ত পুষ্পই আপনার সর্ব্বনাশ করলে বিশুবাবু! সে যদি এই চিঠি না পাঠাতো তাহলে পুলিশও কর্ত্তার সিংকে follow করবার সুযোগ পেত না, আর···

—আর?—বিশু আত্মসংবরণ করবার চেষ্টা করছিল। বলল: আর কী হ'য়েছে মিঃ রায়?

—কী হয়েছে বুঝতে পারছেন না?

—রজতবাবু?—বিশু অভ্যাসবশতঃ একবার নিজের তলপেটের ওপর হাত বুলিয়ে নিল। তারপর জড়িতস্বরে বলল : তিনি···তিনিও কি surrender করেছেন?

—সব বলছি। কিন্তু, আপনার বেগর-লাইসেন্সের রিভলভারটা আগে surrender করে ফেলুন দেখি—

—রিভলবার!—বিশু অসহায়ের মতো একবার মাথা নাড়ল কিন্তু গলা দিয়ে তার আর কোন আওয়াজই বেরুল না।

বিশুর দেহ তল্লাসী করবার জন্যে একটি পুলিশ কর্ম্মচারী তাড়াতাড়ি হাত বাড়াল। কিন্তু শুভেন্দু বাধা দিল। বলল: এখন থাক না—

—মশাই, আর কতক্ষণ লাগবে আপনাদের?—পুলিশের পাল্লায় পড়ে ষ্টেশন-মাষ্টার বেচারীও উস্‌খুস্‌ করছিলেন। বললেন: গার্ড যে ওদিকে গালাগালি দিচ্ছে মশাই! গাড়ী ছেড়ে দিতে বলবো?

—আর এক সেকেণ্ড।—ষ্টেশন-মাষ্টারকে ভরসা দিয়ে শুভেন্দু সহকারীকে কী একটা ইঙ্গিত করল।

—মহামান্য সম্রাটের নামে আপনাকে আমি...মন্ত্রপড়ার মত গুণগুণ করে বয়ান্ আউড়ে সহাকারীটি বিশুর হাতে হাত-কড়া পরাতে উদ্যত হ'লো—

—থাক্।—শুভেন্দু আবার নিরস্ত করল সহকারীকে। তারপর বিশুর বাহুমূল ধরে সহাস্যমুখে বলল: আমি থাকতে ভয় কি বিশুবাবু আসুন।

—আপনাকেও কিন্তু,—রমানাথবাবুর উদ্দেশে সহকারীটি বলল: দয়া ক'রে একটু আটক থাকতে হ'বে।

রমানাথবাবু এতক্ষণ বিস্মিত-আতঙ্কে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন; আটক থাকবার প্রস্তাবে হঠাৎ কেঁদে ফেললেন।

অতঃপর বন্দী সম্পর্কিত আনুসঙ্গিক কাজ সারবার জন্যে সকলে স্থানীয় ফাঁড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হ'লো। সেইখানে গিয়েই শুভেন্দু প্রথম পড়ল পুষ্পর লেখা চিঠিখানা। চিঠিতে মামুলী কথায় গুটি কয়েক কুশল প্রশ্ন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পড়ে, শুভেন্দুর মুখ গম্ভীর হলো।

তারপর সহকারীটি এসে যখন সংবাদ দিল, বিশুর কাছে সত্যই কোন রিভলবার নেই, তখন সে রীতিমত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। বলল: something wrong কানাই বাবু! আপনি এদিকে দেখুন, আমি এক্ষুনি চললুম গোকুলনগরে—

—হঠাৎ হলো কী? আসামী তো surrender করেছে—

—কিন্তু evidence কই? শুভেন্দু চঞ্চল হয়ে বলল: কোর্টকে কী বোঝাবেন আপনি?

—এঁ্যা?

—হ্যাঁ। আমি চ'ললুম। আপনি কিন্তু—ওই কর্ত্তার সিং লোকটাকে একটু দেখবেন। ওর আসল পরিচয় বোধ হয় এতক্ষণে ওরা জানতে পেরেছে।

সেই ভোরেই—

গোকুলনগর কর্ম্মবাড়ীর চাঞ্চল্য তখন ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। আগামী দিনের বিরাট কর্ম্মসূচীর কথা ভেবে কর্ম্মীর দল বিশ্রাম গ্রহণ করেছিল কিছুক্ষণের জন্য। অভ্যাগত আত্মীয়-স্বজনেরা তখনও নিদ্রিত। শুধু বিনিদ্র প্রহরীর মতো ঘাঁটি আগলে বেড়াচ্ছিলেন রমেশবাবু আর তাঁর জন ছয়েক ছদ্মবেশী সহকর্ম্মী।

শুভেন্দুর গাড়ীর আওয়াজ শুনেই অন্ধকারের মধ্য থেকে দুটি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে ফটক খুলে দিলেন। ওদিকে, বাগানের দিক থেকে রমেশবাবুও ছুটে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। বললেন O. K.?

—O. K.—গাড়ী থেকে নেমে শুভেন্দু একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। বলল : বিশু আর বিভূতি মুখুজ্জে, দু'জনেই arrested! কিন্তু এদিককার খবর কী? রজত আছে তো? পুষ্প কোথায়?

—সব নজরবন্দীই আছে। তোমার রজত কিন্তু আমাকে শাসিয়েছে—

—সেকি! কোন খোলাখুলি কথা হয়েছে নাকি?

—না। ঘুরিয়ে নাক দেখিয়েছে। ব্যারিষ্টার লোক তো! আইনের মার-প্যাঁচের গল্প আরম্ভ করেছিল। আমাকে জানিয়ে দিয়েছে, Suspended Officer-এর অধিকার কতটুকু। নাকের ওপর Lawlessness দেখেও চুপ ক'রে থাকতে হবে। যদি ভুল ক'রে Law and Order maintain করতে যাই তাহলে Law আমার againstই যাবে—

—তা হোক।—শুভেন্দু যেন একটু বিরক্ত হলো। বলল : তুমি প্ল্যান মতোই কাজ করো—

রমেশবাবু কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ চুপ করে গেলেন। দেখা গেল, বৈঠকখানার দরজা খুলে পুষ্প এসে রোয়াকের ওপর দাঁড়াল।

পুষ্প নীচে নেমে এসেছিল গাড়ীর আওয়াজ শুনেই। এতক্ষণ ধরে সে একটা গর্জ্জনের প্রতিক্ষাতেই মুহূর্ত্ত গুনছিল! রাত্রির গভীরতা যত বাড়ছিল উৎকণ্ঠাও তার তত উৎকট হয়ে উঠছিল। শেষে সত্যই যখন সে একটা মোটরের মেসিন বন্ধ করবার গর্জ্জন শুনতে পেল তখন আর শব্দের পার্থক্য নির্ণয় করবার মতো অবস্থা তার ছিল না,—দুতিয়ালীর সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েই সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল।

আবছা অন্ধকারের মধ্যে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি প্রসারিত করে সে লক্ষ্য করল, উন্মুক্ত ফটকের কাছে আঁধারে গা মিশিয়ে একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে কিন্তু,—ওটা যে সুকুমারের মাষ্টার বুইক!

পুষ্পর বুক্‌খানা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই তার নজর পড়ল রমেশবাবুর দিকে। বৈঠকখানার খোলা দরজার মধ্য দিয়ে কেরোসিন ল্যাম্পের যেটুকু শিখা বাইরে এসে পড়েছিল, তারই মৃদু আলোকে সে দেখতে পেল, শুধু রমেশবাবুই নয়, হাত পনের দূরে শুভেন্দুও দাঁড়িয়ে রয়েছে,—হাতে তার উদ্যত রিভলবার।

—পুষ্প দেবী, একটা দুঃসংবাদ আছে—

কিন্তু রমেশবাবু দুঃসংবাদটা প্রকাশ করবার পূর্ব্বেই আওয়াজ হলো গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম.........

বিকট একটা আর্ত্তনাদ করে শুভেন্দু তৎক্ষণাৎ ভূমি আশ্রয় করল। ফটকের প্রহরী দু'জনের মধ্যে একজন ছুটে গেল তার দিকে; অপরজন দোতলার বারান্দা লক্ষ্য করে গুলী করতে আরম্ভ করল উপর্য্যুপরি। বাগানের দিক থেকেও ছুটে এলেন জন চারেক ছদ্মবেশী গোয়েন্দা। ওদিকে, রমেশবাবুও পুষ্পকে ছেড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারলেন দোতলার সিঁড়ি লক্ষ্য করে।—নিস্তব্ধ পল্লীকে সচকিত করে অকস্মাৎ যেন একটা প্রলয় কাণ্ড সুরু হয়ে গেল। বাড়ীর যে যেখানে ছিল, সকলেই চীৎকার করতে করতে ছুটতে আরম্ভ করল ঘটনাস্থল লক্ষ্য করে।

একটা গুলী শুভেন্দুর জঙ্ঘা ভেদ করে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান তার তখনও নষ্ট হয় নি। অসহ্য যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করেও সে একবার বলল: তোমরা এ কী করছো—ওদিকে যে—

কিন্তু বিচলিত জনতার কানে সে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর পৌঁছল না। তাঁরা সকলে ধরাধরি করে আহতকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন।

—আর ভয় নেই।—জনতার কোলাহলকে ছাপিয়ে রমেশবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল: ভয় নেই, খুনী arrested. কিন্তু শুভেন্দুকে এক্ষুনি হাঁসপাতালে পাঠাতে হবে। মিঃ সেন, শীগগীর চলুন, আপনার গাড়ী বাইরেই আছে—

সুকুমারের গাড়ীটা যেন সঙ্গে সঙ্গেই গর্জ্জন করে উঠল। রমেশবাবুও রিভলবার উদ্যত করলেন—

কিন্তু ঘোঁড়া টেপবার পূর্ব্বেই গাড়ীটা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চৌত্রিশ

বিশুর ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় ব'য়ে গেল। স্থানীয় পুলিশ ও মহকুমা হাকিমের টানা-পোড়েনের মধ্যে পড়ে অবস্থা তার এমনই শোচনীয় হ'য়ে উঠল যে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করবার এতটুকু অবসরও তার মিলল না।

দিন দু'য়েক পরে যদিও বা এসে জেল হাজতে ঢুকল; কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না। আরম্ভ হ'লো গোয়েন্দা-পুঙ্গবদের তৎপরতা। এমন কি—তার কাছ থেকে কথা আদায় করবার উদ্দেশ্যে এক ভদ্রলোক কয়েদী সেজে তার সেলেই বাস করতে আরম্ভ করে দিলেন।

কিন্তু আর সে অসাবধান হলো না। বাঘেরহাট ষ্টেশনে পুলিশকে সে কী কী বলেছিল সঠিক মনে করতে না পারলেও, শুভেন্দু যে তাকে ভড়কে দিয়ে কৌশলেই Surrender করিয়েছিল সে সম্বন্ধে আর তার সন্দেহ ছিল না। তাই, এবার সে একেবারে বোবা সাজল। নিজের বুদ্ধিতে আর সে কিছুই করবে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কী হ'বে তার?

অবশ্য, তার মেজকাকা মুক্তি পেয়ে বাড়ী চলে গেছেন! কিন্তু, ভাইপোর বিপদে সাহায্য করা দূরে থাক্, তিনি যে এখন থেকে সর্ব্বরকমে তার সংশ্রব এড়িয়ে চলবেন, সে প্রামাণ সে গতবারের কারা

বাসের সময়েই পেয়েছিল! অথচ, সেবারের মতো এবারকার ব্যাপারটা মোটেই সরল নয়! তখন ছিল সে অহিংস সত্যাগ্রহী; কিন্তু এখন সে ফাঁসীর আসামী! আজই তার দরকার সত্যকার বন্ধুর,—প্রয়োজন অভিজ্ঞ পরামর্শদাতার। কিন্তু, এ অবস্থায় কে এগিয়ে আসবে তাকে সাহায্য করতে!

সেল্-মেট ভদ্রলোকটি কথা প্রসঙ্গে তাকে জানিয়ে দিয়েছেন: মুক্তি-সঙ্ঘের চুনো-পুঁটী রুই-কাত্‌লা যে যেখানে ছিল, সকলেই ধরা পড়েছে। সুতরাং যাদের জন্যে আজ তার এই অবস্থা তাদের কারুর কাছ থেকেই কোন রকম সাহায্যের আশা আর তার নেই! তাহলে?

লোক চক্ষুর অন্তরালে, এমনি অসহায়ের মতোই সে ফাঁসীর দড়ি গলায় নেবে? দেশের একটা লোকও জানতে পারবেনা—তার এই আত্মত্যাগের আসল কারণ! তাহলে আর তার বোবা সাজার স্বার্থকতা কী!

ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একের অভাব পূর্ণ করতে বহুবার বহুজন এগিয়ে এসেছে। কিন্তু শহীদ বিশেষের আত্মত্যাগের কাহিনীটা দেশের মধ্যে আলোড়ন জাগিয়েছিল বলেই না অনুগামীর সংখ্যা বেড়েছিল! কিন্তু তার ক্ষেত্রে, আত্মত্যাগের আসল রহস্যটা যদি জন-সমাজে প্রচারিত হবার সম্ভাবনাই না রইল তাহলে আর আত্মবিসর্জ্জন করে লাভ কী!

তার শেষ ভরসা ছিল শুভেন্দু। লোকটা নিমকহারাম নয় বলেই কর্ত্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ হলেও অমানুষ সে নয়! স্বেচ্ছায় Surrender করবার পরও সে কারুকে হাত দিতে দেয় নি

তার গায়ে,—হাত-কড়া পরানো তো দূরের কথা! কিন্তু সেও তো আর এল না!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরও দুটো দিন কেটে গেল। তারপর এলেন রমেশবাবু।

রমেশবাবুর ওপর বিশুর একদিন ক্রোধের সীমা ছিল না! কিন্তু বন্দী জীবনের অকথ্য অশান্তির মধ্যে হঠাৎ তাঁর দর্শন পেয়ে অতীতের কথা তার আর কিছুই মনে পড়ল না। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে সে বলে উঠল: এতদিন পরে তোমার সময় হ'লো রমেশদা' ?

বিশুর এ পরিবর্তনটা সম্ভবত রমেশবাবুও আশা করেন নি। তাই প্রথমে তিনি একটু আশ্চর্য্যই হলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার সামলে নিয়ে কুণ্ঠিতভাবে বললেন: কী করি বল্! মর্গ থেকে লাশ বের করে আবার শ্মশানে যেতে হ'লো কিনা—

—শ্মশানে? সেখানে কেন?

—আর কেন! লিলির হেফাজত্ পোহাতে—

—লিলি? সে আবার কী করেছ?

—কী যে করেছে সেইটেই তো বোঝা যাচ্ছে না! আমার ধারণা accident, কিন্তু পুলিশ বলছে আত্মহত্যা—

—আরে যাঃ!—আশ্চর্য্য হওয়ার পরিবর্ত্তে বিশু এবার বিরক্ত হয়ে উঠল। বলল: কী সব বলছো? আত্মহত্যা আবার করলে কে?

রমেশবাবু তখন ব্যাপারটা খুলে বললেন: শুভেন্দু আহত হবার পর তিনি তাড়াতাড়ি ওপরে গিয়ে লিলিকে তার ঘরেই বন্দী করে ফেলেছিলেন। সে ঘর থেকে পালাবার কোন রাস্তাই ছিল না। কিন্তু

শেষে দেখা গেল, বাইরের দিকে একটা বারান্দা ছিল। মেয়েটা সেইখান দিয়ে পালাতে গিয়েই নীচে পড়ে গিয়েছিল।

—কিন্তু সে হঠাৎ শুভেন্দুবাবুর ওপর চট্‌লো কেন ?

—ঠিক্ বোঝা যাচ্ছে না। তবে, মিনতির কথা শুনে মনে হয়, শুভেন্দুর Engagement-এর সঙ্গে এর একটা সম্বন্ধ আছে। মোদ্দা কথা, ব্যাপারটা ভয়ানক গোলমেলে—

—লিলি রিভল্‌বার পেল কোত্থেকে ?

—পুষ্পর স্যুটকেস থেকে। তবে,—রমেশবাবু কুঞ্চিতচক্ষে একটু মুচ্‌কে হাসলেন। বললেন : একথা আর কেউ জানেনা !

—তাহলে তো পুষ্পর Defence-এ একটা ভাল Point আছে—

—নিশ্চয়ই !—রমেশবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন : তার মেয়াদ বড় জোর জেল্ হাজত পর্য্যন্ত—অবশ্য তুই যদি একটু সামলে চলিস্ ! এখন তুই-ই তো তার একমাত্র ভরসা—

—সেকি ! তার অমন জমিদার বাপ্ রয়েছে—

—না। মিঃ ঘোষ তাকে পরিত্যাগ করেছেন !

সেদিন ওই পর্য্যন্ত। এর পর রমেশবাবু উপর্য্যুপরি আরও তিনদিন তার সঙ্গে সাক্ষ্যাৎ করলেন। তারপর বিশুও আশ্বস্ত হয়ে ঘুমোতে আরম্ভ করল।

বিশুর নিশ্চিন্ত নিদ্রা দেখে একটা সাড়া পড়ে গেল জেল্-হাজতের মধ্যে। অনেকে অনেক কথাই বলতে আরম্ভ করল। বিশুর কানেও ভেসে এল আলোচনার দু' একটা টুকরো। শেষে, এই আলোচনার

জোর একদিন এমনই চরমে উঠল যে বিশুর ঘুম সত্যই একেবারে ভেঙ্গে গেল।

সেদিনটা ছিল, মামলা শোনানীর দিন। বিশুর নিদ্রার ঘোর তখনও কাটেনি! সে একবার বেলার দিকে চেয়ে নিয়েই আবার পাশ ফিরে শুলো! সেই অবস্থাতেই সে শুনতে পেল বড় দারোগার কণ্ঠস্বর: ব্যাটাচ্ছেলে কুম্ভকর্ণের কেউ হয় নাকি হে? উফ্...

—আচ্ছা স্যার।—সঙ্গের সহকারীটি প্রশ্ন করলেন: পুলিশ হ'লে কি ভদ্রলোক হতে নেই?

—তার মানে?

—আপনি যাকে ব্যাটাচ্ছেলে বললেন, তিনি শুধু একজন শিক্ষিত ভদ্র সন্তানই নন্,—এই পরাধীন দেশের একজন সত্যকার সু-সন্তান। উনি আপনার-আমার মতো ইংরেজের চাকর নন্ বলেই কি আপনার এত গায়ের জ্বালা?

সহকারীর স্পর্দ্ধা দেখে দারোগা সাহেব সম্ভবতঃ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মিনিট খানেক পরেই সশব্দে হেসে উঠলেন। বললেন: Superior Officerকে সম্মান করতে না পারো,—অন্ততঃ তার বয়সটাকে একটুখানি ইয়ে করে চলো!...আমরা যে অনেক দেখেছি হে! আমি ওকে ব্যাটাচ্ছেলে বলেছি, কিন্তু দুদিন পরে দেশের লোকে যে ওকে হারামজাদা বলবে! তখন তুমি চোখ রাঙ্গাবে-কার ওপর?

এইবার সহকারীটি বললেন: তার মানে?

—বাপু হে, তোমার মতো বয়সে আমরাও একদিন স্বদেশীর নামে

গদ-গদ হয়ে পড়তাম! কিন্তু ফাঁকা আওয়াজ শুনে গলে পড়বার মতো অর্ব্বাচীন আমরা ছিলাম না। যুগান্তর-দলের নাম শুনেছ কখনও? বাঘা-যতীন কে ছিল জান?—আমরা কানাই-সত্যেনকেও দেখেছি, নরেন গোঁসাইকেও দেখেছি,—বুঝলে?

—আপনি তাহলে বলতে চান, এঁরা……

—এঁরা নয়, শুধু ইনি। রমেশ চৌধুরী এত ঘন ঘন এখানে আসে কেন সে খবর রাখ? যাকৃগে, এখন তোমার হিরোটিকে ডেকে বলো যে, আর ঘুমলে চলবে না। আজ একবার দয়া করে কোর্টে যেতে হ'বে—

ফলে,—বিশু শুধু রমেশবাবুকেই বিপন্ন করল না,—পুষ্পরও সর্ব্বনাশ করল।

তারপর—

সুদীর্ঘ এগার বছর পরে আবার এ কাহিনীর যবনিকা উঠল।

……এ দেশের শাসক-শাসিতের সংগ্রামে শেষ পর্য্যন্ত শাসকদেরকেই নতি স্বীকার করতে হ'লো! কোন নিগূঢ় কারণে বাধ্য হয়ে আপাততঃ ক্ষমতা হস্তান্তরে সম্মত হলো তারা!—কিন্তু পাকিস্থানের ভিত্তিতে।

আরম্ভ হলো প্রত্যক্ষ ক্রীয়া। মাতৃভূমির স্বাধীনতাকামীদের স্বপ্ন, পুণ্যভূমি-প্রতিষ্ঠা-বিলাসীদের সহিংস সংগ্রামে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে

গেল। ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কৃতির ঐতিহ্য তলিয়ে গেল বিস্মৃতির অতলে। সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলো প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের জের। অহিংসপন্থী-স্বাধীনতাকামীদের সার্দ্ধ-শতাব্দীকালের আত্ম-ত্যাগের শেষ পরিণাম! গুটি কয়েক রাজনীতিজ্ঞর ঠাণ্ডা মাথার ধ্যান-ধারণাকে সার্থক করে তুলল লক্ষ লক্ষ ভারতীয় আত্মবলি দিয়ে। দ্বিখণ্ডিত হিন্দুস্থানের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্যে অসংখ্য লোককে বাধ্য করা হ'লো ভিক্ষুকের জীবন গ্রহণ করতে।। অসংখ্য লোক হন্যে-কুকুরের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করল চৌদ্দ-পুরুষের পৈত্রিক ভিটে ত্যাগ করতে বাধ্য হ'য়ে সর্ব্বোপরি,—এই প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের স্বরূপ বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হ'লো এ দেশের নারী সমাজ! অভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এঁরা হয়তো শুধুই অবলা; কিন্তু ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে কল্পনাতীত কাল থেকে এঁরা শক্তির অংশরূপেই পূজনীয়া। তাই, আধুনিক ইণ্ডিয়ার রাজনীতির কবলে পড়ে এঁরা পশুর মর্য্যাদাও পেলেন না—

হত্যা নয়—বলাৎকার—

পুণ্যভূমি প্রতিষ্ঠার জন্যই এই লড়াই। তাই, পুণ্যাত্মা সৈনিকদের প্রচণ্ড শক্তির প্রথম পরিচয় পেল তাদেরই মা-বোনেরা!

প্রাণ দিয়ে নয়—দেহ দিয়ে—

স্বজাতির স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে যে সব মহাপুরুষ জাতিকে ভ্রাতৃ-হত্যার নির্দ্দেশ দিলেন, মনুষ্যত্বকে এড়িয়ে যাবার দূরদর্শিতা তাঁদের সত্যিই ছিল। মনের অগোচরে পাপ নেই! তাই তাঁরা স্থির করলেন, জাতির কল্যাণ-কামনার সদিচ্ছাটা যখন ধার করা তখন, যুদ্ধ জয়ের

পদ্ধতিটাও ধার করা হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ঘটল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধশ্রান্ত পৃথিবী যখন জগৎকে নিত্য-নতুন শান্তির বাণী শোনাতে আরম্ভ করল, সেই সুসময়ে, ভারতবর্ষের কয়েকজন বিরাট ব্যক্তি আবার নতুন করে মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করলেন,—বর্ব্বরতার মাপকাঠিতে। পৃথিবীর সমস্ত জাতি সর্ব্বকালেই যাকে মহাপাপ বলে ঘৃণা ক'রে এসেছে, তাকে যুদ্ধজয়ের একটা প্রধান অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগাবার জন্তেই যেন তৈরি করবার প্রয়োজন হ'লো,—আধুনিক ইণ্ডিয়াতে এক অতি-আধুনিক জাতির। এঁদের ভরসা শুধু অতীতের ইতিহাস। সার্দ্ধ-সহস্র বৎসরকাল পূর্ব্বে একদল গরুকে হত্যা করবার আশঙ্কায় একদিন যারা পরাধীনতা মাথা পেতে নিয়েছিল, তাদের অধুনা উন্নত মাথাগুলোকে আবার নীচু করে দেবার জন্তে বেশী মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয় না; তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আসল গলদ আবিষ্কার করতেও দেরি হয় না বেশী! সুতরাং ফল ফলল—

বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল।

তারপর আরম্ভ হ'লো যজ্ঞ শেষের শান্তিজল সিঞ্চন। অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবার সঙ্কল্প গ্রহণ ক'রে যে সব বীর পুরুষ যত বেশী শৌর্য্য প্রকাশ করেছিলেন অতীতে, তাঁরাই তত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করলেন,—নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, এই মহাজন বাক্যের গূঢ় রহস্য! ফলে, প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের রহস্যময় রণক্ষেত্র থেকে রক্তাপ্লুত দেহে যে বস্তুটা উঠে এল, সেটা যে আসলে কী, সে চিন্তা করবার অবসরও আর তাঁদের রইল না! গুপ্ত হত্যার গলিত শবের

ওপর দাঁড়িয়ে আনন্দে নৃত্য করে উঠলেন তাঁরা,—মনস্কামনা তাঁদের পূর্ণ হয়েছে!

অতঃপর দেখা গেল, আধুনিক রঙ্গমঞ্চের অতি-আধুনিক নাটকের শেষ দৃশ্যের মতো একটা অপ্রত্যাশিত মিলন দৃশ্য। যে অভিনেতারা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও ছিলেন পরস্পরের পরম শত্রু, নাট্যকারের কলমের একটি মাত্র খোঁচায়, পর মুহূর্ত্তেই হ'লেন তাঁরা বিশ্বস্ত বন্ধু, ভাই ভাই!

কিন্তু এ অভিনয় আর কতদিন চলবে?—জেল হাঁসপাতালের ছোট্ট শয্যাটির মধ্যে কুঁকড়ে শুয়ে রঞ্জত যেন একটা অদ্ভুত জ্বালা অনুভব করে! যন্ত্রণার কারণ, তার অন্তর্গত ব্যাধির প্রকোপ নয়, বন্দীদশার জ্বালা।—

অবশ্য মুক্তি তার করতলগত। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সে এই অতিখ্যাত সেণ্ট্রাল জেলের বাইরে পা দেবে। কিন্তু যে গবর্ণমেণ্টের কৃপায় এই অসম্ভব সম্ভব হতে চলেছে, তাঁদের প্রতি এতটুকুও কৃতজ্ঞতা বোধ করে না সে। সে শুধু গণনা করে মুহূর্ত্ত।

মুক্তির পরম-মুহূর্ত্ত থেকেই সে ব্রত গ্রহণ করবে শান্তি-বিধাতার! ডোমিনিয়ান গবর্ণমেণ্টের কর্ণধারগণ যদি দুষ্টের দমনে অক্ষম হ'য়ে, করদাতাদেরকে শুধু শিষ্টের মতো প্রহার হজম করবারই পরামর্শ দেন, তাহলে তাঁদেরকে বিদায় নিতে বাধ্য করতে হবে। আর সংস্কার নয়, এবার প্রয়োজন সংহারের! ধর্ম্মকে ত্যাগ ক'রে যারা একদিন সংস্কারকে বড় করেছিল; আধ্যাত্মিকতার বিকৃত ব্যাখ্যা ক'রে যারা একদিন এ-দেশটাকে পরিণত করেছিল ক্লীবের রাজত্বে, তাদের মহা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভারতবর্ষ বহু শত-বছর ধরে করেছে। কিন্তু আর নয়! অখণ্ড ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করে যেটুকু আজ মিলেছে তাকে

রক্ষা করবার জন্যে অস্ত্র ধরতে হবে নির্মম হাতে! ক্লীবের বংশকে ধ্বংস করতে হ'বে নিঃশেষে! তাকে আবার দল গড়তে হবে…

—আজ কেমন আছেন ক্যাপ্টেন রয়?—ডাক্তারবাবু সহাস্যমুখে বেডের ধারে এসে দাঁড়ালেন।

রজতও হাসল। বলল: যেটুকু খারাপ আছি, মুক্তি পেলেই সেটুকু ঠিক হয়ে যবে।

—যবে যান, আজ শেষবারের মতো একটু বেড়িয়ে আসুন।—ডাক্তার বাবু মুচকে হেসে আর একটা বেডের দিকে এগিয়ে গেলেন।

রজতও একটু আশ্চর্য্য হ'লো। জেল-হাঁসপাতালের রোগীদের বেড়াবার সময় এটা নয়। সাধারণত সকাল-সন্ধ্যায় ঘণ্টাখানেকের জন্যে বেড়াবার অনুমতি তারা পায়। কিন্তু, এই ভরা দুপুরে হঠাৎ আজ তার ভাগ্যে ব্যতিক্রম ঘটল কেন! একি আসন্ন মুক্তির পূর্ব্বভাষ? কিন্তু তারও তো এখনও দেরী আছে কয়েক ঘণ্টা। তবে? বাইরের জগতের মতো জেল্-এর কর্ত্তারাও কি শেষে Lawlessness-টাকেই Law-এ দাঁড় করালেন নাকি!

—Congratulation! অদূরস্থ সাব-জেলারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল শুভেন্দু! বলল: সুসংবাদ আছে—

—তাই তো বলি, হঠাৎ এ Lawlessness কেন!—রজত মাথা নেড়ে বলল: কিন্তু সত্যি করে বলতো ব্রাদার, এত ঘন ঘন এখানে আগমন হচ্ছে কেন? Criminal-টি কি খুব উচ্চ মার্গের?

—Exactly! আজ একমাস ধরে ক্রমাগত চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুই বার করতে পারলুম না!

—প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের কোন সেনাপতি নাকি? আছেন কোথায়?

শুভেন্দু প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিল না। বলল: আছেন চুয়াল্লিশ ডিগ্রীতে।

রজত অদূরস্থ বিরাট ব্রকটির দিকে তাকাল। এই সেই অতিখ্যাত চুয়াল্লিশ ডিগ্রী! এই খানেই একদিন শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন। আরও ছিলেন কত বিপ্লবী। এঁদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে নেই, তাঁদের নাম ক'রে দেশের কোন কোন দল আজ উৎসব করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁরা বেঁচে আছেন আজও, তাঁদের নাম কেউ করছে না। এক্ষেত্রেও সেই নিয়মতান্ত্রিকতা! দেশের লোকের পূজা পাবার জন্যে এঁদেরকে এখন থেকে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকতে হবে।

মৃত্যু! অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ!

—কী রে, হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেলি যে?

—ভাবছি একজনের কথা! আচ্ছা বলতে পারিস, উল্লাসকর দত্ত এখন কেমন আছেন? মাথার অসুখ সেরেছে তাঁর?

—কে জানে!—শুভেন্দু তাচ্ছিল্যভরে কথাটা এড়িয়ে গেল। তার পরই আবার উৎসাহভরে বলল: ও সব বাজে কথা থাক্, এখন যা বলতে এসেছি শোন! তোকে Receive করবার জন্যে এখন থেকেই লোক জমতে আরম্ভ করেছে। প্রসেশানটা বেশ বড় হবে বলেই মনে হচ্ছে।

—স্বাভাবিক!—রজত একটু হাসবার চেষ্টা করল। বলল: আমি যে দেশের বাইরে ছিলাম। বিলেত-ফেরৎ-দের মতো আমার গায়েও যে বিদেশের ছাপ রয়েছে......বলেই সে হঠাৎ থেমে গেল।

হঠাৎ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটি কয়েদী।

বন্দী-নিবাসের অবাঞ্ছিত আব-হাওয়ার ওপর কর্তৃপক্ষের প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা বহুকালের। ফলে,—অন্যান্য অনেক কিছুর মতো জেল্ গণ্ডীর স্থানে-অস্থানে অনেক ছোট-খাট-মাঝারি সাইজের ফুল বাগানের সৃষ্টি হয়েছিল। সহকারী জেলারের বিশ্রাম কক্ষের সুমুখেও চক্রাকারে কেয়ারি করা ছোট একটি বাগান ছিল। সেই বাগানের মধ্যে একটি শীর্ণকায় কয়েদী পাতা ছাঁটছিল ক্রীসন্থীমামের। রজতের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেই কয়েদীটিই।

লোকটির শরীরে স্বাস্থ্যের চিহ্নমাত্রও ছিল না। কোটরাগত চোখের জ্বলজ্বলে দৃষ্টি মেলে সে অনেক্ষণ থেকেই রজতকে লক্ষ্য করছিল। তারপর রজতের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সে আবার মুখ ঘুরিয়ে কাজে মনোনিবেশ করল।

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রজত মিনিটখানেক কী যেন ভাবল। তারপর হঠাৎ একটু এগিয়ে গিয়ে বলল: আপনি...আপনি কি আমাদের বিশুবাবু নন?

—চিনতে পেরেছেন তাহলে?—ফিরে দাঁড়িয়ে বিশু অদ্ভুতভাবে একটু হাসল।

—বিশুবাবু? শুভেন্দুরও বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে বসল: একি চেহারা হয়েছে আপনার? কোথায় ছিলেন এতদিন? এখানে কবে এলেন?······

—ছিলাম অনেক জায়গায়। গতকাল বহরমপুর থেকে এখানে এসেছি। আজই আমার Release-এর দিন কি না!····কিন্তু, রজতবাবু আপনি? আপনি তো,—শুনেছিলাম I. N. A-তে ছিলেন—

—আমার কথা পরে হবে। কিন্তু...রজত উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল: আপনার কী হয়েছে বিশুবাবু?

—কী জানি কী হয়েছে! বিশু আবার একটু হাসল। বলল: হাঁস্‌পাতালে তো আর নিতে চায় না—

—অদ্ভুত! রজত এবার শুভেন্দুর উদ্দেশে বলল: সামান্য একটু Gastic trouble-এর জন্যে এখানকার হাঁসপাতাল আমায় তিন মাস আট্‌কে রেখেছে, অথচ......

বিশুই উত্তর দিল: আপনি যে Political Suspect......,

—আহা, আপনিও তো তাই—

—না, আমি একজন Suspected murderer......

এই সময় একটা ফুটবল এসে বিশুর গায়ে লাগল। লাগবার পূর্ব্বে বল্‌টার বার দুয়েক পীচ্‌ পড়েছিল; কিন্তু সেই সামান্য আঘাতেই বিশু বসে পড়ে খিঁচিয়ে উঠল: কোন শালা রে—

—বড় কর্ত্তার গুণধরটি বোধহয়!—শুভেন্দু ব্যস্ত হ'য়ে একটা ওয়ার্ডেন্‌-এর উদ্দেশে হাঁক দিল: ওরে দেখত—

বল্‌টা এসেছিল দক্ষিণ দিক্‌কার পাঁচিল টপ্‌কে। পাঁচিলের অদূরেই ২৪ পরগনা ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের অফিস। তারপরই ফৌজদারী আদালত। ম্যাজিষ্ট্রেটের যাতায়াতের সুবিধার জন্যে পাঁচিলের গায়ে ছোট একটা লোহার দরজা ফোটান ছিল!—শুভেন্দুর আদেশে একটা ওয়ার্ডেন সেই দরজাটা খুলেই বেরিয়ে গেল।

—যাক্‌গে! একটা নিঃশ্বাস ফেলে রজত বিশুর উদ্দেশে বলল:

আপনি এখন তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন দেখি, অনেক কাজ করতে হবে আমাদের—

—আবার কী কাজ!—বিশু মুখ নীচু করে বসেছিল; মুখ না তুলেই বলল: কংগ্রেসের কাজ তো উদ্ধার হয়ে গেছে! আমরা তো এখন স্বাধীন—

—স্বাধীনতা তো শুধু পেলেই হয়না! সেটাকে বজায় রাখতে হবে তো!

—তা বটে! অনেককেই বেকার হ'তে হবে,—সুতরাং গায়ের জ্বালাও হবে অনেকের—

—হুজৌর। একঠো বিচ্ছুকো পাকাড় লিয়া—ওয়ার্ডেনটা একটি বালককে টানতে টানতে নিয়ে এল। কিন্তু ছেলেটির দিকে চেয়েই শুভেন্দুর মুখখানা যেন কেমন মলিন হ'য়ে গেল। ব্যাপারটা শোনা গেল:

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড অফিসের সামনেই যে ছোট মাঠটা আছে, একদল ছেলে সেইখানে ফুটবল খেলছিল। ওয়ার্ডেনের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই খেলোয়াড়ের দল সরে পড়েছিল; শুধু এই ছেলেটি তখনও দাঁড়িয়েছিল সেখানে।

ছেলেটির বয়স বড় জোর বছর দশ। কিন্তু ফুটবল খেলোয়াড়ের চেহারা তার নয়। শুভেন্দুর প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটিও স্বীকার করল,—ফুটবল সে জীবনে কখনও ছোঁয়নি,—দলে পড়ে খেলা দেখতে এসেছিল মাত্র।

আসাটাও অস্বাভাবিক নয়। আদালতের এলাকায় যেখানে যত

জমী আছে, প্রতিদিন বৈকালে বিভিন্ন দলের বহু ছেলে এসে সেখানে ফুটবল পেটে,—কিৎ-কিৎ গাদি প্রভৃতি অনেক রকমের খেলাই খেলে তারা। কিন্তু—

—আজ দুপুরবেলায় এসেছ কেন? শুভেন্দু হাসিমুখেই প্রশ্ন করল: স্কুলে যাওনি?

—যেতে দিলে না যে!

—কে যেতে দিলে না?

—উঁচু ক্লাশের ছেলেরা। বললে, ঢুকলে মারবো! Strike করেছে কি না—

—কিসের Strike হে?

—ইন্...ইন্...একটা ঢোক গিলে অনেক কষ্টে ছেলেটি উচ্চারণ করল: ইণ্ডুসিয়ার জন্যে।

—দেশের হ'লো কী রে শুভেন্দু?—রজত সশব্দে হেসে উঠল। বলল: দুগ্ধ-পো'ষ্যরাও পলিটিকস্ আরম্ভ করেছে?—তারপর ছেলেটির উদ্দেশে বলল: তুমি ঠিক রাস্তা ধরেছ হে ছোকরা। কী হবে লেখাপড়া শিখে সময় নষ্ট করে! মেরেকেটে তো একটা কেরাণীগিরি! তার চেয়ে বরং এই সময়টা যদি কোন রকমে জেল্ খাটতে পারো, তোমার ভালই হ'বে!...আখেরে, দেশের মন্ত্রীত্ব পর্য্যন্ত জুটে যেতে পারে।—বলেই আবার সে সজোরে হেসে উঠল।

—শুভেন্দুবাবু!—বিশু এতক্ষণ বালকটির দিকেই তাকিয়েছিল। এবার আস্তে আস্তে বলল: ছেলেটি কে শুভেন্দুবাবু! মুখখানা যে বড্ড চেনা চেনা মনে হচ্ছে—

শুভেন্দু এতটুকুও ইতস্তত করল না। স্নিগ্ধকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ বলল: চেনাই তো আপনার উচিৎ বিশুবাবু—

বিশু যেন একটু ভরসা পেয়েই এগিয়ে এল। প্রথমে সে ছেলেটির মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিল; তারপর তার মুখটি তুলে ধরে সস্নেহে প্রশ্ন করল: তোমার নাম কী বাবা?

ছেলেটির অবস্থা তখন কেঁদে ফেলবার মতো। তার টানা টানা চোখদুটির মধ্যে ইতিপূর্ব্বেই রাজ্যের সন্ত্রাস এসে জমা হয়েছিল; এবার ঠোঁটদুটিও তার কেঁপে উঠল। বলল: আমি ইন্দু...... ইন্দ্রনাথ...

—ইন্দ্রনাথ! বিশুর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছিল। স্খলিতস্বরে সে আবার প্রশ্ন করল: ইন্দ্রনাথ...কী?

—ইন্দ্রনাথ রায়।

—রায়! ওঃ—বালকের মাথার ওপর থেকে বিশুর হাতখানা যেন আপনা-আপনিই পাশে ঝুলে পড়ল।

—এবার আমাকে ছেড়ে দেবেন, এঁ্যা?—বালক এবার ব্যাকুলভাবে রজতের দিকে তাকাল। তার নীরব গাম্ভীর্য্য দেখে সে কী ভেবেছিল সে-ই জানে, হঠাৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল: আমি তো কোন দোষ করিনি ...দেবেন ছেড়ে, এঁ্যা?

—শুভেন্দু—রজত ডাকল।

শুভেন্দু তখন উর্দ্ধমুখে তাকিয়েছিল। বহুদিন পূর্ব্বেকার একটা কথা মনে পড়ছিল তার। সুদীর্ঘ এগার বছর পূর্ব্বে,—এমনই এক বর্ষণোন্মুখ মধ্যাহ্নে, এই জেল গণ্ডির মধ্যেই, একদিন যে কাহিনীর সূত্রপাত

য়েছিল, তার চরম পরিণতি কি,—নিতান্তই আজকেকার এই টনাটাই ? আর কি কিছু নেই এর পরে ?

রজত আবার ডাকল : শুভেন্দু !

—এঁ্যা ?

—একে এর মায়ের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করো ! সে এখন থাকে কোথায় ?

—কাছেই। হাজরা রোড়ের ওপর একটা ফ্ল্যাট্ বাড়ীতে—

সেইদিনই—

বর্ষণ তখন মুষলধারে নেমেছিল।

আকাশের এ ঘনঘটা নতুন নয় ! কিন্তু কলকাতার নাগরিকেরা হঠাৎ যেন এই দুর্য্যোগের ভ্রুকুটিটাকে নতুন করে উপলব্ধি করল ! মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে, যে মেঘ-মুক্ত সূর্য্যকে প্রত্যক্ষ করে তারা উৎসব আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠেছিল, প্রকৃতিদেবীর আকস্মিক খেয়ালে প্রাণশক্তি যেন তার হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেল। রাজপথের চাঞ্চল্য ক্ষীণ হ'তে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল ! এমন কি,—শ্লোগান-সর্ব্বস্ব শান্তি-সেনা-দলের অব্যাহত গতিও হঠাৎ যেন একেবারে থেমে গেল ! শ্রান্তিতে নয়,—নিতান্ত বাধ্য হয়েই অবসর গ্রহণ করল তারা।

শুধু অবসর ছিলনা পুষ্পর। সারা দেশটা যখন বাঞ্ছিতকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে উন্মত্ত, আত্মজকে হারাবার আশঙ্কায় সে তখন

আত্মবিস্মৃত! বর্ষণের প্রচণ্ডতাকে তুচ্ছ করে সে পূর্ব্বের মতোই ঘর-বার করতে লাগল।

পাশের ফ্ল্যাটেই থাকতেন সিভিল-সাপ্লায়ের গগনবাবু। তাঁর রক্ষিতাটি সম্ভক্রীত চুড়ির গোছাটা দেখাবার উদ্দেশ্যে পুষ্পর পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন: তুমি কি পাগল হলে দিদি! এই ফাঁকা রাস্তায় কোথায় তুমি তার দেখা পাবে? আর ভিজোনা, ঘরে চল! ছেলে তোমার ঠিক ফিরে আসবে'খন—

পুষ্প নড়ল না। সর্ব্বহারার দৃষ্টিতে সে যেন তখন পথের প্রতি ধূলি কণাটিকে পর্য্যন্ত লক্ষ্য করছিল।

কিছুক্ষণ পরে বারান্দায় এলেন একতলার পরেশবাবুর স্ত্রী। বললেন: ও ভাই, আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ?

পুষ্প কথা কইল না। কিন্তু কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল। সত্যিই, জনতা আবার রাস্তায় বেরিয়েছে।

মিনিটখানেক পরে পরেশবাবুর ছেলেটিও হন্তদন্ত হয়ে মায়ের পাশে এসে দাঁড়াল।

—এই বাঁদর! মা ধমক দিলেন: বৃষ্টিতে ভিজিস নি, ঘরে যা—

প্রত্যুত্তরে ছেলেটি বারান্দার রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ল। বলল: দেখো মা, প্রসেশানটা এখানে এলেই আমি বলবো: নেতাজী! অমনি তোমরাও চেঁচিয়ে উঠবে: ফিরে এসো!—বুঝলে?

—কিসের প্রসেশান বেরিয়েছে রে?

—তাও জান না? ক্যাপ্টেন রজত রায়কে নিয়ে প্রসেশান বেরিয়েছে যে! একটু যাব মা ওদের সঙ্গে? এই...একটুখানির জন্যে...যাব মা?

—কে? কী নাম বললে? পুষ্প বিস্ফারিতচক্ষে ছেলেটির দিকে তাকাল। জড়িতস্বরে আবার সে প্রশ্ন করল: কী নাম বললে?

—রজত রায়—

পুষ্প যেন একবার কেঁপে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে প্রস্থানোদ্যত হ'লো।

—আবার যাচ্ছ কোথায়? পরেশ-গৃহিনী বললেন: দেখো না, তোমার ইন্দুও হয়তো ভিড়েছে ওই দলে...

বন্দে মাতরম্—জয়হিন্দ্...প্রসেশান নিকটে এসে পড়ল। ক্রমে পুষ্পাচ্ছাদিত প্রকাণ্ড একখানা গাড়ীও দৃষ্টি আকর্ষণ করল পুষ্পর! তারপর আসন্ন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারের মধ্যেও একটি অতিপরিচিত উঁচু মাথাও লক্ষ্য করল সে! শেষে—

আর সহ্য করতে পারলনা সে। ভাড়াটে-অধ্যুষিত বিরাট বাড়ীটার মধ্যে নির্জ্জন স্থান বলতে তার কিছুই নজরে পড়ল না। তখন সে ছুটে গিয়ে ঢুকল তার নিজস্ব কলঘরটির মধ্যে। দরমা দিয়ে ঘেরা হাত তিনেক পরিধির সেই অতি-নোংরা বাথ্‌রুমটার মধ্যে আছড়ে পড়ে সে অসঙ্কোচে কেঁদে উঠল। জন্ম-জন্মান্তরের যে গোপন ব্যথা সে এতদিন সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখেছিল মনের মধ্যে, আজ উচ্ছসিত ক্রন্দনের স্বাভাবিক রন্ধ্র পেয়ে সেগুলো যেন মুক্তি-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলো। একই সঙ্গে অসংখ্যের প্রকাশ-কামনা তার ছোট্ট বুকখানাকে ভেঙ্গে তুবড়ে যেন চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিল। ...শেষে, দংশন-ক্ষত স্মৃতির ওপর প্রলেপ দিল শ্রান্তি।

তারপর বাইরের ঘনঘটা কেটে গিয়ে আবার সূর্য্যোদয় হলো। কিন্তু

তন্দ্রাতুর পুষ্প স্বপ্ন দেখছিল তখনও। [illegible] আজীবনের স্বপ্ন-বিলাস সেদিন যেন আবার স্বপ্নের মধ্য দিয়েই নতুন করে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠছিল। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল, তাঁরই সন্তানের হাত ধরে সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে একটি পুরুষ! দূর থেকে ভেসে আসা অস্ফুট শব্দধ্বনির মতো গুটিকতক কথাও শ্রুতিগোচর হ'লো তার: এই কি তোমার কাঁদবার সময় পুষ্প! ওঠো... জাগ... দেখো,...সূর্য্য আজ রাহুমুক্ত... আজকের এই নতুন দিন থেকে, আবার নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করতে হবে আমাদের......

কিন্তু ও কে!

চোখ চাইবার পূর্ব্বে, রোমাঞ্চিত কলেবরে, বহুকাল পরে পুষ্প একবার তার ইষ্টকে স্মরণ করল:

ভগবান! ভোরের স্বপ্ন কি সত্যই সত্যি হয়!

সমাপ্ত